যাদু-কাহিনী

অজিত কৃষ্ণ বসু

যাদু-কাহিনী

অজিত কৃষ্ণ বসু
[অ. কৃ. ব.]

ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৬০

প্রকাশক : শ্যামল ভট্টাচার্য
ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শিবনাথ পাল
প্রিণ্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৪

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

যাদুর কাহিনীই দুনিয়ার সবচেয়ে পুরোনো কাহিনী, আর ঈশ্বরই হচ্ছেন দুনিয়ার সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর। তাঁরই যাদুতে অনন্ত শূন্যের বুকে সৃষ্ট হয়েছিল বিস্ময়ে ভরা এই বিশ্ব। ঈশ্বর-সৃষ্ট বিস্ময়গুলো যুগের পর যুগ দেখতে দেখতে ক্রমে বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল মানুষের চোখ থেকে আর মন থেকে। ঈশ্বরের যাদু ভুলে মানুষ তখন মানুষের যাদুতে মুগ্ধ হতে শুরু করল।

মানুষের সমাজে প্রথম যাদুকরেরা ছিলেন পুরোহিত, পূজারী, 'প্রফেট' বা গুরুজাতীয় অ-সাধারণ ব্যক্তি। সাধারণের অনধিগত বিশেষ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ লৌকিক উপায়েই এঁরা যে-সব রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করতেন, সে-সব কিছুই সাধারণ মানুষ ভীতি এবং শ্রদ্ধা-মেশানো বিস্ময়ের চোখে দেখে ভেবে নিত এঁরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, ঐশ্বরিক যাদু-ক্ষমতার অংশীদার। এই যাদুকরদের যাদু প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল মনোরঞ্জন বা চিত্তবিনোদন নয়, অলৌকিক রহস্যময় শক্তির অভিনয়ে অভিভূত এবং বশীভূত করে সাধারণ মানুষদের ওপর আধ্যাত্মিক বা অন্যপ্রকার প্রভাব বিস্তার করা। তারপর যাদু-বিদ্যা ক্রমে ক্রমে অলৌকিকতার এলাকা ছাড়িয়ে চলে এসেছে লৌকিক মনো-রঞ্জনের এলাকায়। যাদুবিদ্যার ইতিহাস এই ক্রমবিবর্তনেরই ইতিহাস। যাদু-করের আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা বিস্মিত হলেও তাঁকে অলৌকিক বা ভৌতিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ভাবি না, মনে মনে জানি তিনি সূক্ষ্ম কৌশলে আমাদের চোখ আর মনকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছেন মাত্র; যা সত্যি সত্যি ঘটেছে (অথচ ঘটেছে বলে আমরা বুঝতে পারি নি) এবং যা চোখের সামনে ঘটতে দেখলাম বলে আমাদের মনে হয়েছে (অথচ সত্যি সত্যি ঘটেনি) —এ দুয়ে অনেক তফাত। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি নি ঠিক কোথায় সেই তফাতটা। "নিজের চোখে দেখলাম, অবিশ্বাস করি কি করে?" এ-ধরনের উক্তি করা যে কত বড়ো বোকামি, সেইটে বুঝতে পারি যাদুকরদের যাদুর খেলা দেখে।...

আমার দেখা প্রথম যাদুকর 'রয় দি মিস্টিক'—বাংলা তর্জমায় যার মানে 'অতীন্দ্রিয়বাদী রায়'। তাঁকে প্রথম দেখলাম এক সন্ধ্যায় ঢাকা শহরে রেলওয়ে

ইনষ্টিটিউট হলে। তিনি ঘণ্টা দুয়েক যাদু-খেলা দেখালেন পাশ্চাত্য পোশাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে। বছরটা ১৯২৬ খৃস্টাব্দ, কিন্তু সেই সুদূর সন্ধ্যার স্মৃতি এমন মধুর স্বপ্নময় বিস্ময়ে ভরা যে এখনো মন থেকে মুছে যায়নি। নয়ন-মনোহারিণী রূপসী সহকারিণী ছিল না তাঁর, শুধু অপরূপ যাদু-প্রদর্শনের আকর্ষণে তিনি হল-শুদ্ধ সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। যে খেলাগুলো দেখিয়েছিলেন, তাদের কয়েকটি হচ্ছে বিলিয়ার্ড বলের খেলা (মালটিপ্লাইং বিলিয়ার্ড বল্‌স্), চাইনিজ লিংকিং রিংস্ (দশ-বারো ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কতকগুলো বড়ো রিং আলাদা আলাদা দেখিয়ে একটির ভেতর আরেকটি রহস্যজনকভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার বিচ্ছিন্ন করা), শূন্যে ভাসমান বল, মার্কিন যাদুকর হাউয়ার্ড থার্সটনের বিখ্যাত 'রাইজিং কার্ডস্' (বাঁ হাতে ধরা প্যাক থেকে পর পর কয়েকটি তাসের ধীরে ধীরে শূন্যপথ বেয়ে ডান হাতে উঠে আসা), 'এরিয়াল সাস্‌পেন্‌শন' (একটি বালিকাকে হিপ্‌নোটাইজ করে শুধু একটি খাড়া লাঠির ডগায় কনুই ভর করে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা এবং তারপর ঐ লাঠিটিও সরিয়ে নিয়ে একেবারে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা), মেণ্টাল টেলিপ্যাথি বা সেকেণ্ড সাইট (দর্শকদের ভেতরে দাঁড়ানো যাদুকরের হাতে দর্শকেরা যে-কোনো জিনিস দিলে মঞ্চে চোখ বাঁধা অবস্থায় সহকারীর দ্বারা সে জিনিসটির বিশদ বর্ণনা) ইত্যাদি। পর্দা ওঠবার পরই আমাদের অভিবাদন করে একটির পর একটি এমন সব তাজ্জব ব্যাপার দেখিয়ে তিনি আমাদের তাক লাগিয়ে দিলেন যে, তারপর মনে হতে লাগল এই মায়াবী লোকটি যা খুশি তাই অনায়াসে করতে পারেন, নাপোলেয়ঁর মতো এর অভিধানেও 'অসম্ভব' শব্দটি অনুপস্থিত।

যে খেলাগুলো তিনি দেখাচ্ছিলেন তার কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা শুধু আমার কেন—আমি তো তখন বালক মাত্র, সবে স্কুলের ছাত্রগিরি শুরু করেছি —আমার আশেপাশের বড়োদের মাথায়ও আসেনি ; তাঁরা হতভম্ব হয়ে মাথা চুলকোচ্ছিলেন। তবু কিন্তু 'রয় দি মিষ্টিক'-কে অলৌকিক, ভৌতিক বা 'তান্ত্রিক' ক্ষমতার অধিকারী বলে আমার মনে হয়নি।

এর একটি কারণ হচ্ছে যাদুকরের বেশভূষা এবং যাদুপ্রদর্শনের স্টাইল সম্পূর্ণ আধুনিক, ঘরোয়া, অন্তরঙ্গ। মুখে অলৌকিক রহস্যময় গাম্ভীর্যের বদলে ছিল সকৌতুক হাসির আলো। কথায় কথায় আমাদের হাসাচ্ছেন—আমাদের আনমনা করে দিয়ে সেই ফাঁকে ফাঁকির কাজ চুপি চুপি হাসিল করে নেবার জন্যেই বোধহয়—আর আমাদের সঙ্গে যেন আমাদেরই একজন হয়ে প্রতিটি

খেলার তামাশা আমাদেরই মতো রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করছেন। তিনি আমাদের ঠকিয়ে মজা পাচ্ছেন, আর আমরা ঠকে মজা পাচ্ছি ; ওঁর ঠকানো, অতএব আমাদের ঠকার মাত্রা যত বাড়ছে, আমাদের দুপক্ষেরই মজার মাত্রাও যেন ততই বেড়ে উঠছে। এ আবহাওয়ায় অলৌকিকতা বা ভৌতিকতার ঠাঁই কোথায়? যাদুকর ভদ্রলোকের যা-কিছু গুরুগম্ভীরত্ব ছিল ঐ 'মিষ্টিক' বিশেষণেই।

আরেকটি কারণ, যাদুবিদ্যার সমস্ত বিস্ময়ই যে সম্পূর্ণ 'লৌকিক' কৌশলের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যাদুবিদ্যায় অলৌকিক কিছু নেই, এ-জ্ঞান আগেই পেয়েছিলাম 'গ্যাম্যাজিক' (Gamagic) নামক একটি পুরোনো বৃহদায়তন সচিত্র ক্যাটালগ গ্রন্থ থেকে। আবোল-তাবোলের 'হাঁস ছিলো সজারু, হয়ে গেলো হাঁসজারু'র মতো গ্যামাজ আর ম্যাজিক একসঙ্গে জুড়ে লণ্ডনের বিখ্যাত গ্যামাজ কোম্পানির ম্যাজিক বিভাগের ক্যাটালগটি নাম নিয়েছিল 'গ্যাম্যাজিক'। আমার এক কাকা বিদেশ থেকে এটি নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর পুরোনো কাগজপত্রের ভাণ্ডার থেকেই এই অমূল্য রত্নটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম। ক্যাটালগটির প্রচ্ছদপট জুড়ে ছিল ১৯১২ খৃস্টাব্দে লণ্ডনের সেণ্ট জর্জেস হলে রাজ-দম্পতির সম্মান-প্রদর্শনীতে ('রয়্যাল কম্যাণ্ড পারফর্ম্যান্‌স') যাদু-প্রদর্শনরত ইংলণ্ডের সেরা যাদুকর ডেভিড ডেভাণ্টের পূর্ণাঙ্গ ফোটোগ্রাফ এবং ভেতরের পৃষ্ঠাগুলোতে ছিল ছোটো মাঝারি আর বড়ো নানা ধরনের যাদুক্রীড়ার বিবরণসহ বিভিন্ন যাদু-দ্রব্যাদির এবং যন্ত্রপাতির মূল্যতালিকা। ঠাণ্ডা ছাপার হরফে রাগ-রাগিণীর রূপ-বর্ণনা পড়ে তারপর গুণী সংগীতশিল্পীর কণ্ঠে তাদের সুন্দর রূপায়ণ শুনলে যেমন হয় 'গ্যাম্যাজিক' পড়ার পর ছাপার হরফে বর্ণিত একাধিক যাদুর খেলাকে গুণী যাদুকর 'রয় দি মিষ্টিক'-এর হাতে বাস্তব রূপ নিতে দেখে আমার তেমনি অবস্থা হল। যাদুবিদ্যাকে একটি জীবন্ত শিল্পরূপে ভালবেসে ফেললাম।

'রয় দি মিষ্টিক'-এর বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখে এবং 'গ্যাম্যাজিক'-এর সচিত্র পৃষ্ঠাগুলোর মাধ্যমে ডেভিড ডেভাণ্ট, হাউয়ার্ড থার্সটন, হ্যারি হুডিনি, 'চুং লিং সু', 'লাফায়েৎ', কার্ল হার্টজ, ওকিতো, নিকোলা, হারম্যান, নেলসন ডাউনস, প্রমুখ পাশ্চাত্য যাদু-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে—যদিও সে পরিচয় নিতান্তই পরোক্ষ এবং একতরফা—আমারও প্রাণে শখ জেগেছিল অন্তত একজন যাদু-জোনাকি হবার। তাই ডাকযোগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত হলাম পূর্বোল্লিখিত গ্যামাজ কোম্পানির যাদুবিভাগের সঙ্গে এবং পরে লণ্ডনের আরও

দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে—হ্যামলি ব্রাদার্স এবং ড্যাভেনপোর্ট লিমিটেড—যাদের ছিল শুধু যাদু নিয়েই কারবার। যাদু-সাহিত্যে এবং যাদু-সংক্রান্ত অনেক কিছুতে আমার পড়ার ঘর ভরে উঠতে লাগল। তারপর চলে গেলাম লণ্ডন থেকে লস এঞ্জেলস (কালিফোর্নিয়া), সিনেমাতীর্থ হলিউডের কাছাকাছি থেয়ারের বিখ্যাত যাদুতীর্থে, অর্থাৎ তখনকার দিনের পৃথিবীর বৃহত্তম যাদু-কারখানা থেয়ার্স ম্যাজিক স্টুডিওতে (অবশ্য ডাকযোগে)। তার সচিত্র ক্যাটালগ-খানার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল প্রায় দুশো—ক্ষুদ্রতম 'পকেটট্রিক' থেকে বৃহত্তম 'স্টেজ ইলিউশন'-এর বিবরণ এবং মূল্যতালিকা ছিল তাতে। এর ওপর থেয়ারের স্টুডিও থেকে মাসে অন্তত একটি করে চমৎকার সচিত্র বুলেটিন পেতে লাগলাম, যাতে থাকতো যাদু-শিল্পে এবং যাদু-সাহিত্যে নূতন সংযোজনের বিবরণ। থেয়ারের ঐ যাদু বুলেটিনগুলো দেখে যাদু-দুনিয়ার অগ্রগতি সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে ওয়াকি-বহাল থাকা যেত। এ থেকে বুঝতে পেরেছিলাম ইউরোপ এবং আমেরিকায় শিল্প এবং ব্যবসায়রূপে যাদুবিদ্যার যে বিরাট সমাদর এবং প্রসার, তার তুলনায় আমাদের দেশে প্রায় কিছুই নয়।

লণ্ডনের 'ম্যাজিশিয়ান' নামক যাদু-বিষয়ক মাসিকপত্রে (বিখ্যাত গ্যামাজ লিমিটেডের যাদুবিভাগ থেকে প্রকাশিত) সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সংখ্যায় এবং তার পরে যাদু-সংক্রান্ত আমার কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে আমার পরিকল্পিত কয়েকটি যাদুর খেলার কৌশল ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলাম। আমার সেই লেখাগুলো বিশ্বের যাদুজগতে যুগান্তর এনেছিল বলে খবর পাইনি, কিন্তু আজও আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি লণ্ডনের বিশিষ্ট যাদু-মাসিকে একজন বাঙালী যাদু-শৌখিনের লেখা হিসেবেই হয়তো আমার সেই লেখা বাংলার অতুলনীয় যাদুকর রাজা বোস দেখেছিলেন এবং মনে রেখেছিলেন, এবং কতকটা হয়তো এরই ফলে তাঁর মৃত্যুর (১৯৪৮) পূর্বের কয়েক বছর তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তরুণ বয়সে বিলেতে চামড়ার কাজ শিখতে গিয়ে সেখানে যাদুর চর্চা এবং সমাদর দেখে উৎসাহিত হয়ে লেদার এক্সপার্ট হবার রাস্তা ছেড়ে তিনি বেছে নিলেন যাদুর রাস্তা। অবশ্য দেশে থাকতেই যাদুবিদ্যা কিছুটা রপ্ত করেছিলেন। পেশাদার যাদুকররূপে বছর-কয়েক ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য জায়গায় ঘুরে-ঘুরে যাদু প্রদর্শন করে তারপর বাঙলার ছেলে বাঙলায় ফিরে আসেন এবং বাকি জীবনটা যাদুর চর্চাতেই কাটিয়ে দেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর অবশ্য তিনি পেশাদারী যাদু-প্রদর্শন থেকে

বানপ্রস্থ নিয়েছিলেন শারীরিক এবং অন্যান্য কারণে। বাংলার যাদুচর্চার ইতিহাসে যাদুকর পি. সি. সরকারের আগে বাঙলার যাদু-জগতে জনপ্রিয়তম দুটি নাম ছিল গণপতি চক্রবর্তী আর রাজা বোস। এঁদের দুজনের স্টাইল বা খেলা দেখাবার ভঙ্গী ছিল আলাদা, এবং নিজ নিজ স্টাইলে এঁরা দুজনই ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এঁদের সমসাময়িক আরেকটি জনপ্রিয় নাম প্রোফেসর বিমল গুপ্ত (পুরো পদবি দাশগুপ্ত)। ইনি শুধু সুদক্ষ যাদুকর ছিলেন তাই নয়, 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' রেকর্ডের বিশিষ্ট গায়ক এবং বাঙলার অন্যতম প্রধান কৌতুকশিল্পী হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। রাজা বোসের যাদু- প্রদর্শন, চলাফেরা এবং কথার গতি ছিল দ্রুত—বিখ্যাত মার্কিন যাদুকর হোরেস গোলডিনের (Horace Goldin) মত ; প্রোঃ গুপ্তের এই তিনটির গতিই ছিল শান্ত ধীর—অবিস্মরণীয় ইংরাজ যাদুকর ডেভিড ডেভাণ্টের (David Devant) মতো। যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে এঁর সংস্পর্শে এসে বিশেষ লাভবান হয়েছিলেন বাঙলার দুজন বিশিষ্ট যাদুকর—অশোক রায় (Osak Rae) এবং বিমলাকান্ত রায়-চৌধুরী (Becaire)।

ছেলেবেলায় একবার পূর্ব বাঙলার একটি গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম, কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" মনে করিয়ে দেবার মতো। তখন যে চোখ ছিল সে চোখ আর নেই, তখন যে মন ছিল সে মনও আজ নেই, শুধু রয়ে গেছে তখনকার অনেক স্মৃতি—কিছু ঝাপসা, কিছু পরিষ্কার। সেই গ্রামে যাদের দেখেছিলাম তাদের ভেতর সব-চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে মনে আছে সেখানকার শিব-মন্দিরের সন্ন্যাসী বাবার কথা। মন্দিরের ধারে বটগাছের তলায় একটা বেড়ার ঘরে থাকতেন তিনি এবং তাঁর একজন চেলা। গুরুর ঐকান্তিক সেবা ছাড়া চেলাটির জীবনে অন্য কোনো লক্ষ্য বা বাসনা ছিল বলে মনে হতো না। শুনেছিলাম সন্ন্যাসী বাবা একবার নিদারুণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন নিজের জীবন বিপন্ন করে সম্পূর্ণ একা তাঁর সেবা করে চেলাটি তাঁকে সারিয়ে তুলেছিল, অপর কাউকে বসন্ত-আক্রান্ত গুরুদেবের সেবায় লাগতে দেয়নি। সম্ভবত অপর কারও জীবন পাছে বিপন্ন হয় —বসন্ত ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ—সেইজন্য, অথবা হয়তো গুরুদেবের সেবায় পুণ্য আর গৌরবে অপর কেউ এসে ভাগ বসাবে, এ কল্পনাও তার সয় নি। যাই হোক, মায়ের দয়া থেকে সন্ন্যাসী বাবাকে সে সারিয়ে তুলেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, গুরুর বসন্তের ছোঁয়াচে চেলার বসন্ত হয়নি, একটি ফুসকুড়িও দেখা দেয় নি

তার গায়ে। এতে গ্রামশুদ্ধ সবাই বিস্মিত হয়েছিল, এবং এ-বিষয়ে গ্রামের মাতব্বরস্থানীয় ব্যক্তিরা মন্তব্য করেছিলেন যে, অমন সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত বসন্ত রোগীর সেবা করেও যে চেলাটি বসন্তর হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থেকেছিল, এ সন্ন্যাসী বাবারই অলৌকিক শক্তির ফল ; আসলে ঐ চেলার ওপরই মা দয়া করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, সন্ন্যাসী বাবা অলৌকিক ক্ষমতাবলে তা টের পেয়ে তেমনি অলৌকিক ক্ষমতাবলেই মায়ের দয়াকে নিজের দেহে টেনে নিয়েছিলেন শিষ্যকে বাঁচাবার জন্য। ধন্য গুরু! ধন্য শিষ্য!

সন্ন্যাসী ঠাকুরের একটিমাত্র নামই গ্রামের লোকের জানা ছিল, সে নাম : সন্ন্যাসী বাবা। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই নামেই ডাকত তাঁকে, এই নামেই চিনত। চেলাটির নাম ছিল শিবদাস। এ নাম পিতৃদত্ত নয়, গুরুদত্ত। সন্ন্যাসী বাবা নাকি বলেছিলেন, "তুই শিবের দাস, তাই তোর নাম হলো শিবদাস।" চেলা বলেছিল, "গুরুদেব, আমি আর কাউকে চিনি নে, আমি শুধু আপনারই দাস, যেমন আছে কবীরের দোহায় :

"গুরু গোবিন্দ দৌউ খড়ে, কাকে লাগোঁ পাঁয়।
বলিহারী গুরু আপনে, গোবিন্দ দিয়ো বতায়।"

অর্থাৎ "গুরু এবং গোবিন্দ দুজন সামনে খাড়া, এখন কার পায়ে আমি প্রণাম করব? হে গুরু, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনিই গোবিন্দকে লাভ করবার পথ আমাকে বাতলে দিয়েছেন, আপনার কৃপা ছাড়া এ পথ আমি কিছুতেই পেতাম না। সুতরাং প্রণাম আমি আপনাকেই করব।"

সন্ন্যাসী বাবা হেসে বলেছিলেন, "ওরে ব্যাটা, তোর গুরুভক্তি সাচ্চা তা আমি জানি। তোর গুরুই তোর নাম দিচ্ছে শিবদাস।" সুতরাং শিবদাস নামই শিরোধার্য করে নিয়েছিল সেই চেলাটি।

আমি গ্রামে যেদিন পা দিয়েছিলাম সেদিনই এ-সব কথা শুনেছিলাম, সন্ন্যাসী বাবার সম্বন্ধে আরও নানারকম লৌকিক এবং অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে। শুনেছিলাম এ গ্রামে সন্ন্যাসী বাবা যখন প্রথম এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন বটগাছের তলায়, সঙ্গে তাঁর এই চেলা শিবদাস, এবং মুখে মাঝে মাঝে উচ্চারিত "ব্যোম ভোলা শিব মহেশ্বর" মন্ত্র, তখন তাতে সামান্য কয়েকজন মাত্র উৎসাহিত হয়েছিলেন ; তাও সাধারণভাবে, তেমন জোরালোভাবে নয়। তারপর একদিন এক অসাধারণ ব্যাপার ঘটল। গ্রামের অনেকের চোখের সামনে একদিন সন্ন্যাসী বাবার অলৌকিক শক্তির যাদুতে এক ডজন তামাক ধরাবার টিকে

পরিণত হয়ে গেল এক ডজন খাঁটি বাতাসায়। উপস্থিতদের ভেতর কয়েকজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি নিজ মুখে খেয়ে দেখলেন সেগুলো সত্যিই বাতাসা, চোখের ভুল নয়। খবরটা জঙ্গলের দাবানলের মতো গ্রামময় দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ল : সন্ন্যাসী বাবা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, টিকেকে মন্ত্রবলে বাতাসা বানিয়ে দিয়েছেন !

এতদিনে যা হয় নি, একদিনের ঐ যাদুর খেলায় তাই হয়ে গেল। দ্রুত-বেগে সারা গ্রামের পরমপূজ্য হয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী বাবা, ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। গ্রামের অনেকে এসে সন্ন্যাসী বাবার পায়ে ধরে পড়ল, আশ্রয় দিতেই হবে শ্রীচরণে। আশ্রয় মানে আধ্যাত্মিক আশ্রয়, মন্ত্র-দীক্ষা। ভক্তের পর ভক্ত নাছোড়বান্দা। তাদের চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে দীক্ষা দিতে শুরু করলেন সন্ন্যাসী বাবা। মন্ত্র হয়তো অন্য কিছু নয়, প্রত্যেক শিষ্য বা শিষ্যাকেই হয়তো ঐ একটি মন্ত্র তিনি জপ করতে উপদেশ দিতেন : "ব্যোম-ভোলা শিব মহেশ্বর।"

আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই সন্ন্যাসী বাবাকে। যে-বাড়িতে আমি উঠেছিলাম, তার পাশের বাড়ি সন্ন্যাসী বাবার শিষ্যবাড়ি। বাড়ির বড়ো কর্তা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গ্রামের অ্যালোপ্যাথ কৃতান্ত ডাক্তার এসে জিভ দেখে, বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে, পেটে টোকা মেরে আর নাড়ি টিপে প্রেস্‌ক্রিপশন করে গেছেন, তাঁর ডিসপেনসারি থেকে ছয় দাগ মিক্‌সচার আনিয়ে দু'দাগ খাওয়ানোও হয়ে গেছে, কিন্তু কর্তা তবু অশান্ত। তাঁর দেহ যত ছটফট করছে, মন ছটফট করছে তার চাইতে বেশি। তাঁর মন বলছে এ-যাত্রা অ্যালো-প্যাথি-ফ্যালোপ্যাথির কর্ম নয়, ওষুধে কিচ্ছু হবে না, এ ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে হলে একমাত্র ভরসা গুরুকৃপা এবং তাঁর মন যা বলছে সেইটে যথাসাধ্য জোর গলায় মুখে বলে তিনি বাড়িশুদ্ধ সবাইকে শোনাচ্ছেন।

কর্তার কথা শুনে গৃহিণী বিশেষ উদ্বিগ্ন। কর্তার মতো তিনিও গুরুভক্ত। কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ওষুধে কিচ্ছু হবে না, কর্তার এই কথাটা শেলের মতো বিঁধছে অ্যালোপ্যাথ কৃতান্ত ডাক্তারের বুকে। এ গাঁয়ের সবাই তাঁকে বলে ধন্বন্তরী—না বলে উপায়ও নেই, কারণ এ গাঁয়ে তিনিই একমাত্র ডাক্তার – তাঁর ওষুধে কিচ্ছু হবে না, এমন কথা এ গাঁয়ের আর কেউ কখনো বলে নি। এ কথা বলে কর্তা যেন একটা প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মেরেছেন কৃতান্ত ডাক্তারের মুখের ওপর। কৃতান্ত ডাক্তারও তাই পালটা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলে গেছেন, তিনি যে মিক্‌সচারটি দিয়েছেন সেটি একেবারে মোক্ষম দাওয়াই, তাতে যদি 'কিচ্ছু' না হয় তা হলে তিনি দু হাতে চুড়ি পরবেন।

কর্তা বলেছেন "গিন্নি, আমি টেঁসে গেলে তারপর কেতান্ত ডাক্তার দু হাতে চুড়ি পরলেই বা তোমার কি ফায়দা ?" গিন্নি ভেবে দেখেছেন কথাটা কর্তা মন্দ বলেন নি।

কর্তার বড়ো ছেলে উচ্চশিক্ষিত, অর্থাৎ ম্যাট্রিক ফেল।

উচ্চশিক্ষা লাভ করে তার একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হয়েছে। সন্ন্যাসী বাবার ওপর তার ভক্তির অভাব নেই। আধ্যাত্মিক ব্যামোতে তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব ফলপ্রদ হবে এ-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ, কিন্তু দেহের ব্যামোতে অ্যালোপ্যাথির চাইতে সন্ন্যাসী বাবার অধ্যাত্মোপ্যাথি বেশি কার্যকরী হবে এটা তার ম্যাট্রিক-ফেল মন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। পিতৃভক্তিরও অভাব নেই তার, কিন্তু পিতৃদেবের এই অ্যালোপ্যাথি-তাচ্ছিল্য এবং "গুরু কৃপাহি কেবলম্" তার ভালো লাগছে না। মা বলেছিলেন, "খোকা, আমার মনে হয় কেতান্ত ডাক্তারের মিক্‌সচার বন্ধ করে বরং গুরুদেবের চরণামৃত—" আর খোকা মাকে প্রায় ধমক দিয়েই থামিয়ে দিয়েছিল, গুরুদেবকে খবর পাঠাতে রাজী হয়নি।

খোকা বিকেলবেলা কৃতান্ত-মিক্‌সচারের তৃতীয় দাগ খাওয়াতে গেল কর্তাকে। বড় ছেলের হাতে কর্তা তৃতীয় দাগ খেলেন, কিন্তু দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করতে লাগলেন, "এ ওষুধে কিচ্ছু হবে না। গুরু কৃপাহি কেবলম্। গুরুদেব—গুরুদেব—গুরুদেব !"

বড়ো ছেলে কিছুক্ষণ তৃতীয় দাগের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে তারপর বললে, "এখন একটু ভালো বোধ করছ তো বাবা ?" কৃতান্ত ডাক্তার জোর গলায় বলে গেছেন, তিন দাগ ওষুধ খাওয়ার পর কর্তা যদি প্রচুর আরাম বোধ না করেন তা হলে মেটিরিয়া মেডিকা মিথ্যে, ফার্মাকোপিয়া মিথ্যে।

কর্তা অবসন্ন হতাশ-ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে বললেন, "ভাল নয়, ভাল নয়, একেবারে ভাল নয়। অ্যালোপ্যাথির বাবাও এখন-কিছু করতে পারবে না। এখন শুধু – গুরু কৃপাহি কেবলম্ ! জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।"

এমন সময় অলৌকিক ব্যাপার। বড়ো কর্তা তৃতীয়বার "জয় গুরু" উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই জলদ-গম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হলো, "বোম ভোলা শিব মহেশ্বর। ব্যোম ব্যোম ব্যোম !"

চমকিত হয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখা গেল দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী। রোগশয়ান বড় কর্তা বিস্ময়ে আনন্দে আত্মহারা

হয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন, "গুরুদেব ! গুরুদেব ! ভক্তের ডাক আপনি শুনতে পেয়েছেন !"

গুরুদেব অর্থাৎ সন্ন্যাসী বাবা স্নিগ্ধ প্রশান্ত-কণ্ঠে বললেন, "পেয়েছি।"

শুনে আমার নাবালক মন সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। বড় কর্তার বাড়ি থেকে সন্ন্যাসী বাবার আস্তানা বেশ-কিছুটা দূর। রোগশয়ান বড় কর্তার ডাক অত দূর থেকে কি করে তিনি শুনতে পেলেন, আর শুনতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এতটা পথ পেরিয়ে কি করে এসে হাজির হলেন, তার কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না।

মনে হল বড় কর্তার বড় ছেলেও বিস্মিত হয়েছে, অন্তত বিব্রত তো বটেই।

আবদেরে ছেলে তার আবদার-সহিষ্ণু বাপকে দেখে যেমন করে থাকে, অনেকটা তেমনি করে বড় কর্তা কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বললেন, "আমি আর বাঁচব না। এ-যাত্রা আমি বাঁচব না গুরুদেব।"

চৌকাঠ পিছনে ফেলে রোগীর শয্যার দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী বাবা। দুই চোখে আশ্চর্য করুণা-মধুর দৃষ্টি। মুখে অতুলনীয় হাসি। বললেন, "আরো অনেকদিন বাঁচবি।"

বড় কর্তা বললেন, "যদি আপনি দয়া করে বাঁচান, গুরুদেব।"

সন্ন্যাসী বাবা বললেন, "বাঁচাবো।"

"কিন্তু গুরুদেব –" বললেন বড় কর্তা।

"কিন্তু নয়," বললেন সন্ন্যাসী বাবা, "বাঁচবি।"

বড় কর্তা বললেন, "গুরুদেব, আর খাব না কেতাস্ত ডাক্তারের ঐ মিক্‌স্‌চার।"

সন্ন্যাসী বাবা বললেন, "আলবৎ খাবি"। শুনে খুশি হয়ে উঠল কর্তার বড় ছেলে। কারণ গুরুদেবের হুকুম বাবা তামিল না করে পারবেন না।

বড় কর্তার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে অভয় দিয়ে চলে গেলেন সন্ন্যাসী বাবা। যাবার পথে বড় গিন্নি একটি পাত্রে জল নিয়ে সন্ন্যাসী বাবার ডান পায়ের কাছে ধরে প্রার্থনা জানালেন, "শ্রীচরণের বুড়ো আঙুলটা জলে একটু ডোবান বাবা।"

ডোবালেন সন্ন্যাসী বাবা। সবটা জল চরণামৃত হয়ে গেল। চলে গেলেন সন্ন্যাসী বাবা।

কর্তাকে এক চামচ চরণামৃত সেবন করিয়ে দিলেন গিন্নি। তারপর দুদিনে পুরোপুরি ভালো হয়ে উঠলেন বড় কর্তা। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

কৃতান্ত ডাক্তার বুক ফুলিয়ে বললেন, "বলেছিলাম না, ঐ মিক্‌স্‌চার যদি মোক্ষম না হয় তা হলে দু-হাতে চুড়ি পরবো?"

বড় কর্তার ম্যাট্রিক-ফেল বড় ছেলেও কৃতান্ত ডাক্তারের কৃতিত্বে কৃতজ্ঞ এবং মুগ্ধ। কিন্তু বাড়ির গিন্নিমার নিশ্চিত বিশ্বাস কর্তাকে সারিয়ে তোলার পুরো কৃতিত্ব যদি কেউ দাবি করতে পারে তো সে সন্ন্যাসী বাবার চরণামৃত।

কর্তা বললেন, "ঐ যে গুরুদেব বলেছিলেন 'বাঁচবি', ব্যস, ঐতেই যমের মুখে লাথি। ওঁর শ্রীমুখের বাণী তো মিথ্যে হবার নয়। চরণামৃতটা হলো তারপর উপ-লক্ষ মাত্র। তবে হ্যাঁ—চরণামৃত খেয়েই এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠলুম বটে।"

গিন্নি বললেন, "আমার তো মনে হয় এ গাঁয়ে বাবা থাকতে কেতান্ত ডাক্তারের কোনো দরকার নেই। বাবার চরণাম্মেত খেলেই সব ব্যামো ভালো হয়ে যায়।"

কর্তা বললেন, "গুরুদেব রাজী হবেন না। জানো তো ওঁর কি-রকম দয়ার শরীর? দেখলে তো আমায় জোর হুকুম করে কেতান্ত ডাক্তারের মিক্‌স্‌চার পুরো খাইয়ে ছাড়লেন? নইলে কেতান্ত ডাক্তার খাবে কি?"

আজ মনে হচ্ছে বড কর্তা যে অত তাডাতাড়ি সেরে উঠেছিলেন তার মূলে কৃতান্ত ডাক্তারের ওষুধের গুণ থাকা অসম্ভব নয়। অথবা ওটা হয়তো বিশ্বাসের ফলে আরোগ্যের (ইংরাজিতে যাকে বলে 'ফেইথ কিওর') একটি উদাহরণ। কিংবা হয়তো অসুখ ঠিক ঐ সময় এমনিতেই সারত, শুধু ঐ যোগাযোগের ফলে 'ঝড়ে কাক মরল, আর ফকিরের কেরামত বাড়ল'।

কিন্তু সন্ন্যাসী বাবা কি করে শুনতে পেয়েছিলেন কর্তার ডাক? আর কি করে অত তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ডাকের মুখোমুখি? আমার মনে হয় গিন্নিই গোপনে তার অনেকক্ষণ আগে সন্ন্যাসী বাবাকে নিয়ে আসবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন, কর্তাকে বা বড়ো ছেলেকে না জানিয়ে।···

পাশের বাড়িতে সেই প্রথম দেখার পর আরো কয়েকবার সন্ন্যাসী বাবাকে দেখেছিলাম, তাঁর সম্বন্ধে আরো অনেক কথা শুনেছিলাম, তাঁর চরিত্র-মাধুর্যের এবং নিঃস্বার্থ মহত্ত্বেরও অনেক প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলাম। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং আদর্শে সেই গ্রামের বহু উন্নতি, বহু উপকার হয়েছিল। তিনি 'মহাপুরুষ' ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু মহৎ লোক ছিলেন সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি সেই গ্রাম থেকে ফিরে আসবার বছর-কয়েক পরে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইকে কাঁদিয়ে তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন। সামান্য

কয়েকটা দিন তাঁকে দেখেছিলাম, তবু এত বছর পরেও আমার স্মৃতি থেকে তিনি মুছে যান নি। তাঁর কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনে করে কৌতুক বোধ করি যে, তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণাবলীর সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে উঠেছিল এই একটি পরিচয় যে, তিনি টিকেকে বাতাসা বানাবার যাদু জানেন। তাঁর পসারের (পসার কথাটা এখানে শ্রেষ্ঠতম অর্থে ব্যবহার করছি) পত্তন করে দিয়েছিল একটি সাধারণ যাদু বা ভোজবাজির খেলা, যার ভেতর অলৌকিক কিছুই ছিল না। অথবা হয়তো যে সময়ে যে পরিবেশে যে আবহাওয়ায় তিনি টিকেকে বাতাসায় পরিণত করেছিলেন, তাতে বিশেষ করে তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণে—সাধারণ লৌকিক যাদুর খেলাকেই অসাধারণ, অলৌকিক যাদু বলে মনে হয়েছিল সবার। সন্ন্যাসী বাবা কোনোকালে হয়তো শখ করে যাদুর খেলা দুটো-চারটে শিখেছিলেন, আমরা বিদেশী ভাষা থেকে ধার করে আজকাল চলতি কথায় যাকে 'ম্যাজিক' বলি। হয়তো তিনি একদিন (অথবা এক রাতে) তামাশা করে একটি টিকেকে বাতাসা বানিয়েছিলেন, তখন হয়ত ভাবতেও পারেন নি তাঁর অলৌকিক (?) শক্তির ঐ প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল অমন সুদূরপ্রসারী হবে। অর্থাৎ কৌতুকচ্ছলে যে হাত-সাফাই-এর খেলা দেখিয়েছিলেন, তাকে নিছক কৌতুকের ব্যাপার মনে না করে সবাই ব্যাপারটাকে অমন 'সিরিয়াস'ভাবে নেবে তা তিনি ভাবেন নি।

আমার অনুমান (অর্থাৎ 'হয়তো') কিন্তু এখানেই থেমে না থেকে আর একটু দূরে এগিয়ে যায়। আমার মনে হয় সন্ন্যাসী বাবা যখন দেখলেন তাঁর ঐ নিতান্ত লৌকিক যাদুর খেলাটিকেই গ্রামের লোকেরা অকৃত্রিম অলৌকিক যাদু বলে নিঃসন্দেহে পরম শ্রদ্ধাভরে মেনে নিয়ে মুগ্ধ হয়েছে, তখন ভাবলেন সাধুতা করে রহস্যটি ভেদ করে দিয়ে তাদের প্রিয় ভুলটিকে ভেঙে দেওয়াটা সহৃদয়তার, সুবুদ্ধির বা সুবিবেচনার কাজ হবে না। নিজের এই ফাঁকির খেলাটাকে নিজেই ফাঁকি বলে ধরিয়ে দিলে তারপর এরা তাঁর সব খাঁটি জিনিসগুলোকেও ফাঁকি, মেকি বা ধাপ্পা বলে মনে করবে, নির্ভেজাল সদুপদেশ বা হিতোপদেশ দিলেও ভাববে এর ভেতর কোথাও মস্ত ফাঁকি বা ফাঁক লুকিয়ে আছে। সেই ভয়েই —এবং এ-ভয়টা কিছু অস্বাভাবিক বা অনুচিতও নয়—সন্ন্যাসী বাবা এ ব্যাপারে * মুখ খোলার বাসনা জোর করেই চেপে গিয়েছিলেন।

* এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল বিলেতের একটি গ্রামের গির্জার একজন সজ্জন পাদরির কাহিনী। পাদরিটি ভোরাই বা সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়ে মাঝে মাঝে গরিব

মধ্যবিত্ত বাড়িতে হঠাৎ হানা দিতেন। তাঁর হাতে থাকত ভ্রমণ করবার লাঠি, যাকে বলে 'ওয়াকিং স্টিক'। উনুনের ওপর চাপানো শূন্য পাত্রে পাদরি সাহেব তাঁর লাঠির ডগাটি ঢুকিয়ে পাত্রের ওপর নাড়তে থাকতেন। কিছুক্ষণ বাদে দেখা যেত পাত্রের ওপর যেন যাদুমন্ত্রের ডিমের একটি ওমলেট তৈরি হয়ে গেছে। বাড়ির লোকদের বিস্ময়ের সীমা থাকত না, বিশেষ করে সেই যাদু ওমলেট যখন তাঁরা সত্যি-সত্যি খেয়ে দেখতেন।

এ ব্যাপারের গোপন রহস্যটুকু এই যে, পাদরি সাহেবের লাঠিটি ছিল ফাঁপা, এবং নীচের মুখটি খোলা। সেই খোলা মুখ দিয়ে তিনি ফাঁপা লাঠির ভেতর আগে থেকেই ভরে রাখতেন বেশ পুরুষ্টু একটি ওমলেট বানাতে যা যা দরকার। তারপর মুখটি আটকে দেওয়া হতো মোম দিয়ে, যেন ফাঁপা লাঠির ভেতরে লুকানো জিনিস যথাসময়ের আগেই বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে। যথা-সময়ে গরম পাত্রের সংস্পর্শে এসে লাঠির ডগার মোম গলে গিয়ে ভেতর থেকে ওমলেট তৈরির জিনিসগুলো পাত্রের ওপর এসে পড়ত এবং ওমলেট তৈরি হত। এমনিতেই তাঁর মহৎ চরিত্রের জন্য তিনি গ্রামের সবারই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তার ওপর তাঁর এই অলৌকিক (?) ওমলেট তৈরির যাদুতে সবাই আরও মুগ্ধ হয়েছিল। বলাই বাহুল্য—পাদরি সাহেবের পসারও অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

আধ্যাত্মিক ধর্মোপদেষ্টারাই বলেন যে, আধ্যাত্মিক জীবনে আত্মার উৎকর্ষ বা চরিত্রের মহত্ত্বই প্রধান কথা, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ নিম্নস্তরের 'বুজরুকি' মাত্র। কিন্তু পৃথিবীর ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে ধর্ম বা অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচারে অলৌকিক (?) যাদু কম কাজ করেনি। মানুষ বরাবরই—সচেতনভাবেই হোক বা অচেতনভাবেই হোক—'মিরাক্‌ল্‌'-এর মহাভক্ত। সাধারণ বা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে যা অসম্ভব, তাকেই অলৌকিক উপায়ে সম্ভব হতে দেখলে মানুষের মন রোমহর্ষণের আনন্দে আত্ম-হারা হয়। মহত্ত্বের চাইতে অলৌকিক ক্ষমতার মর্যাদা সাধারণ মানুষের কাছে অনেক, অনে—ক বেশি। অথবা সোজা কথায়, সাধারণ মানুষের কাছে খাঁটি মহত্ত্ব বা উৎকর্ষের চাইতে যাদুর দাম বেশি। মানুষের মন থেকে ম্যাজিকের এই মোহ কোনোদিন দূর হবে কি?

তাই ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা, ধর্ম-প্রচারক এবং গুরুদের জীবনে অলৌকিক যাদুর বা 'মিরাক্‌ল্‌'-এর প্রাচুর্য। মানুষ যখন নানারকম অজ্ঞতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, প্রকৃতির অনেক সাধারণ নিয়ম বা তথ্য তখন ছিল অসাধারণ রহস্যময়,

বিজ্ঞান তখনও অনগ্রসর, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনোবৃত্তি অবৈজ্ঞানিক। তাই যাতে অলৌকিক যাদু বা 'মিরাকল্' নেই তাতে সাধারণ মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা হতো না। এই কারণেই ধর্ম প্রতিষ্ঠায় বা প্রচারে যাদুর অমন প্রাধান্য ছিল।

এখানে ব্র্যাকেটে একটি কথা বলি।

(বর্তমান যুগেও দেখা যায়, বিভিন্ন আধ্যাত্মিক গুরুর ভক্ত-শিষ্যেরা তাঁদের নিজ নিজ গুরুর জন্মকেও অলৌকিক যাদু-মাহাত্ম্যে মণ্ডিত বলে প্রচার করতে বদ্ধপরিকর। আমরা সাধারণ মানুষ যেভাবে পুরুষ ও নারীর মিলনে জন্মগ্রহণ করি, এই মহাপুরুষদের জন্ম—তাঁদের ভক্ত-শিষ্যদের মতে—সেভাবে হয় নি। এই মনোবৃত্তির মূলে সূক্ষ্মভাবে আমাদের অবচেতন মনের যাদু-প্রীতিই কাজ করছে না কি? আমরা সাধারণ গড্ডলিকা-প্রবাহের মানুষ কি লজিকের চাইতে ম্যাজিকের দ্বারাই বেশি অভিভূত হই না?)

'ম্যাজিক' বা যাদু-বিদ্যার ইতিহাসের গোড়ার দিকে ছিল বিজ্ঞানের শৈশব অবস্থা, মানুষের সমাজ মগ্ন ছিল অজ্ঞানের অন্ধকারে, আর তারই ফলে সাধারণ মনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। (এখানে আবার একটা কথা ব্র্যাকেটে বলা দরকার মনে করছি। ইংরাজিতে 'সুপারস্টিশন' বলতে যা বুঝি, কুসংস্কার শব্দটি আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি অন্য কোনো যোগ্যতর প্রতিশব্দ না পেয়ে। কিন্তু ব্যবহার করে খুশী হতে পারছি না সংস্কারের আগে ঐ 'কু'-টা থাকার জন্য। কারণ সুপারস্টিশনের সবটুকুই 'কু' নয়, তাতে 'সু'-ও একেবারে অনুপস্থিত নয়।) মানুষ সহজে বিস্মিত হত, সহজে শ্রদ্ধান্বিত হত, সহজে অভিভূত হত, সহজে বিশ্বাস করত। সহজ কল্পনা-প্রবণতা এবং বিশ্বাসপ্রবণতার ফলেই বুঝি বা ফাঁকি-ভরা বুজরুকি বা ভেল্কি-বাজিকে খাঁটি অলৌকিক যাদু বলে বিশ্বাস করাই তাদের পক্ষে সহজ, হয়ত অবশ্যম্ভাবীই ছিল। সুতরাং মুষ্টিমেয় কিছু কিছু বুদ্ধিমান লোক—এঁদের ভেতর অধিকাংশই পুরোহিত হতেন—সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নানারকম অলৌকিক যাদু দেখিয়ে তাঁদের বিস্ময়ে (কখনো বা ভয়েও) অভিভূত করতেন।

বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' অংশে (এক্সোডাস, সপ্তম অধ্যায়) বর্ণিত একটি কাহিনী থেকে প্রাচীন মিশরে যাদু-বিদ্যার প্রচলন সম্পর্কে খানিকটা আভাস পাই। কাহিনীর একটি অংশ এইরকম :

"আরন তাঁর হাতের দণ্ডটি মিশরাধিপতি ফারাও-এর এবং তাঁর ভৃত্যদের সামনে মাটিতে ফেলে দিতেই সেটি একটি সাপে পরিণত হলো।

"ফারাও তখন মিশরের জ্ঞানীদের এবং যাদুকরদের ডেকে আনালেন। তাঁরাও এসে তাঁদের যাদুবলে ঠিক তাই করে দেখালেন। তাঁরাও প্রত্যেকে যাঁর যাঁর হাতের (কাঠের তৈরি) দণ্ড মাটিতে ফেলে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি দণ্ড সাপে পরিণত হলো।* কিন্তু আরনের দণ্ড থেকে তৈরি সাপটি এইসব সাপগুলোকে এক এক করে গিলে ফেলল।"

এইভাবে শুরু হল আরনের যাদুর সঙ্গে মিশরের যাদুকরদের যাদুর লড়াই। একদিকে মিশরে অবরুদ্ধ ইজরায়েলীদের নেতা-প্রতিনিধি আরন, অন্যদিকে মিশরী যাদুকরের দল। ইজরায়েলীদের মুক্তি নির্ভর করছিল প্রতিযোগিতায় আরনের জয়লাভের ওপর। সুতরাং ইজরায়েলী এবং মিশরী দু' পক্ষই মনে প্রচুর উত্তেজনা নিয়ে এই যাদুর লড়াই দেখেছিল, এটা অনায়াসেই কল্পনা করে নেওয়া যায়।

এরপর আরন মিশরের নীল নদের জলকে তার যাদুময় দণ্ডের আঘাতে লাল করে দেখালেন। মিশরী যাদুকররাও তাঁদের যাদুদণ্ড দিয়ে তাই করে দেখালেন। ইজরায়েলী পুরোহিত আরন তারপর কয়েকবার হাওয়ায় দোলালেন তাঁর যাদু-দণ্ড। সেই যাদুর আকর্ষণে কোথা থেকে এসে হাজির হল ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যাঙ। এ ব্যাপারে মিশরী যাদুকররাও কম গেলেন না — তাঁরাও তেমনি যাদুদণ্ড দুলিয়ে ব্যাঙ-এর আমদানী করে দেখালেন। এভাবে পর পর কয়েক বাজি যাদুকর আরনের সঙ্গে লড়ে শেষ পর্যন্ত যাদুর লড়াইতে হেরে গেলেন মিশরী যাদুকরেরা।

সেই সুদূর অতীতের মিশর দেশ থেকে ১৯৩১ খৃস্টাব্দের কলকাতা শহর অনেক দূর, তবু যাদুর লড়াই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল ১৯৩১ সালের ১৫ই নভেম্বর বৌবাজার অঞ্চলের এখন যেখানে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, সেখানে একটি স্বদেশী মেলা বসেছিল। এর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ৺জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। সেই মেলায় একদিন সন্ধ্যায় একটি যাদু-সম্মেলন (যাদুকরদের কুম্ভমেলা) অনুষ্ঠিত

* গত শতাব্দীর বিখ্যাত যাদুকর রবার্ট হেলার (১৮৩৩-১৮৭৮) তাঁর প্রাচ্য ভ্রমণকালে কায়রো শহরে দরবেশদের এই যাদুর খেলাটি দেখাতে দেখেছেন। আসলে তাঁদের যাদুলাঠিগুলোই ছিল এক-একটি ছোট সাপ, বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্মোহিত করে তাদের ঐ-রকম অজ্ঞান, সোজা আর শক্ত করে রাখা হতো যেন সোজা ডাণ্ডার মতো দেখায়। মাটিতে আছড়ে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গেই সম্মোহন-মূর্ছা ভেঙে গিয়ে সাপগুলো জীবন্ত হয়ে নড়ে-চড়ে উঠত। হেলার বলেছেন, "আমি এ ব্যাপার দেখেছি সম্পূর্ণ খোলা জায়গায়। কিন্তু খোলা জায়গায় না হয়ে এ খেলা যদি আধো অন্ধকার গৃহ বা মন্দিরের অভ্যন্তরে রহস্যময় পরিবেশে দেখান হয়, তবে আসল রহস্যটুকু যাদের জানা নেই, তাঁরা যাদুদণ্ডের সর্পে রূপান্তরকে অলৌকিক ব্যাপার বলেই মনে করবেন, এতে আর আশ্চর্য কি"?

হয়েছিল। এই সম্মেলনে বিখ্যাত যাদুকর গণপতিও (শ্রীগণপতি চক্রবর্তী) ছিলেন। 'যাদু' এবং 'গণপতি' আমাদের কাছে তখনকার দিনে প্রায় সমার্থ-বোধক ছিল। তাঁর যাদু ক্ষমতার অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত—এমন-কি কখনো কখনো লোমহর্ষক-কাহিনী প্রচলিত ছিল যাদের ভেতর অনেকগুলিকে গাঁজা-খুরি গল্পের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। কেউ কেউ বলতেন তিনি ছিলেন ভূতসিদ্ধ, এবং তিনি যে সব অদ্ভুত খেলা দেখাতেন তা ভৌতিক সাহায্য ছাড়া দেখানো কখনোই সম্ভব হতে পারে না। খেলা দেখাবার স্টাইল বা ভঙ্গী একটু সেকেলে হলেও যাদুপ্রদর্শনে বাস্তবিকই তাঁর বিস্ময়কর দক্ষতা ছিল। বিশেষ করে বিভিন্ন রকম বন্ধন বা বন্দী অবস্থা থেকে দ্রুত মুক্ত হয়ে আসবার খেলাগুলো তিনি প্রায় নিখুঁতভাবে দেখাতেন।

এই সম্মেলনে গণপতি দেখালেন তাঁর পলায়নী খেলা। ইংরেজিতে এই ধরনের খেলাকে বলা হয় 'এসকেপস্' (escapes)—যাদুবিদ্যার এই বিভাগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী যাদুকর রূপে বিখ্যাত হয়ে আছেন ইহুদী যাদুকর হ্যারি হুডিনি (Harry Houdini)। এই অসাধারণ রহস্যময় যাদুকরের বিস্ময়কর অনেক কাহিনী পরে বলা যাবে। বর্তমানে ফিরে আসা যাক গণপতিতে।

গণপতি দেখালেন একটি কাঠের বাক্সের ভেতর তাঁকে পুরে বাক্সটি তালাবন্ধ করে দিলেও কত অনায়াসে এবং কত তাড়াতাড়ি তিনি তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন, আবার তার ভেতরে ঢুকে যেতে পারেন ; অথচ একবার বেরিয়ে এসে তারপর চট করে তিনি বাক্সের ভেতর ঢুকে গেলে দেখা যায় বাক্স তেমনি নিখুঁতভাবে তালাবন্ধ এবং দড়ি দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা আছে। তালা খুলে বাক্সের ডালা তুলতে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন গণপতি, যিনি একটু আগেই বন্ধ বাক্সের ভেতর থেকে রহস্যময় ভাবে বেরিয়ে এসে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। গণপতিকে বাক্সে ঢোকাবার আগে যেমন দর্শকদের তরফ থেকে তন্ন তন্ন করে বাক্স এবং তালা পরীক্ষা করা হয়েছিল, তালা খুলে তাঁকে বার করে আনার পরও বাক্স এবং তালা তেমনি করে পরীক্ষা করা হলো। কিন্তু দেখা গেল বাক্সে বা তালায় কোনোরকম কারসাজি নেই। তাহলে যাদুকর গণপতি অমন অনায়াসে বন্ধ বাক্সের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আবার ভেতরে ঢুকে যেতেন কি করে? সেইটেই ছিল রহস্য।

খেলাটি আমাকে—এবং মনে হয় উপস্থিত সবাইকেই—বিস্ময়মুগ্ধ করেছিল। আমার আশেপাশে দু-চারজনকে বলতে শুনেছিলাম ভূতসিদ্ধ না হলে অমন

ভূতুড়ে কাণ্ড করা যায় না। পরে এই খেলাটিই একাধিক যাদুকরকে দেখাতে দেখেছি, কিন্তু সে রাতে গণপতির খেলাটি দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলাম, তেমন মুগ্ধ পরে আর কখনো হইনি।

সে রাতের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ যাদুকর বলে বিবেচিত হলেন যাদুকর রাজা বসু, তাঁর বিস্ময়কর পিপের খেলা (Barrel Illusion) দেখিয়ে।*

খেলাটি এই রকম। স্টেজের ওপর একটি পিপে দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপরে বাক্সের ডালার মতো একটি ডালা, সেটি তালা দিয়ে আটকে দেবার ব্যবস্থা আছে। প্রথমে যাদুকরের অনুরোধে কয়েকজন দর্শক এসে পরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হলেন যে পিপেতে, ডালায় বা তালায় কোনোরকম চালাকি করা নেই, এবং কাউকে পিপের ভেতরে পুরে দিয়ে (পিপের ভেতরে একজন মানুষের কোনোরকমে বসে থাকবার মতোই জায়গা মাত্র ছিল) ডালা চেপে তালাবন্ধ করে দিলে সে ব্যক্তির পক্ষে পিপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা কোনো লৌকিক উপায়েই সম্ভব নয়।

যাদুকর রাজা বসু তখন তাঁর সহকারীকে পিপের ভেতর ঢুকতে বললেন। সহকারীটি পিপের ভেতর ঢুকে গেলে পিপের ডালা চেপে তালাবন্ধ করে দেওয়া হলো। চাবি রইল দর্শকদের কাছে।

রাজা বসু—বরং রাজা বোসই বলি, ঠিক যেভাবে তাঁর নামটি উচ্চারণ করা হতো—তখন পিপের ডালার ওপর উঠে দাঁড়ালেন একটি চাদর হাতে। চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকেই তিনি পিপের ওপর বসে পড়লেন, আর সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে চাদরটি ফেলে দিলেন স্টেজের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে এক সেকেণ্ড দর্শকেরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে রইলেন বিস্ময়ে। তারপর হাততালির উল্লাস-অভিনন্দন। রাজা বোস আর রাজা বোস নেই, হয়ে গেছেন সেই সহকারী, যাকে একটু আগে পিপের ভেতরে বন্দী করে তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল!!! তালা খুলে পিপের ডালা তুলতেই দেখা গেল পিপের ভেতরে কুঁকড়ে বসে আছেন যাদুকর রাজা বোস!!

* বয়োবৃদ্ধ সবমান্য যাদুকর গণপতিকে প্রতিযোগিতার মধ্যে ধরা হয়নি। তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁকে একটি স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়েছিল। উক্ত যাদু-কুম্ভমেলায় আরও যে সব যাদুকর যাদুপ্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নাম অমর গাঙ্গুলী, গোলোকবিহারী ধর, নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কে. এল. গোস্বামী, প্রোঃ রেনন (রণেন্দ্র দত্ত), এ. মজুমদার এবং প্রোঃ জি. কুমার। জনপ্রিয় কৌতুকরসিক এবং সংগীতজ্ঞ যাদুকর প্রোঃ বিমল গুপ্ত যোগ দেননি; তিনি তখন কলকাতার বাইরে ছিলেন। প্রতিযোগিতায় প্রোঃ জি. (গীতেন্দ্রকুমার দ্বিতীয়, এবং নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তৃতীয় হন।

একজন যাদুকরের কথা

"বহু রূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?"

স্বামী বিবেকানন্দের এই বিখ্যাত উক্তিটি আবৃত্তি করলেন যাদুকর রাজা বোস। সঙ্গে-সঙ্গে যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর দুটি চোখ। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের কথা, কিন্তু স্মৃতিকথা লিখতে বসে সে ছবি আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে।

কথা বলছিলাম যাদুকর রাজা বোসের সঙ্গে কলকাতায় বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় বসে।

"আশ্চর্য এই কথাটুকু।" বললেন তিনি। "একেবারে মর্মে গিয়ে বেঁধে। ঈশ্বর মানুষের রূপেই নানাভাবে রয়েছেন আমাদের চোখের সামনে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তিনি রয়েছেন, কিন্তু অন্ধ আমরা তা দেখেও দেখছি না, খুঁজে বেড়াচ্ছি কোথায় ঈশ্বর? কোথায় ঈশ্বর?"

শুনে বিস্মিত হলাম। এত বিস্মিত বোধকরি স্টেজে তাঁর ম্যাজিক দেখেও কখনো হইনি। এ আলাপের সময় তিনি ম্যাজিক দেখানো একরকম ছেড়েই দিয়েছেন, বিদায় নিয়েছেন যাদুকর জীবন থেকে। কিন্তু অবসর-প্রাপ্ত যাদুকরের মুখেও এ ধরনের দার্শনিক বচন আশা করিনি।

আমার বিস্ময় বুঝতে পেরেই হয়তো তিনি হাসলেন একটু। বোধহয় কথাটা যে তিনি অযাদুকরোচিত বা অবান্তর বলেননি সেইটে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার মনে করেই বললেন, "বিলেতে থাকতে একটা কথা শুনেছিলাম; 'ওয়ান্‌স্ এ ম্যাজিশিয়ান, অল্‌ওয়েজ এ ম্যাজিশিয়ান।' যাদুকর একবার হওয়া মানেই চিরজীবনের জন্যে হওয়া। কথাটা মিছে নয় বুঝতে পারছি। সেই কবে ম্যাজিক দেখানো থেকে অবসর নিয়েছি, তবু এখনো বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, চেনাশোনা মহলে মাঝে-মাঝে হঠাৎ ফরমায়েস আসে: ম্যাজিক দেখাও। প্র্যাকটিস নেই; অনভ্যাসে শুধু বিদ্যা হ্রাসই হয়নি, নিজের ওপর আস্থাও হ্রাস পেয়েছে; তবু উপায় নেই, দাবি মানতেই হয়। কারণ দাবিওয়ালাদের বিশ্বাস সাঁতার আর ম্যাজিক একবার যে শেখে সে আর ভোলে না। অগত্যা ছোটো-ছোটো খেলা দেখাই, যাকে ইংরেজিতে বলে ইমপ্রম্‌চু কনজ্যুরিং (impromptu

conjuring), অর্থাৎ এমন খেলা যাতে খুব বেশি আগাম তৈরি বা সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ দরকার হয় না। যেমন লম্বা একফালি কাগজকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে যাদুমন্ত্রে ফের আস্ত ফালি করা, এক টুকরো দড়িকে কেটে দু টুকরো করে ফের আস্ত বানানো, রুমালের রং বদলানো, যাদুমন্ত্রে রুমালের গেরো খোলা, অদৃশ্য টাকাকে দৃশ্য আর দৃশ্য টাকাকে অদৃশ্য করা, এমনি সব ছোটোখাটো ভেলকি আর ভোজবাজি।"

"তার ফলে···?"

"তার ফলে আমার দর্শকদের বিস্ময়ে অবাক হওয়াটা খাঁটি না জাল তা জানি না।" বললেন যাদুকর রাজা বোস। "ধরে নিলাম তাঁদের সেই বিস্ময় খাঁটি, তাতে এতটুকু ভেজাল নেই। কিন্তু তাঁদের সে বিস্ময় যেন সমুদ্রে শয়ন করে শিশিরের ছোঁয়ায় চমকে ওঠা। প্রতিদিন চোখের সামনে আমরা বিরাট রহস্যের খেলা দেখছি : চাঁদ-সূর্যের উদয়-অস্ত ; রাতের আকাশে অগুনতি তারার ঝিকিমিকি, জন্ম-মৃত্যুর চিরন্তন লীলা; বিরাট দুনিয়াকে দেখা ছোটো দুটি চোখের তারা দিয়ে , সবার ওপর কী আশ্চর্য এই আমি, মানে যে-কোনো আমি, আর কী অসীম আশ্চর্য আমার, মানে যে-কোনো মানুষের, মনের সমুদ্র। বিরাট রহস্য পাইকারীরূপে আমাদের সম্মুখে, তাতে যে আমাদের এতটুকু বিস্ময়-বোধ নেই, সেই আমাদের বিস্মিত করছে কিনা ছেঁড়া কাগজের ফালি কি করে আস্ত হলো, অথবা শূন্য টুপির ভেতর থেকে কি করে পাখির খাঁচা বেরলো, তারই খুচরো রহস্য!"

অর্থাৎ : "বহু রূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ বিস্ময়?"

এই প্রশ্ন করতে চাইছেন যাদুকর রাজা বোস।

মনে পড়লো ভিক্টোরিয়ান যুগের মনীষী কার্লাইলের একটি কথা। তিনি বলেছেন, আগুন, ভগবানের একটি মিরাক্‌ল্ (miracle), এককালে আমাদের পরম বিস্ময়ের বস্তু ছিল যখন আমরা অসভ্য অথবা প্রায়-অসভ্য ছিলাম। আমাদের সেই বিস্ময়ে মিশে ছিল ভীতি আর শ্রদ্ধা। আমরা তখনো তাকে কোনো নামের বাঁধনে বাঁধিনি। সভ্য হয়ে আমরা সেই বিস্ময়ের বস্তুটির নামকরণ করলাম : 'ফায়ার' (fire), আগুন। তারপর থেকে আগুন সম্বন্ধে আর আমাদের সেই বিস্ময়-বোধ নেই, যেন ঐ নামকরণেই আমাদের কাছে আগুনের রহস্য ফুরিয়ে গেছে। এ কথা বললাম যাদুকর রাজা বোসকে।

"এ বিষয়ে কার্লাইলের সঙ্গে আমি একমত।" বললেন তিনি। "যদিও

কার্লাইল আমি পড়িনি। জানেন তো পড়াশুনোর ধার খুব বেশি ধারিনি আমি। আঠারো বছর বয়সে বিলেতে গিয়েছিলাম চামড়ার কাজ শিখতে, কিন্তু বিশ্বের আদি যাদুকর যাকে যাদুকরই বানাবেন, তার সাধ্য কি চামড়া-বিশারদ হবার? শেষ পর্যন্ত চামড়াকে প্রণাম জানিয়ে আমি লেদার এক্স্পার্ট না হয়ে হলাম ম্যাজিশিয়ান। ম্যাজিকের নেশা ছিল ছেলেবেলা থেকেই। এ নেশা প্রথম জাগিয়েছিল বাড়ির রাঁধুনি বামুন। ছোটো দু'চারটে ভোজবাজির খেলা তার জানা ছিল, আর চমৎকার দেখাতো। আমার যাদুজীবনের দীক্ষাগুরু সেই পাঠক ঠাকুর অনেকদিন হলো ইহলোকে নেই, কিন্তু এখনো তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।"

"এদেশে যা ছিল নেশা," একটু থেমে বলতে লাগলেন রাজা বোস, "বিধাতার বিধানে বিলেতে তাই পেশায় পরিণত হলো। অবশ্য একলাফে নয়, 'আই অ্যাওক ওয়ান মর্নিং অ্যাণ্ড্ ফাউণ্ড্ মাইসেল্ফ এ প্রফেশন্যাল' – এমনটি হয়নি। ও দেশে এমন হয়ও না। আপনাকে বলেছি তো বিলেতে চামড়ার কাজ শিখতে গিয়েছিলাম? তখনকার দিনে বিলেত যাওয়াটা এখনকার মতো জলভাত হয়ে ওঠেনি। অসমসাহসিক ব্যাপার না হলেও তার ভেতর বেশ রোমান্স আর অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ ছিল। মনে করুন, এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সুদূর ইংলণ্ডে আঠারো বসন্তের এক তরুণ বাঙালী আমি রিপেন বোস –"

"রিপেন বোস?" প্রশ্ন করলাম যাদুকর রাজা বোসকে।

"হ্যাঁ ওটাই আমার পিতৃদত্ত নাম," বললেন তিনি। "সে যুগের বড়লাট লর্ড রিপনের কথা ভারতের ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছেন। রিপন সাহেবকে বাবা পছন্দ করতেন, তাই ঐ নামের গন্ধ নিয়েই আমার নাম রাখলেন রিপেন্দ্র; তার নৃপেন্দ্র যেমন নৃপেন হয়, তেমনি রিপেন্দ্র হলো রিপেন।"

"কিন্তু রিপেনকে রাজা বানালো কে?"

"ম্যাজিক।" বললেন রাজা বোস। "নাম-মাহাত্ম্য মানেন তো?"

"মানি।"

"তাহলেই এও মানবেন যে বিলেতি রঙ্গমঞ্চে পেশাদার ম্যাজিশিয়ান হয়ে দাঁড়াবার জন্যে রিপেন বোস নামটা খুব হ্যাপি নয়, মানে যথেষ্ট শৌখিন নয়, জোরদার নয়, জাঁকালো তো নয়ই।"

চোখের পলকে ভেবে শিহরিত হলাম বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের নাম যথাক্রমে বিশ্বম্ভর, বাঞ্ছারাম আর ভজহরি হলে কী কেলেঙ্কারিই না হতো!

"আরেকটু আগে থেকে বলি, নইলে পরিস্থিতিটা আপনি ঠিক বুঝবেন না।" বলতে লাগলেন যাদুকর রাজা বোস। "ওদেশে দেখলাম ম্যাজিকের ভারি কদর, চর্চাও খুব ভদ্রসমাজে; আমাদের দেশের মতো ও-জিনিসের চর্চা প্রধানত ছোটো জাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নেশা চেপে গেল, পুরোদমে ম্যাজিকের চর্চা শুরু করলাম। আর মাঝে-মাঝে এখানে-সেখানে ছাত্র-ছাত্রী মহলে, ঘরোয়া বৈঠকে, রেস্তোরাঁয়, পার্টিতে শখের যাদুকর হয়ে দেখাতে লাগলাম নানা রকমের খেলা—তাসের, রুমালের, টাকার, ঘড়ির, ডিমের, আংটির, গ্লাসের, টুপির। অ্যামাটিওর ম্যাজিশিয়ান হিসেবে বেশ-একটু নামডাকই হলো রাজা-মহারাজার দেশ হিন্দুস্থান থেকে আসা এই যুবক যাদুকরের। রাজা-মহারাজার দেশ বলে হিন্দুস্থানের খ্যাতি আছে ওদেশে, জানেন নিশ্চয়? 'রাজা' আর 'মহারাজা' এই দুটো শব্দই বিলিতি দর্শকদের অনেকখানি অভিভূত করবে, এবিষয়ে সন্দেহ ছিল না। মহারাজা একটু বাড়াবাড়ি মনে হল, তাছাড়া উচ্চারণের পক্ষে ওটি রাজার ডবল লম্বা, তাই ভেবেচিন্তে রাজাই বেছে নিলাম। ব্যক্তিগত জীবনের রিপেন বোস হয়ে গেলাম যাদুকর জীবনের রাজা বোস। 'রাজা' নামটি আমার মঞ্চ-নাম (Stage-name) হিসেবে রেজিস্ট্রি করে নিলাম, ১৯০৯ সালে। তারপর—ঐ যে আপনাকে বলেছি 'ওয়ান্‌স্ এ ম্যাজিশিয়ান অলওয়েজ এ ম্যাজিশিয়ান'—আমার পেশাদারী ম্যাজিশিয়ানি নামের তলায় চাপা পড়ে গেল আমার পিতৃদত্ত নাম।"

"সত্যি, আমিও আপনাকে বরাবর শুধু রাজা বোস বলেই জেনে এসেছি।" বললাম আমি। "আপনার আসল নাম যে রিপেন বোস সেটা আজ এই প্রথম জানলাম।"

যাদুকর হাসলেন একটু। বললেন, "নামের কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা নকল কে জানে? কে বলবে কোন্‌টা আসল আমি? যাদুকর-আমি? না অন্য আমি? যাক সে সব দার্শনিক তত্ত্বকথা। আপনাকে এইখানে বলে রাখি, চট করে সরাসরি বিলেতের বড় বড় পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে ম্যাজিক দেখাবার সুযোগ বা কনট্রাক্‌ট্ পেয়েছিলাম ভাববেন না যেন। সাফল্য অত সহজ হলে তাতে এত রোমান্স থাকত না।"

"কি করে সুযোগ পেয়েছিলেন তাহলে?"

"সরাসরি কোনো থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ বা ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সুযোগই পেত না আমার মতো এক আনকোরা নয়া শিল্পী। যোগাযোগ

করবার একমাত্র উপায় ছিল এজেন্টরা। থিয়েটার কর্তৃপক্ষ আর শিল্পীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা হতো এদেরই মাধ্যমে। এদের সহায়তা বা অনুমোদন ছিল আমার মতো নতুন শিল্পীদের পক্ষে অপরিহার্য। আমি যে এজেন্টকে ধরলাম তিনি বললেন, শখের যাদুকরগিরি এক কথা, আর পেশাদার যাদুকর হওয়া সম্পূর্ণ আরেক কথা, সুতরাং আমি তাঁর অনুমোদনের যোগ্য কিনা সে বিষয়ে তিনি আমাকে প্রথম বেশ ভালোভাবে যাচাই করে নিতে চান। আমি তাতে রাজী আছি কি? আমি তখন বললাম…"

রাজা বোস তখন বললেন, "রাজী।"

এজেন্ট বললেন, "বেশ, তৈরি হও। প্রথমেই বড় শহরে বড় রঙ্গমঞ্চে নয়, কোনো শহরতলির শস্তা রঙ্গমঞ্চে ভ্যারাইটি প্রোগ্রামে তোমাকে সিকি ঘণ্টা ম্যাজিক দেখাবার ব্যবস্থা করে দেবো। সেই সিকি ঘণ্টার পরীক্ষায় যদি পাস করতে পারো, তাহলে তারপর তোমাকে শহরের ভালো রঙ্গমঞ্চে সুযোগ দেবার কথা চিন্তা করব।"

এজেন্ট মারফৎ মফস্বলের এক শস্তা রঙ্গমঞ্চে একটি অবিরাম বিচিত্র প্রদর্শনীতে (Non-stop revue) পনেরো মিনিট ম্যাজিক দেখাবার কনট্রাক্ট পেলেন রাজা বোস। তারপর রাজা বোসেরই ভাষায় :

"কনট্রাক্ট পেয়ে আত্মহারা হয়েছিলুম—শুধু আনন্দে নয়, দুরু দুরু হৃৎকম্পেও বটে। কারণ ঐসব পাঁচমিশেলি বিচিত্রা দেখতে যে-সব দর্শক যেত, তাদের বর্ণনা যা শুনলাম, তাতে নিরুদ্বিগ্ন থাকা শক্ত। টিকিটের দাম যেমন শস্তা, তেমনি টিকিট কিনে যারা দেখতে আসতো, টিকিটের পুরো পয়সা উশুল করতে তারা তেমনি ব্যস্ত। সঙ্গে তারা নিয়ে আসতো পচা ডিম, পচা টোম্যাটো ইত্যাদি, প্রোগ্রামে কোনো শিল্পীর খেলা অপছন্দ হলে তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারবার জন্য। আমি যে রাতে প্রথম ম্যাজিক দেখালুম, সে রাতে আমার পালা শুরু হবার আগের শিল্পীকে পচা ডিম আর পচা টোম্যাটোর আক্রমণে নাস্তানাবুদ হতে দেখে তো ভয়ে আমার আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হবার উপক্রম।"

"তারপর?"

"আত্মারামকে দিলুম না খাঁচা-ছাড়া হতে। বললুম, খবরদার, ঝাণ্ডা উঁচা রাখতে হবে। বাঙালীর বাচ্চা, বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে হিম্মত হারালে চলবে না। উইথ ফ্লাইং কালার্স, যাকে বলে বিজয়-নিশান উড়িয়ে বুক উঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।… আপনি একে পাগলামি বলবেন কিনা জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করুন,

আমার মনে হতে লাগলো আমার ঐ অগ্নিপরীক্ষায় সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে বাংলার প্রেসটিজ।”

“বললাম,’ শিল্পীর জীবনে এই পাগলামিরই তো পরম প্রয়োজন।”

“ঠিক এই কথাটাই আপনার কাছে আশা করেছিলাম।” বললেন রাজা বোস। “সিচুয়েশনটা আপনি খানিকটা বুঝে নিয়েছেন। তারপর শুনুন, লম্বা কাহিনী ছোটো করে বলি। শখের যাদুকর হিসেবে এর আগেই পসার জমিয়েছিলুম, আগেই বলেছি আপনাকে। শখের যাদু-প্রদর্শনে নানা বিচিত্র দর্শকের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয়েছে, পড়তে হয়েছে অনেক রকমের বেকায়দায়। আর নানা কায়দায় ঐ সব নানা বেকায়দা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। গুরুদেবের কবিতায় পড়েছেন তো: ‘আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল, আপনি কাটি দেয় তাহা।’ আমার বিপদজাল আমি আপনি কাটতুম বটে, কিন্তু নিজে গড়ে তুলতাম না, গড়ে তুলতো আমার দর্শকরাই। যাই হোক, ভগবানের আশীর্বাদেই বলুন, আর ভগবানকে এর ভেতর না টানতে চাইলে আমার বরাতগুণে বা বুদ্ধির জোরেই বলুন, জব্দ খুব বেশি হইনি। এমন বেকায়দায় বেশি পড়িনি, যার জাল কেটে পুরো বাহাদুরি বজায় রেখে বেরিয়ে আসতে না পেরেছি। এর প্রধান কারণ কি জানেন?”

“জানি না।”

“কোনো যাদুর খেলাই – তা সে আপাতদৃষ্টিতে যত সোজাই হোক-না কেন, গোপনে প্রচুর অভ্যাস করে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিতে পাকাপোক্ত না হয়ে আর ভালোরকম রিহার্শাল না দিয়ে কখনও প্রকাশ্যে দেখাইনি। এখানে একটা কথা বলে রাখি আপনাকে, মনে রাখলে ভবিষ্যতে কাজে দেবে। কোনো সোজাকেই সোজা ভেবে অবহেলা করবেন না, হাতের পাঁচ ভেবে নিশ্চিন্ত থাকবেন না। কারণ সময়-সময় অনেক শক্ত পার হয়েও সোজায় এসে ধাক্কা খেতে হয়। একটা ছোটো ঘটনা (anecdote) বলাও অবান্তর হবে না, তাই বলি। ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় যাদুকর ডেভিড ডেভাণ্ট-এর (David Devant) কাছে একজন শৌখিন যাদুকর গিয়েছিলেন তালিম নিতে। ডেভাণ্ট তাকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি ক’টা খেলা জানেন?’ ভাবী শিষ্য জবাব দিলেন, ‘শ তিনেক।’ ডেভাণ্ট দুচোখ কপালে তুলে মহা বিস্ময়ের ভান করে বললেন, ‘সর্বনাশ!!! বলেন কি? আমি তো জানি মাত্র ডজন-খানেক।’ বুঝলেন তো কথাটার মানে? শ’তিনেক খেলা জানা শখের ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোক ঐ শ’তিনেক

খেলার গোপন কৌশল হয়তো ঠিকই জানতেন, কিন্তু খেলার কৌশল জানা এক জিনিস, আর খেলা সত্যি সত্যি আসরে সাফল্যের সঙ্গে দেখাতে জানা সম্পূর্ণ আরেক জিনিস। এই শেষের জানাটাই আসল জানা, ডেভাণ্ট বিনয়ের ছলে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ যে জানাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারব না, সে জানার মূল্য কতটুকু? কি যেন বলেছিলাম?"

"বিলেতের শস্তা রঙ্গমঞ্চে আপনার সর্বপ্রথম পেশাদারী আবির্ভাবের কথা।"

"হ্যাঁ, সেইটে এবারে বলি। তার আগে আরেকটা কথা আপনাকে বলে নিই। কাজে লাগবে আপনার। কোনো কাজের সম্মুখীন হয়ে নিজের মনকে কখখনো বলবেন না এ আমি পারি নে, এ আমি পারব না। বলবেন এ আমি নিশ্চয় পারি, এ আমি আলবাৎ পারব।" বললেন রাজা বোস।

আমি বললাম, "এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত। গীতার আদর্শ মনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারি আর না পারি, চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? বেটার ট্রাই অ্যাণ্ড ফেল দ্যান নেভার ট্রাই অ্যাট্ অল।"

রাজা বোস বললেন, "এই সর্বনাশ! ঐখানেই তো 'পারব না'-র ছুঁচটুকু ঢুকিয়ে রাখলেন আপনি। অসাফল্যের এতটুকুও সম্ভাবনা আছে, এ কল্পনাকে মনের ভেতর এক তিল জায়গাও দেবেন না। মনের চৌবাচ্চাকে একেবারে টইটম্বুর করে রাখবেন নির্ভেজাল সাফল্য-কল্পনা দিয়ে; আমি পারব, আমি পারব, আমি পারব। কারণ 'নাও পারতে পারি'-কে একবার দাঁড়াবার জায়গা দিলে সে বসে পড়ে বলবে 'হয়তো পারব না', তারপর 'হয়তো' খসিয়ে ফেলে শুয়ে পড়ে বলবে 'পারব না'। সুতরাং মনকে রাখতে হবে সাফল্য বিশ্বাসে একাগ্র। দ্বিধা রাখলে চলবে না। আমার পূর্ববর্তী শিল্পী পচা ডিম আর পচা টোম্যাটোর ঘায়ে মাঝ পথে ঘায়েল হয়ে পালিয়ে এসেছেন। আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে রয়েছে শূন্য মঞ্চ আর পাঁচমিশেলি দর্শকদের হাতে এবং পকেটে অগুনতি পচা ডিম আর পচা টোম্যাটো। কলকাতায় আলিপুরের চিড়িয়াখানায় ঢোকবার পথের ধারে জানোয়ারদের খাওয়াবার জন্য ভিজে ছোলা, কলা, বাদাম, ঐ সবের দোকান দেখেছেন তো? বোধহয় আমার জীবনের প্রথম পেশাদারী অভিজ্ঞতার ঐ পাঁচমিশেলি রঙমহলটির বাইরে তেমনি পচা ডিম আর পচা টোম্যাটোর কারবার ভালোই চলত। প্রোগ্রাম পরিচালক আমায় বললেন, এবার স্টেজে যাও, তোমার পালা শুরু করো।

শৌখিন স্টেজে খেলা দেখাতে যেমন সহজভাবে ঢুকতাম, প্রথম পেশাদারী স্টেজেও তেমনি ঢুকে গেলাম।"

"ধীর পদক্ষেপে ?"

"সর্বনাশ ! পদক্ষেপ ধীর হলেই পচা ডিম বীরের দল ভাবত ভয় পেয়েছি, পা চলছে না ; আর অমনি পচা ডিম ছোঁড়া শুরু হয়ে যেত। আবার অধীর হলেও ভাবত তড়বড় করে স্মার্টনেসের ভান দেখিয়ে ভয় লুকোবার চেষ্টা করছি। আর অমনি—"

"পচা ডিম আর টোম্যাটো ছোঁড়া শুরু হয়ে যেত ?"

"যেত। ওরা সব টিকিটের পয়সা উশুল করার দল—যার খেলা দেখে পয়সা উশুল হবে না, তার ওপর পচা ডিম ছুঁড়ে হাতের সুখ করে পয়সা উশুল করব, ওদের ছিলো এই নীতি, এর ভেতর মিনমিনে দয়া-মায়ার প্রশ্ন নেই। আমি বিনা দ্বিধায় বিনা সংকোচে সহজভাবে খেলার পর খেলা দেখিয়ে চললুম।"

"কিন্তু পচা ডিম ? পচা টোম্যাটো ?"

"এদের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলুম। আর আমার সেই ভুলে যাওয়ার ছোঁয়াচ লেগেছিল গোটা অডিটোরিআমের সবার মনে। তাদের হাতের টোম্যাটো রইল হাতে, পকেটের ডিম পকেটে। তারা খুশি-মনেই দেখতে লাগল আমার খেলা। মাঝে-মাঝে শোনা যেতে লাগল তাদের হাততালি আর উল্লাসধ্বনি। ঝাণ্ডা উঁচু রেখে, অক্ষত-দেহে পরিষ্কার পোশাকেই স্টেজ থেকে ফিরে এলুম আমার প্রোগ্রামের শেষে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পাসপোর্ট পাওয়া হয়ে গেল। পেশাদার যাদুকর রূপে আমার যোগ্যতা এবং সাফল্য-নিশ্চয়তা সম্বন্ধে এজেন্টের আর সন্দেহ রইল না। তারপর ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরে, আর ইউরোপের নানা দেশে ঘুরে ঘুরে যাদুর খেলা অনেক দেখিয়েছি পেশাদার যাদুকর রূপে। সেই বিদেশে, তারপর ফিরে এসে এদেশে, যাদুকর-জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিচিত্র অনুভূতি লাভ করেছি। জীবনের শেষ অঙ্কে সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা যখন নতুন করে ভাবি, তখন মনে হয় মানুষের বানানো কাহিনীর চাইতে বিধাতার ঘটানো ঘটনা কত বেশি বিচিত্র—ফিক্‌শনের চাইতে ট্রুথ কত বেশি স্ট্রেঞ্জ্‌ !"

একটু থেমে বললেন, "কিন্তু বিলেতের শহরতলিতে পেশাদারী মঞ্চে আমার সেই সর্বপ্রথম যাদু-প্রদর্শনের অভিজ্ঞতা, আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে অতুলনীয়, অনির্বচনীয় হয়ে আছে। থাকবেও।"

আমার সঙ্গে উক্ত আলোচনার মাস কয়েকের ভেতরই মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে রাজা বোস পরলোকে চলে যান। সে বছরই (২২শে মার্চ, ১৯৪৮) সন্ধ্যার

কলকাতার রঙ্‌মহল রঙ্গমঞ্চে "উইজার্ডস ক্লাব" (Wizard's Club) নামক যাদু সংস্থা (১৮৫৭ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) যে একটি যাদু-প্রধান বিচিত্র অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করেন, তাতে ক্লাবের সভাপতি রূপে তিনি শিল্পীদের পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজেও যাদু-প্রদর্শন করেছিলেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সেই তাঁর সর্বশেষ যাদুকরের ভূমিকায় অভিনয়। পেশাদারী যাদু-প্রদর্শনের জগৎ থেকে তার অনেক আগেই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন।

এ দেশ থেকে গিয়ে ইংলণ্ডের পেশাদারী মঞ্চে যাদুকর রূপে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সর্বপ্রথম তিনিই। সেখানে তিনি একজন ইংরেজ তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন; ইনিই তাঁর সুযোগ্য যাদু-সহকারিণী "মিস হাইডি" (Miss Haidi), ভারতে এসেও বিভিন্ন স্থানে রাজা বোস তাঁর সঙ্গে যাদুপ্রদর্শন করে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বিদেশিনী পত্নীর সঙ্গে যে সব খেলা তিনি দেখাতেন তাদের ভেতর সব চেয়ে বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় ছিল "রিটার্ন অফ শি" (Return of She) অর্থাৎ "সুন্দরীর প্রত্যাবর্তন" এবং ভালুক (Teddy Bear) ও শিকারীর খেলা। প্রথম খেলাটিতে একজন শিল্পী (রাজা বোস) শোকবিহ্বল চিত্তে তাঁর লোকান্তরিতা প্রিয়ার ছবি এঁকে শ্রান্ত হয়ে তন্দ্রায় ঢলে পড়তেন এবং তন্দ্রার ঘোরে দেখতেন প্রিয়া এসেছে। তাঁর সেই স্বপ্ন রূপ ধারণ করত মঞ্চে, আঁকা ছবি যেন যাদুমন্ত্রে প্রাণ পেয়ে প্রিয়ার দেহ ধারণ করে এগিয়ে আসত শিল্পীর দিকে। (বলা বাহুল্য, প্রিয়ার ভূমিকায় আবির্ভূত হতেন সুন্দরী মিস হাইডি)। এই শুকনো কাঠামো থেকে বোঝা যাবে না নেপথ্য সংগীতের করুণ মাধুর্যে, যাদুর বিস্ময়ে এবং যাদুকর-দম্পতির—বিশেষ করে শিল্পীর ভূমিকায় যাদুকর রাজা বোসের—অনবদ্য মর্মস্পর্শী অভিনয়ে এই খেলাটি কী অপরূপ রূপ নিয়ে ফুটে উঠত, কী বিস্ময়-মাধুর্যময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করত। বিখ্যাত ইংরেজ যাদুকর ডেভিড ডেভাণ্টের "শিল্পীর স্বপ্ন" (Artist's Dream) খেলাটির সঙ্গে এ খেলাটির প্রাথমিক সাদৃশ্য থাকলেও শেষের দিকে রাজা বোসের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল।

দ্বিতীয় খেলাটিতে দর্শকদের চোখের সামনে মঞ্চের ওপর ভালুকের খোলসের মতো পোশাক পরে মিস্ হাইডি ভালুক সাজতেন; শিকারীর পোশাক পরে শিকারী সাজতেন রাজা বোস, হাতে নিতেন নকল বন্দুক। মঞ্চের মাঝখানে একটা নকল গাছের গুঁড়ির চারদিকে ঘুরে ঘুরে ভালুককে দ্রুতবেগে তাড়া করতেন শিকারী। চরকার মতো এভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একবার থেমে দাঁড়িয়ে

পড়তেন শিকারী আর ভালুক। দেখা যেত ভালুকের পোশাকে চলে গেছেন রাজা বোস, আর শিকারীর পোশাকে মিস্ হাইডি। গাছের গুঁড়ির সামান্য আড়ালে এত দ্রুত পরিবর্তন কি করে সম্ভব, এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে রহস্যের কিনারা পেতেন না দর্শকবৃন্দ। বন্দিদশা থেকে মুক্তির অর্থাৎ "পলায়নী" খেলার (Escapes) ভেতর তাঁর "পিপের খেলা"-র কথা আগেই বলেছি। তাছাড়া হুডিনি-প্রদর্শিত "স্ট্রেট জ্যাকেট এসকেপ্" (Strait Jacket Escape) অর্থাৎ মারাত্মক পাগলদের যে মুখ-বন্ধ হাতাওয়ালা জামা পরিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়, তার সেই শক্ত বন্ধন থেকে মুক্তি, এবং মুখে তালা বন্ধ করা বড়ো দুধের পাত্রের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার খেলা (Milk Can Escape)-ও* তিনি দেখাতেন।

১৯২৮ সালে স্টার থিয়েটারে কর্তৃপক্ষ রাজা বোসকে মঞ্চ-উপদেষ্টা রূপে গ্রহণ করে তাঁদের মঞ্চে অভিনীত "ফুল্লরা", "বিদ্রোহিণী" প্রভৃতি পর পর কয়েকটি নাটকের কতকগুলি বিশেষ দৃশ্যে তাঁর যাদু-প্রতিভার সুযোগ গ্রহণ করেন। যাদুকর রাজা বোসের পরিকল্পনায় বিচিত্র যাদুকৌশলের প্রয়োগে সেই দৃশ্যগুলো দর্শকদের মনে অসামান্য বিস্ময় আর আনন্দের সৃষ্টি করেছিল।

* ৺রাজা বোসের সমসাময়িক যাদুকর ৺বিমল গুপ্ত এবং পরে যাদুকর ৺দুর্গাদাস সোমও (প্রোঃ সোম) এই খেলাটি দেখিয়ে গেছেন।

অদ্বিতীয় হ্যারি হুডিনি

হ্যারি হুডিনি !!!

বিশ্বের যাদুবিদ্যার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় নাম। মানুষের বিস্ময়বোধকে হুডিনির মতো এমন গভীরভাবে নাড়া দিতে আর কোনো যাদুকরই পারেননি।

আমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি রক্তকণায় মিশে রয়েছে গভীর বন্ধন-বিতৃষ্ণা এবং মুক্তি-পিপাসা। বন্ধন-দশায় আমাদের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, আমরা চাই স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়া। আমাদের বুকের রক্তে তাই দোলা লাগে যখন রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন :

> "শিকল দেবীর ঐ যে পূজা বেদী
> চিরকাল কি রইবে খাড়া ?"

যখন কাজী নজরুল হাঁকেন :

> "কারার ঐ লৌহ কপাট
> ভেঙে ফ্যাল, কর রে লোপাট।"

যখন প্যাট্রিক হেন্‌রি বলেন "গিভ মি লিবার্টি অর গিভ মি ডেথ", দাও আমাকে মুক্ত স্বাধীনতা, অথবা মৃত্যু। তাই পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মাতৃ-ভূমির মুক্তি-সাধনায় জীবন পণ করে যাঁরা শহীদ হন, মুক্তির পূজারী রূপে আমরা তাঁদের চিরদিন শ্রদ্ধা করি। এমন-কি আমাদের গভীরতম আধ্যাত্মিক সাধনার মূলেও ঐ একই লক্ষ্য—বন্ধন থেকে মুক্তি, মোহ থেকে মুক্তি।

আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি যেমন আমাদের মজ্জাগত সংস্কার, তেমনি আমাদের প্রত্যেকের অবচেতন মনে সুপ্ত রয়েছে মুক্তির স্বপ্ন। সকল মানুষের সেই চিরন্তন স্বপ্নকে যাদুর খেলায় রূপায়িত করে যাদু-জগতে, তথা সমস্ত প্রমোদ-জগতে যুগান্তর এনে দিলেন হ্যারি হুডিনি, বিভিন্ন রকমের কঠিন বন্ধনদশা থেকে যাদু-শক্তিতে মুক্তি লাভ করার খেলা দেখিয়ে। এ-ধরনের যাদু-খেলার নাম 'এস্‌কেপ' (Escape) অর্থাৎ 'পলায়ন', কারণ এ ধরনের খেলায় যাদুকর তালাবন্ধ হাতকড়া থেকে, শেকলের বন্ধন থেকে, ডাণ্ডাবেড়ি থেকে, মুখ আটকানো থলের ভেতর থেকে, তালা-বন্ধ কাঠের বাক্‌সো বা পিপের ভেতর থেকে এবং অন্য নানা ধরনের বন্দী অবস্থা থেকে যাদুর ক্ষমতায় মুক্তি লাভ অর্থাৎ 'পলায়ন' করে বেরিয়ে

আসেন। যাদুকরের সেই বেরিয়ে আসা এমন অদ্ভুত, এমন রহস্যময়, যে দর্শকরা তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হন, এ অসম্ভব ব্যাপার কি করে সম্ভব হলো কিছুতেই তা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। ডিটেকটিভ শার্লক হোম্স-এর স্রষ্টা, বিখ্যাত লেখক এবং প্রেততত্ত্ব-বিশারদ সার আর্থার কোনান ডয়েল স্বচক্ষে হ্যারি হুডিনির 'পলায়নী' যাদুর খেলা দেখে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে, হ্যারি হুডিনি এক বিস্ময়কর অলৌকিক অতীন্দ্রিয় গুপ্ত (Occult) শক্তির অধিকারী ; এরই সাহায্যে তিনি তাঁর পঞ্চভূতে গড়া দেহটাকে শূন্যে পরিণত করে বন্ধনের ভেতর থেকে বাইরে পালিয়ে এসে সেই 'শূন্য' দেহকে আবার পূর্ণ পঞ্চভৌতিক দেহে পরিণত করে ফেলেন।

হুডিনির অদ্ভুত রহস্যময় 'পলায়ন'গুলোর এই ব্যাখ্যা আজগুবিয়ানার চূড়ান্ত বটে, কিন্তু হ্যারি হুডিনি অলৌকিক ক্ষমতার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও কোনান ডয়েল তবু নিজের আজগুবি বিশ্বাসেই অটল ছিলেন। বিশেষ করে তখন কোনান ডয়েল প্রেততত্ত্বের চর্চায় অনেক দূর এগিয়েছেন, অনেক মিডিয়ামের চক্রে বসে অনেক বিস্ময়কর অলৌকিক ভূতুড়ে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। বয়সও বেশি হয়েছে, জীবনে শুরু হয়েছে ভাঁটার টান। তা ছাড়া যাদুবিদ্যার বিচিত্র ছলা-কলা সম্পর্কেও তিনি আনাড়ি ছিলেন বললেই চলে।

হুডিনির বিখ্যাত "মিল্‌ক্ ক্যান এস্‌কেপ" অর্থাৎ "দুধের ভাঁড়ের ভেতর থেকে পলায়ন" খেলাটির ইতিহাস বলি। ১৯০৭ সালের শেষের দিকে হুডিনি লক্ষ্য করলেন হাতকড়া, ডাণ্ডাবেড়ি, বাক্স ইত্যাদি থেকে পলায়নের খেলা দর্শকদের কাছে পুরনো হয়ে গেছে : প্রমোদপ্রিয় জনসাধারণ তাঁর খেলায় আর আগের মতো অসামান্য উৎসাহী নয়। ঝিমিয়ে পড়েছে তাদের আগ্রহ। তারা চাইছে নূতন বিস্ময়, নূতন শিহরণ!

১৯০৮ সালের শুরুতেই আত্মসম্মানে একটি প্রচণ্ড ঘা খেলেন হুডিনি। যে রঙ্গালয়ে তিনি খেলা দেখাতেন, সেখানকার বহু বিচিত্র শিল্পীর ভেতরে তিনিই ছিলেন পয়লা নম্বর, রঙ্গালয়ের সেরা আকর্ষণ, তাই রঙ্গালয়ের শিল্পীদের নামের তালিকায় তিনি ছিলেন সবার ওপরে। হুডিনি দেখলেন "হুডিনি" নামটি হয়ে গেছে দু'নম্বর—তার ওপর জল্‌জ্বল্ করছে আরেকজন শিল্পীর নাম। সে-ই এখন এই রঙ্গালয়ের সেরা আকর্ষণ, হুডিনি তার তলায় !!!

ক্ষেপে গেলেন হুডিনি। এ পরাজয় মেনে নিলে চলবে না। সারা প্রমোদ-জগৎকে অচিরে এক নতুন বিস্ময় দিয়ে চমকে তুলে দেখিয়ে দিতে হবে হুডিনি

অপরাজেয়। মরিয়া হয়ে লেগে গেলেন গবেষণায়। তারই ফলে আবিষ্কৃত হলো তাঁর বিখ্যাত খেলা "মিল্‌ক্ ক্যান এস্‌কেপ (Milk Can Escape)।"

১৯০৮ সালের প্রথম দিকেই এই নতুন খেলাটি দেখাতে শুরু করে জনচিত্ত জয় করে ফেললেন, আবার অদ্বিতীয় আকর্ষণ হয়ে উঠলেন হুডিনি। সংক্ষেপে এর বর্ণনা করা যাক। ধাতুর তৈরি, প্রমাণ সাইজ একজন মানুষ ধরবার মতো বড়ো একটি দুধের 'ক্যান্' বা ভাঁড়। দুধারের হাতল ধরে দুজন সহকারী সেটিকে মঞ্চের মাঝখানে এনে খাড়া করে রাখলেন। খাড়া অবস্থায় ক্যান্‌টির উচ্চতা ৪২ ইঞ্চি। কয়েক বালতি জল ঢেলে দেওয়া হলো তার ভেতরে। স্নানের পোশাক পরা হুডিনিকে দুজন সহকারী দুদিক থেকে তুলে নামিয়ে দিলেন ভাঁড়টির ভেতরে। জল উপচে পড়লো মঞ্চের ওপর বিছানো ক্যানভাসের ত্রিপলের ওপরে। হুডিনি মাথা নিচু করে নিলে পর ঢাকনাটা চেপে দিয়ে ছয় দিকে ছয়টি তালা লাগিয়ে আটকে দিলেন দর্শকদেরই কয়েকজন প্রতিনিধি। চাবিগুলো রইলো তাঁদেরই জিম্মায়। দুধের ভাঁড়টিকে কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। সেই তালাবন্ধ ভাঁড়ের ভেতরে বন্দী জল আর হ্যারি হুডিনি। ভাঁড়ের মাথায় ছোটো ছোটো কয়েকটি ছ্যাদা আছে বটে, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে কতটুকু বাতাসই বা ভেতরে যেতে পারে? যথেষ্ট তাড়াতাড়ি বেরিয়ে না আসতে পারলে হুডিনির দম বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা প্রচুর।

এক মিনিট···দেড় মিনিট···দু মিনিট···আড়াই মিনিট। এখনো বেরোচ্ছেন না হুডিনি। দর্শকবৃন্দ উদ্বিগ্ন··· তিন মিনিট পার হয়ে গেল। হুডিনির দেখা নেই। উদ্বেগে অধীর দর্শকমহল। শীগ্‌গির দেখা হোক কি হল। কিন্তু না, দরকার হল না দেখবার। হুডিনি বেরিয়ে এলেন পর্দা ঠেলে, তার গা বেয়ে জল ঝরছে। দাঁড়িয়ে আছে দুধের ভাঁড়টি, যেমন ছিল ঠিক তেমনি, আধ ডজন তালা দিয়ে আটকানো তার মুখ। আশ্চর্য!!! হুডিনি বেরিয়ে এলেন কি করে??

এ খেলাটি প্রচণ্ড আলোড়ন জাগিয়ে সত্যি সত্যি যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছিল হুডিনির জয়যাত্রার পথে, অগ্রগতিতে। প্রমোদ-জগতে আবার পয়লা নম্বর হলেন হ্যারি হুডিনি। যেখানে খেলা দেখান সেইখানেই দর্শকে দর্শকারণ্য, যে রঙ্গালয়ে হুডিনির যাদু-প্রদর্শন, তার প্রেক্ষাগৃহে আর তিল ধারণের জায়গা থাকে না।

এ হলো ১৯০৮ সালের কথা। এর ছয় বছর পরের কথা বলি। ৬ই জুলাই

১৯১৪ খৃস্টাব্দ। নিউ ইয়র্ক শহরের ভিক্টোরিয়া রঙ্গালয়। স্টেজের ওপর একটি বড়ো গালিচা পাতা। তার ওপর বিছানো হয়েছে দর্শকদের পরীক্ষিত একটি মসলিনের চাদর। স্টেজের পাশে দৈর্ঘ্যে এক ফুট এবং লম্বায় দশ ফুট একটি ইস্পাতের বরগা, তলায় রোলার লাগানো। সেই বরগার ওপর অতি দ্রুত বেগে একটি ইঁটের দেয়াল গাঁথছে কয়েকজন অসাধারণ চটপটে রাজমিস্ত্রী। সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে উৎসুক দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হচ্ছেন তাদের অসামান্য ক্ষিপ্রতা দেখে। দর্শকদের চোখের সামনে এই নাটকীয় ভাবে ইঁটের দেয়াল গেঁথে তোলার উদ্দেশ্য —দেয়ালের নিরেট বা 'সলিড' খাঁটিত্ব সম্বন্ধে যেন কারো মনে সন্দেহ না থাকে। দেয়াল গাঁথা শেষ হলো—আট ফুট উঁচু, লম্বায় দশ ফুট, পাশে প্রায় এক ফুট। এইবার দেয়ালটিকে ঠেলে সরিয়ে এনে রাখা হলো স্টেজের মাঝখানে ঐ গালিচা আর মসলিনের চাদরের ওপর, দেয়ালের পাশের (এক ফুট) দিকটা দর্শকদের মুখোমুখি করে, যার ফলে দর্শকেরা দেয়ালের দুই ধারেই একসঙ্গে সমানভাবে দেখতে পাচ্ছেন।

স্টেজের পেছন দিকে এবং ডাইনে-বাঁয়ে দুই ধারে—এই মোট তিন দিকে দর্শকবৃন্দের প্রতিনিধিরা বিছানো চাদরের ওপর তিন দিকে কিনারা ঘেঁষে দাঁড়ালেন, তাঁদের পায়ের তলার চাপে বন্দী হয়ে রইলো সেই মসলিনের চাদর। সামনের দিকটা রইলো দর্শকদের দৃষ্টির পাহারায়। দেয়ালের দুই দিকে মাঝামাঝি জায়গা ঘেঁষে দুটি পর্দা-ঘেরা আড়াল তৈরি করা হলো।

দেওয়ালের এক দিকের পর্দার ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালেন হ্যারি হুডিনি। অদৃশ্য হয়ে গেলেন পর্দার আড়ালে। একবার ওপরে দুহাত তুলে চেঁচিয়ে জানালেন "আমি এইখানে রয়েছি।" নামিয়ে নিলেন দুহাত। অর্কেস্ট্রা বেজে উঠলো মঞ্চের নেপথ্যে।

একটু পরেই··· ওকি ? হ্যারি হুডিনির দুহাত নড়তে দেখা গেলো দেওয়ালের উলটো দিকের পর্দার ওপরে। "এবার এইখানে এসে পড়েছি আমি" বলে পর্দা সরিয়ে বাইরে এসে দেখা দিলেন হ্যারি হুডিনি !

একি আশ্চর্য ভুতুড়ে ব্যাপার ? ঠাসা গাঁথুনির দেওয়াল ভেদ করে এপার থেকে ওপারে কি করে চলে গেলেন হুডিনি ? নিজের চোখকেও কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। কোনো মুখে ফুটছে না উল্লাস বা অভিনন্দন, কোনো হাতে পড়ছে না তালি। অভাবনীয় বিস্ময়ে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ। দেয়াল টপকে পার হননি ; এপাশ বা ওপাশ দিয়েও ঘুরে যেতে পারেননি, চারদিকেই

তো সতর্ক দৃষ্টির পাহারা। দেয়ালের তলা দিয়েও যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ দেয়ালের তলায় ইস্পাতের বরগা স্টেজের মেঝের থেকে মাত্র ইঞ্চি তিনেক উঁচু, তারই তলায় গালিচা আর মস্‌লিনের চাদর পাতা ; এই তিন ইঞ্চি ফাঁকের মধ্য দিয়ে একটা আস্ত মানুষ গলে যেতে পারে না। তাহলে হুডিনি দেয়ালের ওপারে পৌঁছলেন কি করে ? সবার মনে এই প্রশ্ন, কিন্তু কোনো মনে কোনো সন্তোষ-জনক জবাব নেই। বিস্ময়ের চরম। এর আগে কয়েক বছর ধরে নানা রকম বিস্ময়কর 'পলায়নী' খেলা দেখিয়ে এসেছেন যাদুকর হুডিনি। দড়ি দিয়ে অনেক রকমে জটিল কায়দায় বাঁধা হয়েছে তাঁকে : সে বাঁধন থেকে পালিয়েছেন তিনি। হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি পরিয়ে তাঁকে আটকে রাখা যায়নি। তাঁকে থলির ভেতর পুরে থলির মুখ বেঁধে গেরোর ওপর শীল-মোহর করে দেওয়া হয়েছে ; তিনি বেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু থলের বাঁধন, শীল-মোহর যেমন ছিলো ঠিক তেমনই রয়ে গেছে। তাঁকে কাঠের প্যাকিং বাক্‌সে পুরে বাক্‌সের ডালা পেরেক মেরে আটকে দেওয়া হয়েছে ; বাক্‌স যেমন পেরেক মারা ছিল তেমনই রয়ে গেছে, হুডিনি পালিয়ে এসেছেন তার ভেতর থেকে। বন্ধ কফিন, লোহার বয়লার, দড়ি দিয়ে বাঁধা ট্রাঙ্ক, তালা দিয়ে মুখ বন্ধ করা জল ভরা দুধের ভাঁড়—কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি, সব কিছুর ভেতর থেকেই তিনি রহস্যজনকভাবে পালিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। তারপর তাঁর বিখ্যাত "চাইনিজ ওয়াটার টরচার সেল" অর্থাৎ "চীন দেশীয় জল-নির্যাতন প্রকোষ্ঠ" নামক লোমহর্ষক খেলা। এ খেলায় পর্দা উঠতেই দেখা যেত স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি কাঠের ক্যাবিনেট, তার সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে কাঁচের দেয়াল। প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেটটি সামনে কাঁচ লাগানো একটি জলাধার বিশেষ। তার ভেতর হোস-পাইপ দিয়ে কিছুটা উঁচু পর্যন্ত জল ভরে দেওয়া হলো। হুডিনি স্নানের পোশাকে স্টেজের ওপর শুয়ে পড়লেন। একটি কাঠের চৌকোর দুটি ছ্যাদার মধ্যে তাঁর দুটি পা ভালো করে আটকে দেওয়া হলো। দড়ির সাহায্যে স্টেজের ওপর দিকে চৌকো কাঠটিকে তুলে নিয়ে মাথা নিচু ঝুলন্ত অবস্থায় হুডিনিকে দেওয়া হলো ঐ জলপূর্ণ নির্যাতন প্রকোষ্ঠের ভেতর ধীরে ধীরে নামিয়ে। জলের তলায় ডুবে গেলো তাঁর মাথা থেকে প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি। কাঠের চৌকোটি তখন ক্যাবিনেটের ওপরের ফ্রেমে আটকে তালা বন্ধ করে দেওয়া হলো। এই ক্যাবিনেটটিকে ঘিরে দেওয়া হলো কাপড়ের পর্দা দিয়ে। কিছুক্ষণ বাদেই পর্দা সরিয়ে এসে দাঁড়ালেন হুডিনি, মুখে হাসি আর সারা গায়ে জল। দর্শকরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন "টরচার সেল" যেমন ছিল

তেমনই আছে, ওপরটা তেমনই তালা দিয়ে আটকানো, ভেতরটা তেমনই জল-ভরা। তাহলে তার ভেতর থেকে হুডিনি পালিয়ে বাইরে চলে এলেন কি করে? অসংখ্য মাথা ঘামলো এই রহস্য নিয়ে, কিন্তু কোনো সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া গেল না।

এই ধরনের আরো নানারকম 'পলায়নী' খেলা দেখিয়ে এসেছেন হুডিনি এতোদিন। এবারে চোখের সামনে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিলেন তিনি নিরেট ইঁটের দেয়ালের মধ্য দিয়েও হেঁটে যেতে পারেন।

এই খেলাটির কথা মনে করেই এখনো হুডিনিকে বলা হয় **'the man who walked through walls'** – "যিনি দেয়ালের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতেন।"

অদ্ভুতকর্মা হুডিনির জীবিতকালেই তাঁর সম্পর্কে নানারকম অদ্ভুত কিংবদন্তী চালু হয়েছিল ; এবং এর অনেকগুলো চালু করেছিলেন হুডিনি নিজেই কায়দা করে। কৌশলে নিজের ঢাক জায়গা মতো এবং মওকা মতো পিটতে এবং অপরকে দিয়ে পিটিয়ে নিতে চমৎকার জানতেন তিনি। জনগণের মনে কিভাবে পাইকারী হারে শিহরণ জাগাতে হয়, নিজেকে কি কৌশলে বহুর আলোচনার বিষয়ে পরিণত করতে হয়, সে বিদ্যায় তাঁর ছিল অসাধারণ সহজ-পটুত্ব।

জীবনে অতি সামান্য শুরু থেকেই অতি অসামান্য পরিণতিতে পৌঁছেছিলেন অবিস্মরণীয় হ্যারি হুডিনি। কি নিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর জীবনের জয়যাত্রা ?– অদম্য সাহস, অসীম আত্মনির্ভরতা আর নিজের প্রতিভায় সীমাহীন বিশ্বাস, যে বিশ্বাস তাঁকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছিল। আপন প্রতিভায় এই অটুট বিশ্বাসের জোরেই তিনি বহু বাধা, বহু ব্যর্থতা, বহু হতাশা, বহু বিপর্যয় অতিক্রম করে বিশ্বের যাদু-জগতে সাফল্যের চূড়ায় উঠেছিলেন।

'পলায়নী' যাদুর অদ্বিতীয় যাদুকর হুডিনি হয়ে উঠেছিলেন বিদ্রোহী মুক্ত আত্মার প্রতীক, কোনো বন্ধন যাঁকে বাঁধতে পারে না।

এপ্রিল, ১৮৭৪ থেকে অক্টোবর, ১৯২৬ পর্যন্ত সাড়ে বাহান্ন বছর বেঁচেছিলেন হ্যারি হুডিনি। এরই ভেতরে তিনি প্রতিভা, কর্মশক্তি, একাগ্র সাধনা ও সিদ্ধির যে প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য দেখিয়ে গেছেন, তার তুলনা বিরল।

হ্যারি হুডিনির আসল নাম ছিল এহরিক ভাইস (Ehrich Weiss)। তাঁর বাবা ডাঃ মায়ার স্যামুয়েল ভাইস ছিলেন হাঙ্গেরির বুদাপেস্ত শহরের অধিবাসী একজন ইহুদী পুরোহিত। সেখান থেকে তিনি সপরিবারে আমেরিকায় চলে এসেছিলেন। ডাঃ ভাইস ছিলেন ধর্মপ্রাণ, পণ্ডিত এবং গরিব।

এহরিকের স্বাস্থ্য ছিল ভালো এবং ছোটোখাটো হলেও তাঁর দেহটি ছিল মজবুত, সুগঠিত, কষ্টসহিষ্ণু। নানারকম শারীরিক কসরতে, সাঁতারে, দৌড়ঝাঁপে আর দৈহিক শক্তির খেলায় তিনি পাকা হয়ে উঠতে শুরু করলেন অল্প বয়স থেকেই।

অভাবের সংসার। এহরিক কিছুদিন রাস্তায়-রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রি করে তারপর চাকরি নিলেন একটি নেকটাই তৈরির কারখানায়। তাঁর কাজ হলো নেক-টাইর কাপড় কাটা। পাশের টেবিলের সহকর্মী জ্যাক হেম্যানের ছিল যাদুবিদ্যার নেশা। যাদুবিদ্যায় এহরিকের হাতেখড়ি হলো এরই কাছে।

কিছুদিন পরেই এহরিকের হাতে পড়লো উনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী যাদুসম্রাট রবেয়ার উদ্যাঁর (Robert Houdin) জীবনস্মৃতি গ্রন্থখানা। যাদু-সম্রাটের আত্মকাহিনী পড়ে আত্মহারা হলেন এহরিক। তাঁর মনে হলো ফরাসী-দেশের একজন সাধারণ ঘড়ির মিস্ত্রীর ছেলে, উকিলের কেরানি রবেয়ার উদ্যাঁ যদি যাদুবিদ্যাকে পেশা হিসেবে নিয়ে জীবনে অমন বিপুল সাফল্যগৌরব অর্জন করতে পেরে থাকেন, তাহলে একজন পণ্ডিত পুরোহিতের পুত্র তিনিই বা যাদু-সাধনা করে বিশ্ববিখ্যাত হতে পারবেন না কেন?

বইখানা পড়ে মুগ্ধ হলেন এহরিক, নির্ধারিত হয়ে গেল তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন। উদ্যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাদুবিদ্যা সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে তিনিও হবেন বিখ্যাত, বরেণ্য, স্বনামধন্য, চিরস্মরণীয়।

সহকর্মী বন্ধু—নেক-টাই কারখানার সেই জ্যাক হেম্যান, যার কাছে এহরিকের যাদুবিদ্যায় হাতেখড়ি—বললেন উদ্যাঁ (Houdin) নামের শেষে একটি "আই" অক্ষর জুড়ে দিলে তার মানে হবে 'উদ্যাঁ-র মতো'। এহরিক এই পরামর্শটি গ্রহণ করলেন। 'হুডিন' (Houdin)—যার ফরাসী উচ্চারণ 'উদ্যাঁ'—নামের শেষে 'আই বসিয়ে হলো 'হুডিনি' (Houdini)। তখন আমেরিকার যাদু-জগতের দিক্‌পাল ছিলেন হ্যারি কেলার, এবং 'হ্যারি' নামটিও 'এহরিক' নামের বেশ কাছাকাছি। অতএব 'হুডিনি'-র আগে বসল 'হ্যারি'। এইভাবে এহরিক ভাইস হলেন 'হ্যারি হুডিনি' (Harry Houdini)।

আরেকখানা বইও হুডিনির জীবনের ইতিহাসে স্মরণীয়। বইটি বেনামে একজন ভৌতিক মিডিয়ামের লেখা। বইটির নামের বাংলা তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায় "একজন ভৌতিক মিডিয়ামের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ, অথবা ভৌতিক রহস্য ফাঁস—ধাপ্পাবাজ মিডিয়ামদের ব্যবহৃত ফাঁকির কৌশলগুলির বিশদ ব্যাখ্যা। —জনৈক মিডিয়াম প্রণীত।"

(Revelations of a Spirit Medium, or Spiritualistic Mysteries Exposed—a Detailed Explanation of the Methods used by Fraudulent Mediums—by a Medium)

বইটিতে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বোঝানো ছিল দড়ির বাঁধন এবং অন্যান্য বিভিন্ন রকমের বন্ধন থেকে কি কৌশলে মুক্তি পেয়ে ফাঁকিবাজ পেশাদার মিডিয়ামরা অন্ধকারে নানারকম ভৌতিক (?) কাণ্ড করে ভৌতিক চক্রে উপবিষ্ট সবাইকে ঠকাতেন। চক্রে যাঁরা বসতেন তাঁরা ভাবতেন মিডিয়ামকে যেভাবে আটকে রাখা হয়েছে, তাতে সেই বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে এত সব কাণ্ড করা—যেমন বিভিন্ন রকমের বাজনা বাজানো, জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলা, ছবি আঁকা, টেবিলের ওপর আওয়াজ করা ইত্যাদি—তার পক্ষে সম্ভব নয়, অতএব সত্যি সত্যি ভূত এসেই এসব কাণ্ড করছে। অবশ্য আলো জ্বলবার আগেই মিডিয়ামরা বন্ধন দশাতে ফিরে যেতেন ; এবং আলো জ্বলবার পর তাঁদের সেই অসহায় (?) বন্ধনদশা থেকে মুক্ত করে দিতে হতো।

লোকান্তরিত আত্মীয়-স্বজনের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রিয়-বিয়োগবিধুর অনেকেই এই মিডিয়ামদের শরণ নিতেন। তাঁদের এই ব্যথা-বিধুরতার সুযোগ নিয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৌশলী ধাপ্পাবাজ মেকি মিডিয়ামরা এই ব্যথা-বিধুরদের পকেট থেকে প্রচুর টাকা নিজেদের পকেটে আনবার ব্যবস্থা করতেন। প্রত্যেকটি সেয়াঁস (Seance) বা ভৌতিক চক্রবৈঠকের জন্য তাঁরা ভালো দক্ষিণা নিতেন, কারণ পরলোক থেকে আত্মা নামিয়ে এনে তাদের দিয়ে চিঠি লেখানো, প্রশ্নের জবাব দেওয়া, বাজনা বাজানো, টেবিল শূন্যে তোলা বা নাড়ানো, টেবিলে টোকা দেওয়া ইত্যাদি নানা রকমের কাজ করিয়ে নেওয়া প্রচুর সাধনা এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ বলেই তাঁরা দাবি করতেন। যে ব্যাপারগুলোকে এই মিডিয়ামরা অলৌকিক, অতীন্দ্রিয় বা ভৌতিক বলে চালাতেন, সেগুলো আসলে কতকগুলো ভেল্‌কি, ভোজবাজি বা যাদুর খেলামাত্র।

১৮৯১ খৃস্টাব্দে এ বইখানা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো ঘা দিল পেশাদার মিডিয়ামদের। শোনা যায় পেশাদার মিডিয়ামরা যতদূর পেরেছিলেন পাইকারী হারে এ বই কিনে কিনে গোপনে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

বিধাতা কিন্তু এ বইও একখানা ফেললেন হুডিনির হাতে, যেমন ফেলেছিলেন রবেয়ার উদ্যাঁ-র স্মৃতিকথা। হুডিনি ভৌতিক তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামালেন না, উৎসাহিত হয়ে উঠলেন বইখানার ভেতর বিভিন্ন রকমের বাঁধন থেকে তাড়া-

তাড়ি নিজেকে মুক্ত করবার নানারকম 'পলায়নী' কৌশলের সচিত্র এবং প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পড়ে। এই বই পড়ে হুডিনি শিখলেন দড়ির বিভিন্ন রকমের বাঁধন থেকে মুক্ত হবার কৌশল, শিখলেন মুখ-বাঁধা এবং মুখের দড়ির গেরোগুলোর ওপর শীল-মোহর করা থলের ভেতর থেকে সব কিছু ঠিক সেই অবস্থায় রেখেই বেরিয়ে আসবার দুটি চমৎকার কৌশল, জানলেন এমন গুপ্ত কৌশলযুক্ত লোহার কলারের কথা যা গলায় পরিয়ে তালাবন্ধ করে আটকে দিলেও তা থেকে ইচ্ছেমতো গলা খুলে নেওয়া যায়।... আরও অনেকরকমের মুক্তিপন্থাও হুডিনি শিখলেন এ বইখানা পড়ে।

হুডিনির কল্পনার দৃষ্টিতে যাদু-জগতে একটা নতুন রাস্তা খুলে গেল—'পলায়নী' যাদুর। এই বন্ধন-মুক্তি বা পলায়নী যাদুকে যাদুবিদ্যার সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় বিভাগের মর্যাদায় উন্নীত করবেন তিনি, আর তিনি স্বয়ং হবেন এই পলায়নী যাদুর খেলায় অদ্বিতীয় যাদুকর। সারা দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, "কোনো রকমেই আটকে রাখতে পারবে না আমাকে—যে কোনো বন্ধন থেকেই আমি নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে আসবো।"

সতেরো বছর বয়সেই নিজের জীবন সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেললেন হুডিনি। ছেড়ে দিলেন নেক-টাই কারখানার পাকা চাকরি। যাদুবিদ্যাকেই গ্রহণ করলেন জীবনের একমাত্র ব্রত এবং একমাত্র পেশা বলে। নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত জীবন এবং জীবিকা ছেড়ে পা বাড়ালেন অনিশ্চিত, বাধা-বিঘ্নসংকুল ভবিষ্যতের দিকে।

এই সময় হুডিনির আলাপ হলো অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত জর্জ ডেক্‌স্টারের সঙ্গে। বিভিন্ন ধরনের দড়ির বাঁধন থেকে এবং হাতকড়া থেকে মুক্ত হবার বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন ডেক্‌স্টার; হুডিনি তালিম পেলেন তাঁর কাছে।

১৮৯২ খৃস্টাব্দে হুডিনির বাবা মারা গেলেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে সংসারের দায়িত্ব পড়ল হুডিনির ঘাড়ে। হুডিনি তখন শস্তায় এখানে-সেখানে যাদুর খেলা দেখিয়ে যা রোজগার করছেন তা অতি সামান্য।

কি ছিল বিধাতার মনে, এমনি সময় একজন দুস্থ যাদুকর তাঁর একটি বাক্‌সের খেলা নামমাত্র দামেই বেচে দিতে চাইলেন; হুডিনি টাকা ধার করে সেই বাক্‌স আর গুপ্ত কৌশলটি কিনে নিলেন তাঁর কাছে থেকে।

কাঠের বাক্‌সটি ছিল আয়তনে একটি ছোটো ট্রাঙ্কের মতো। হুডিনি তাঁর ছোটো ভাই থিয়োডোরকে নিয়ে—থিয়োডোরের ডাক নাম 'ড্যাশ'—এই খেলাটি এবং আগেকার কিছু কিছু খেলা "হুডিনি ব্রাদার্স" নামে দেখাতে শুরু করলেন।

ড্যাশকে দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে বাক্সটির ভেতরে পুরে দিয়ে বাক্সটিকে তালাবদ্ধ করে দেওয়া হতো। হ্যারি হুডিনি তখন বাক্সের সামনে পর্দা টেনে দিয়ে শুধু মুখটুকু পর্দার ফাঁক দিয়ে বার করে রেখে গুনতেন "এক···দুই···" আর মুখ সরিয়ে নিতেন পর্দার আড়ালে। "তিন" বলার সঙ্গে সঙ্গে যে মুখটি পর্দার এপারে বেরিয়ে আসতো, সেটি আর হ্যারির নয়, ড্যাশের। সঙ্গে সঙ্গেই পর্দাটি সম্পূর্ণ সরিয়ে দিত ড্যাশ। বাক্সের তালা খুলে দেখা যেত ভেতরে রয়েছেন হ্যারি হুডিনি, তাঁর দুটি হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা।

উনিশ বছর বয়সে হ্যারি বিয়ে করলেন কুমারী বিয়াট্রিস রাহ্নারকে। তারপর থেকে বাক্সের খেলায় ড্যাশের বদলে হ্যারির সঙ্গিনী হতেন বিয়াট্রিস, ওরফে 'বেসি' হুডিনি। মেয়েদের স্কুলে ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে অসাবধানে অ্যাসিড ফেলে বেসির গাউন পুড়িয়ে ফেলেছিলেন হ্যারি হুডিনি, আর তার ক্ষতি-পূরণ করেছিলেন মাকে দিয়ে একটা নতুন গাউন বানিয়ে দিয়ে। সেই গাউন পৌঁছে দিতে গিয়ে আলাপ, খাতির, বিবাহ। বিয়ের পরই 'বেসি' জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তরুণ যাদুকর স্বামীর হাত ধরে। হুডিনি দম্পতি খেলা দেখাতে শুরু করলেন ছোটোখাটো জায়গায়, প্রধানত বিভিন্ন পানশালায়। বেলা দশটা থেকে রাত দশটার ভেতর দিনে দশবার করে খেলা দেখিয়ে দুজনে মিলে দক্ষিণা পেতেন হপ্তায় কুড়ি ডলার মাত্র। পরে এঁরা কাজ পেলেন একটি সার্কাসে। নিজেদের খেলাগুলো তো দেখাতেনই, তার ওপর মাঝে মাঝে হ্যারিকে জঙ্গল থেকে ধরে আনা একটি দুরন্ত জংলী মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে হতো। হ্যারি বিকট চেহারা জংলী মানুষের ছদ্মবেশে খাঁচার ভিতর বসে বসে কাচা মাংস খাবার ভান করতেন আর মাঝে মাঝে জংলী কায়দায় চীৎকার আর মুখভঙ্গী করতেন। হ্যারি হুডিনির সার্কাস জীবনের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে, বাংলার বিখ্যাত যাদুকর গণপতিও প্রথমে তাঁর যাদুর খেলা দেখাতেন বোসের সার্কাসে; স্বাধীন-ভাবে যাদু প্রদর্শন শুরু করেন তার পরে।

সার্কাসে খেলা দেখানো ভালো লাগল না হুডিনির; ছেড়ে দিলেন সার্কাস। নতুন ধরনের খেলায় তৈরি করে নিলেন 'বেসি'কে। মিডিয়ামের ভঙ্গীতে বসে চোখ বুজে বেশ তাড়াতাড়ি সমাধিস্থা হয়ে পড়বার অভিনয়ে পরম পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন বেসি হুডিনি। ছোটো ছোটো শহরে বা শহরতলিতে যেখানেই তাঁদের এই নতুন 'আত্মিক' বা সাইকিক শক্তির খেলা দেখাতে যেতেন হুডিনি দম্পতি, সেখানেই হ্যারি নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য সেখান-

কার সমাধিক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন সমাধিস্তম্ভের ওপর খোদাই করা লেখা পড়ে পড়ে মনে রেখে দিতেন, এখানে সেখানে আড্ডায় গল্পগুজব শুনতেন আড়ি পেতে, এমন কি ক্যান্‌ভাসার সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কথায় কথায় বিভিন্ন পরিবারের নানা কথা জেনে নিতেন। হ্যারির স্মরণশক্তি ছিল অসামান্য প্রখর, বেসি ও ছিলেন অসামান্য বুদ্ধিমতী। কখনো কখনো হ্যারি উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে একজন স্থানীয় লোককে নিযুক্ত করতেন ; লোকটির কাজ হতো প্রেক্ষাগৃহে যাঁরা মিডিয়ামের কাছ থেকে প্রশ্নের জবাব বা 'বাণী' নিতে এসেছেন, হুডিনির কাছে গোপনে তাঁদের পরিচয় জানিয়ে দেওয়া।

গুরুগম্ভীর, অলৌকিক রহস্যময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হতো হুডিনি দম্পতির মিডিয়ামী অভিনয়ে। একটু নমুনা দেওয়া যাক।

সমবেত সবাইকে সচকিত করে স্বপ্নের আবেশভরা চোখে তরুণ হুডিনি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলছেন "এ সম্মেলনে একজন বৃদ্ধ মহোদয় উপস্থিত হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। তাঁর নাম··· তাঁর নাম ইলায়াস। তিনি কি যেন বলতে চাইছেন তাঁর ভাইপোকে। বলছেন, 'অলিভার, মন খারাপ কোরো না। জমিটা তাড়াহুড়ো করে এখনি বেচে দিও না। পরে অনেক অনে—ক বেশি দাম পাবে। তোমার সুদিন আসছে, অলিভার।' এই কথা বলতে চাইছেন বৃদ্ধ ইলায়াস।···"

আশ্চর্য! এ ছোকরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন না হয়ে যায় না। ছোকরা এখানে থাকে না, এসেছে বাইরে থেকে। আসরে উপস্থিত অলিভারকে তার চিনবার কথা নয়। ইলায়াস মারা গেছেন বছর দুয়েক হলো ; ঐ জমিটির ওপর তাঁর মমতা ছিল অসামান্য। জীবিতাবস্থায়ও জমি বিক্রির প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি খেপে উঠতেন। এসব পুরনো কথাও তো এই আগন্তুক ছোকরার জানবার কথা নয়। বৃদ্ধ ইলায়াসের অশরীরী আত্মা কি আজ এই আসরে এসেছে? তাকে দেখে তার মনের কথা শুনতে পাচ্ছে এই রহস্যময় তরুণ? অলৌকিক, সত্যিই অলৌকিক। স্তম্ভিত বিস্ময়ের শিহরণ জাগলো সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে।

কিন্তু ব্যাপারটা যে আসলে ধাপ্পা, তা বোধহয় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, আগে যা বলেছি তাই যথেষ্ট। অবশ্য এই ধাপ্পার সাফল্যের মূলে হুডিনির তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, অদম্য সাহস এবং অনবদ্য অভিনয়। তাছাড়া হুডিনির চোখ দুটিতে ঈশ্বরদত্ত এমন একটি বিশেষত্ব ছিল যা সহজেই অভিভূত করতো মানুষকে।

আরেক দিনের (অথবা সন্ধ্যার) কথা বলি। হুডিনি দম্পতির আত্মিক শক্তির খেলা দেখতে আসছে নানা রকমের মানুষ, নেপথ্য থেকে দেখছেন হ্যারি হুডিনি।

তাঁর বিশেষ নজর পড়লো এক ভদ্রমহিলার দিকে, যিনি তার ছোটো ছেলেকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিলেন অমন করে দুটো হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়ে সাইকেল চালানো নিরাপদ নয়, হঠাৎ পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

খেলার আসরে হুডিনি অলৌকিক দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দর্শনের ভান করে ভদ্রমহিলার উদ্দেশে বললেন "আপনার ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি··· ঝাপসা দেখতে পাচ্ছি··· একখানা হাত ভাঙা··· না, না, এ দৃশ্য বর্তমানের নয়, ভবিষ্যতের।"

বলা বাহুল্য, হুডিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীর ঢিল ছুঁড়েছিলেন সম্পূর্ণ আন্দাজে। কিন্তু—কি ছিল বিধাতার মনে—ঠিক তার পরদিনই দুটো হ্যাণ্ডেল ছেড়ে সাইকেল চালাতে গিয়ে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ছোকরা হাত ভেঙে বসলো। ঝড়ে কাক মরলো, ফকিরের কেরামত বাড়লো। সাড়া শহরে তো বটেই, তার চারধারেও অনেক দূর পর্যন্ত দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়লো হুডিনির বিস্ময়কর, অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির খ্যাতি।

হুডিনি ঠিক করে ফেললেন আর নয়, এবার এই অলৌকিক ব্যবসা থেকে মানে মানে বিদায়। আন্দাজী ভবিষ্যদ্বাণী বারবার মিলবে না, অথচ দর্শকরা এর পর থেকে তাই দাবি করবে। তাছাড়া প্রিয়বিয়োগবিধুর যাঁরা লোকান্তরিত প্রিয়জনের 'বার্তা' বা 'বাণী' পেতে আসেন, তাঁদের বেদনার সুযোগ নিয়ে ভাঁওতা দিয়ে ঠকানোর কল্পনাটাই অত্যন্ত খারাপ লাগলো হুডিনির। ধর্মপ্রাণ পিতার পুত্র তিনি, অতো নিচুতে নামতে পারবেন না কিছুতেই। ছেড়ে দিলেন মিডিয়ামী ব্যবসার পথ। যোগ দিলেন ওয়েল্‌শ্‌ ব্রাদার্সের ভ্রাম্যমাণ সার্কাসের দলে, ঘুরে ঘুরে যাদুর খেলা দেখাতে।

পরবর্তী জীবনে ধোঁকাবাজ পেশাদার মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন হুডিনি, তার মূলে ঐ একই ধারণা : মানুষের গভীর বেদনার সুযোগ নিয়ে তাঁদের ভাঁওতা দিয়ে ভুলিয়ে নিজে লাভবান হওয়ার চেষ্টা অতি জঘন্য কাজ। এর তুল্য পাপ আর নেই।

১৮৯৮ খৃস্টাব্দ। শিকাগো শহর। জেলখানার কর্মচারী অ্যাণ্ডি রোহানের অফিস-ঘরে বসে তরল জলযোগ সহযোগে খোশগল্পে মশগুল কয়েকজন খবরের কাগজের রিপোর্টার। জলযোগের ব্যবস্থা করেছেন হুডিনি দম্পতি, দেখাশোনা করছেন শ্রীমতী বেসি হুডিনি। একটু আগে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে পলায়ন-যাদুকর হ্যারি হুডিনিকে হাতে হাতকড়া আর পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি আটকে দিয়ে একটা সেলের (cell) ভেতর তালাবন্ধ করে রেখে এসেছেন স্বয়ং অ্যাণ্ডি রোহান। শিকাগোর

পুলিশ বিভাগকে হুডিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন ওভাবে তাঁকে আটকে রাখা যাবে না, তিনি মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবেন। সহসা হাসিমুখে এসে ঘরে ঢুকলেন হ্যারি হুডিনি। রিপোর্টাররা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন না। বললেন, "আপনার কাছে বোধহয় নকল চাবি লুকানো ছিল।"

হুডিনি বললেন, "বেশ, আপনাদের যদি সেই সন্দেহই হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে আমার দেহ তন্ন-তন্ন করে খানাতল্লাসি করে ঐ অবস্থাতেই আমাকে আগেকার মতো আবার সেলের ভেতর বন্দী করে রাখুন।"

তাই করা হলো। হুডিনি তবু মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন—এবার বরং আরো তাড়াতাড়ি।

গরাদের সারির ফাঁক দিয়ে সেলের ভেতরে লোহার বাঁধনে হাত-পা বাঁধা হুডিনির ছবিসহ খবর ছাপা হলো পরদিন খবরের কাগজে ভালো জায়গা জুড়ে।

বলা বোধহয় বাহুল্য, ফোটোগ্রাফ ব্যবস্থার পেছনে ছিল হুডিনির উদ্যোগ।

এমন দুর্দান্ত প্রচার হুডিনি আগে কখনো পাননি। জেলখানায় সেলের ভেতর থেকে হুডিনি পালিয়েছেন! প্রচণ্ড বিস্ময়ের সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। আত্মপ্রচারের এই বিরাট সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লেন না হুডিনি। তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়, তবু বেশ কিছু ডলার খরচ করে তিনি নিউ-ইয়র্কের রঙ্গজগৎ সম্পর্কিত একটি পত্রিকায় টেলিগ্রামে একটি বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিলেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, "হাতকড়ার রাজা" (King of Handcuffs) হুডিনিকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে তিনজন ডাক্তার তাঁর সারাদেহ তন্ন-তন্ন করে খানা-তল্লাসি করার পর তাঁর মুখ বন্ধ করে শীলমোহর করে দেওয়া হয়েছিল; হুডিনি সেই অবস্থাতেই তাঁদের লাগানো হাতকড়া, ডাণ্ডাবেড়ি, বেল্ট্, পাগলদের অচল করে রাখবার জামা (Strait Jacket) প্রভৃতি সব রকম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

১৯০০ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি হুডিনি বেসিকে নিয়ে গেলেন লণ্ডনে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো সংস্কৃতি এবং আমোদ-প্রমোদের জগতেও তখন লণ্ডন শহরের খ্যাতি ও মর্যাদা অসামান্য। লণ্ডনের "আল্‌হাম্‌রা" রঙ্গালয় ছিল প্রমোদ-জগতের শিল্পীদের কাছে পরম লোভনীয় তীর্থভূমি। সেখানকার কর্ণধার ডাণ্ডাস স্লেটার এই সদ্য-আগত তরুণ মার্কিন যাদুকরকে বললেন, "তুমি যদি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হাতকড়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারো, তাহলে দু-হপ্তার জন্য তোমাকে আল্‌হাম্‌রা রঙ্গালয়ে খেলা দেখাবার সুযোগ দিতে পারি।"

চ্যালেঞ্জ! হুডিনি গ্রহণ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, "এখ্খুনি চলুন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে।" গেলেন দুজনে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেলভিল বললেন, "এখানে শস্তা তামাসা চলবে না। হাত-কড়া যদি লাগাই তো সত্যিকারের হাতকড়াই লাগাবো, আর তার চাবিটি তোমার হাতে দেবো না।"

হুডিনি বললেন, "যতো জোড়া খুশি হাতকড়া আর পায়ে বেড়ি লাগান। আপত্তি নেই।"

মেলভিল তাঁর টেবিল থেকে একজোড়া 'রেগুলেশন' হাতকড়া নিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হুডিনিকে সঙ্গে আসতে ইশারা করলেন। তারপর হঠাৎ হুডিনির দুটি হাত একটি থামের দুদিকে চালিয়ে দিয়ে দুটি হাতে হাতকড়া পরিয়ে আটকে দিলেন। থামের সঙ্গে আটকে গেলেন হুডিনি, হাতকড়া খুলে না দিলে থাম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারবেন না।

স্লেটারের দিকে তাকিয়ে মেলভিল হেসে বললেন, "চলুন আমরা যাই। ঘণ্টা খানেক বাদে এসে একে খুলে দেওয়া যাবে।"

দুজনে এগিয়ে যাচ্ছেন, শুনলেন হুডিনির পিছু ডাক: "একটু দাঁড়ান। আমিও যাবো আপনাদের সঙ্গে।"

দুজনে পিছু তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন হুডিনি মুক্ত। এবারে হাসির পালা হুডিনির: মেলভিলের হাতে হাতকড়া ফিরিয়ে দিয়ে মৃদু হাসলেন তিনি।

খুশি হয়ে অভিনন্দন জানালেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেলভিল। সেদিনই হুডিনির সঙ্গে স্লেটারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল, আল্হাম্‌রা রঙ্গালয়ে দু-সপ্তাহ খেলা দেখাবেন হুডিনি। সারা লণ্ডনে খবর ছড়িয়ে গেল, লণ্ডন পুলিশের প্রধান কেন্দ্র স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হাতকড়া হার মেনেছে নবাগত তরুণ মার্কিন যাদুকর হ্যারি হুডিনির কাছে। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন হুডিনি। দু-সপ্তাহের চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু অসামান্য জনপ্রিয়তার দরুন হুডিনির খেলা চললো ছ'মাস, হুডিনির পারিশ্রমিক সপ্তাহে ষাট পাউণ্ড, অর্থাৎ মার্কিন টাকায় তিনশো ডলার!

হুডিনির ম্যানেজার হলেন তরুণ বুকিং এজেণ্ট হ্যারি ডে. যাঁর মাধ্যমে হুডিনি পরিচিত হয়েছিলেন আল্হাম্‌রার কর্ণধার স্লেটারের সঙ্গে। ডে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে লাগলেন ইউরোপের বিভিন্ন রঙ্গালয়ের ম্যানেজারদের সঙ্গে। জার্মানির ড্রেসডেন শহরের সেণ্ট্রাল থিয়েটারের সঙ্গে চুক্তি হলো, হুডিনি সেখানে যাবেন খেলা দেখাতে।

জার্মান ভাষা ভালোই জানা ছিল হুডিনির, বাবার কাছে শেখা। ড্রেসডেনে দর্শকমণ্ডলীকে প্রথম সম্ভাষণ জানালেন জার্মান ভাষায়, সঙ্গে সঙ্গে জয় করে নিলেন সবার হৃদয়। জার্মানিতে তখন চলছে কাইজারের কঠোর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, ব্যক্তিস্বাধীনতা নানাভাবে সংকুচিত, নানা বিধিনিষেধের বন্ধনে বন্দী জার্মান জনসাধারণের মন মুক্তির জন্যে ব্যাকুল। তাই হুডিনি যখন সব রকমের বন্ধন থেকে রহস্যময়ভাবে নিজেকে মুক্ত করে এসে দাঁড়াতেন, তখন এই অসাধারণ মুক্তি-যাদুকরের সঙ্গে কল্পনায় একাত্মতা অনুভব করে দর্শকবৃন্দ উল্লাসে আত্মহারা হয়ে উঠতো।

এরপর পালাক্রমে বহুবার জার্মানি থেকে ইংলণ্ডে আর ইংলণ্ড থেকে জার্মানিতে যাতায়াত করতে হলো হুডিনিকে, হুডিনি-ভক্ত দর্শকদের চাহিদা মেটাতে। তারপর ১৯০১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরে তাঁর প্রদর্শনী শুরু হলো পারী (Paris) শহরে, রবেয়ার উদ্যাঁর মাতৃভূমিতে। উদ্যাঁর মাতৃভূমি! যে উদ্যাঁর আত্মস্মৃতি পাঠ করে তিনি প্রেরণা লাভ করেছিলেন শ্রেষ্ঠ যাদুকর হবার, যে উদ্যাঁকে আদর্শ রূপে, 'হিরো'-রূপে অসীম মর্যাদার আসন দিয়েছেন হৃদয়ে। "আধুনিক যাদুবিদ্যার জনক" (Father of Modern Magic) রবেয়ার উদ্যাঁ! যাঁর আদর্শ অনুসরণ করে তিনি আজ এত বড়ো হয়েছেন যে তাঁকে নিয়ে কড়াকড়ি আড়াআড়ি চলছে থিয়েটারে-থিয়েটারে।

উদ্যাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিতে গেলেন হুডিনি। দেখলেন শ্রীমতী উদ্যাঁর সমাধি নেই পাশে। অনুসন্ধানে জানলেন বৃদ্ধা বিধবা বাস করেন নিরালায় পল্লী অঞ্চলে। দেখা করতে গেলেন হুডিনি। পরিচারিকার হাত দিয়ে কার্ড পাঠিয়ে দিলেন শ্রীমতী উদ্যাঁর কাছে। কার্ডে শুধু একটি মাত্র শব্দ লেখা:

হুডিনি।

কিছুক্ষণ বাদে পরিচারিকা এসে কার্ড ফেরৎ দিয়ে জানালো কর্তামা দেখা করবেন না, হুডিনি নামের কাউকে তিনি চেনেন না। বলেই ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে দিল হুডিনির মুখের ওপর।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের চাইতেও ভয়ানক এ অপমান। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন হুডিনি; তাঁকে কিছুতেই বোঝানো গেল না চলতি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্লিপ্ত জীবন যাপন করছেন উদ্যাঁর বৃদ্ধা বিধবা, বর্তমান যাদুজগতের সেরা বিস্ময় হুডিনির নামটি তাঁর অজানা থাকা বিস্ময়ের কিছু নয়। প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নিলেন হুডিনি। দীর্ঘ অনুসন্ধান, সংগ্রহ আর গবেষণার পর সাত

বছর বাদে নিজের খরচে প্রকাশ করলেন বৃহৎ গ্রন্থ "রবেয়ার উদাঁ্যা-র মুখোস উন্মোচন" (The Unmasking of Robert Houdin)। এতে বহু পুরাতন দলিলপত্র এবং চিত্রের সাহায্যে তিনি প্রতিপন্ন করলেন উদাঁ্যা যে-সব যাদুর খেলা তাঁর নিজের মৌলিক আবিষ্কার বলে দাবি করতেন সেগুলো মোটেই তাঁর মৌলিক আবিষ্কার নয়, পুরনো খেলার নবরূপায়ণ মাত্র , এবং তাঁর আত্মস্মৃতিও তিনি নিজে লেখেননি, লিখিয়ে নিয়েছিলেন কোনো পেশাদার লেখককে দিয়ে। এতে হুডিনির গায়ের ঝাল মিটেছিল বটে, কিন্তু তিনি অমর যাদুকর রবেয়ার উদাঁ্যাকে তাঁর উচ্চ মর্যাদার আসন থেকে টলাতে পারেননি। বরং শ্রদ্ধেয় উদাঁ্যার প্রতি এভাবে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে যাদুকর মহলে কিছুটা অপ্রিয়ই হয়েছিলেন হুডিনি। একথা তবু ঠিক যে, যাদুবিদ্যার ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে হুডিনির এ গ্রন্থটি পরম মূল্যবান।

পারী শহরে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে কিছুদিন খেলা দেখিয়ে আবার জার্মানিতে ফিরে গেলেন হুডিনি। কোলোন (Cologne) শহর। ১৯০২ খৃস্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি। আদালতে বিচার শুরু হলো। মানহানির মামলা, নালিশ করেছেন হ্যারি হুডিনি। যাঁর বিরুদ্ধে নালিশ, তিনি হচ্ছেন কাইজার সরকারের একজন প্রবল পরাক্রান্ত পুলিশ কর্মচারী, ভের্নার গ্রাফ (Werner Graff)। দুরন্ত সাহস হুডিনির, তার চাইতেও বেশি সাহস হুডিনির জার্মান উকিল ডাঃ শ্রাই-বারের (Schreiber)। কাইজারের পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ !

কোলোন শহরের একটি কাগজে একটি প্রবন্ধে গ্রাফ লিখেছিলেন হুডিনি ধাপ্পাবাজ, শুধু নিজের হাতকড়া, ডাণ্ডাবেড়ি বা শেকলের বন্ধন থেকেই মুক্ত হতে পারেন, "যে কোনো" হাতকড়া ইত্যাদি থেকে পারেন না। আদালতে বিচারক এবং জুরিদের তিনি বললেন, শেকল দিয়ে হাত আটকে দিলে হুডিনি তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন না।

গ্রাফের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন হুডিনি। পুলিশের একজন লোক 'রেগুলেশন শেকলে হুডিনির দুটি হাত আটকে তালাবদ্ধ করে দিলেন, যেভাবে অপরাধীদের আটকানো হতো। আদালতে দাঁড়িয়ে সবার সামনে অনায়াসে দুহাত মুক্ত করে নিলেন হুডিনি ; তালাসমেত শেকল হাত থেকে ঝনাৎ করে খসে পড়লো আদা-লতের মেঝের ওপর। আদালত রায় দিলেন হুডিনির পক্ষে : ভের্নার গ্রাফকে 'কাইজারের নামে' প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে হুডিনির কাছে।

গ্রাফ আপীল করলেন উচ্চতর আদালতে। সেখানে তিনি বিশেষভাবে

তৈরি করানো এমন একটি তালা দিলেন যাকে একবার বন্ধ করে দিলে চাবি দিয়েও খোলা যায় না। হুডিনি সে তালা খুলে দিলেন মাত্র চার মিনিটে! সুতরাং এ আদালতেও গ্রাফ হেরে গেলেন। হেরে আবার আপীল করলেন জার্মানির উচ্চতম আদালতে। পাঁচজন বিচারকের সম্মিলিত রায় হলো : গ্রাফ ত্রিশ মার্ক জরিমানা দেবেন, অন্যথায় ছয় দিনের কারাবাস ভোগ করবেন, তিনটি মামলার খরচ দেবেন হুডিনিকে, এবং হুডিনি এই রায়ের নকল কোলোন শহরের খবরের কাগজগুলোতে একবার ছাপাতে পারবেন গ্রাফের খরচে।

এ রায় বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে হুডিনিকে নিয়ে একেবারে মেতে উঠলো জার্মান জনসাধারণ। কাইজারী পুলিশের দাপটে তারা অস্থির, সেই কাইজারী পুলিশকে আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছেন হুডিনি। ধন্য হুডিনি! সাবাস হুডিনি!

কাইজারের জার্মানি থেকে এবার চলা যাক জারের রাশিয়ায়। সেখানে রাশিয়ার পুলিশ বিভাগ তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বললে, তাঁদের কয়েদী গাড়ি থেকে তিনি কিছুতেই পালাতে পারবেন না। হুডিনি বললেন, "নিশ্চয় পারবো, কিন্তু দোহাই আপনাদের, একটি সাধারণ কয়েদী গাড়ির ভেতর আমাকে আটকাবেন। আর সাধারণ কয়েদীদের বেলায় যেমন তালা লাগান, ঠিক তেমনি লাগাবেন, তার বেশি নয়।" পুলিশ কর্মচারীরা বললেন, "তা হবে না। গাড়ির গরাদগুলো বেশি ঘন করে দেবো, বাইরে তালাও বেশি করে লাগাবো। তার থেকে আপনাকে পালাতে হবে।" অনেক আপত্তির ভান করে অবশেষে হুডিনি, যেন অগত্যা বাধ্য হয়েই, রাজী হলেন। শর্ত হলো হুডিনিকে হাতকড়া লাগিয়ে গাড়ির ভেতর পুরে দরজায় তালা লাগিয়ে পুলিশ কর্মচারীরা এমন জায়গায় সরে যাবেন যেখান থেকে গাড়িটিকে দেখা না যায়। তাঁরা বললেন, "তাই হবে।" তাই হলো। তারপর ঘণ্টাখানেক বাদে, পুলিশ কর্মচারীরা পুলিশ ব্যারাকে বসে গল্পগুজব করছেন, এমন সময় হুডিনি এসে উপস্থিত। তাঁরা সবাই মিলে ছুটে গিয়ে দেখেন কয়েদীগাড়িটি যেমন তালা লাগানো ছিল, তেমনি আছে। তাহলে হুডিনি বেরোলেন কি করে? চাবি ছিল না তাঁর কাছে, আর চাবি থাকলেও গাড়ির ভেতর থেকে বাইরের তালার নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না।

হুডিনির প্রতিভায় এবং ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে রাশিয়ার জার (Czar) তাঁকে একটি মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন।

খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, এবং বিস্ময়প্রিয় জনসাধারণকে নব নব বিস্ময় দিয়ে চমকে দেবার জন্য হুডিনি যে কঠোর পরিশ্রম এবং দৈহিক

ক্লেশ সহ্য করতেন তার তুলনা মেলে না। অবশ্য অমন শক্ত শরীর ছিল বলেই তা সম্ভব হতো। এই শক্ত শরীরের বড়াই করতেন হুডিনি; শেষকালে পরোক্ষ-ভাবে তাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হলো। সেই কাহিনীই বলি।

তখন মনট্রিল শহরে খেলা দেখাচ্ছিলেন হুডিনি। বিশ্রাম করছেন রঙ্গালয়ের সাজঘরে। তিনজন ছাত্র এলো দেখা করতে। তাদের ভিতর একজন বক্সিং-এ ওস্তাদ। সে কথায় কথায় বললে, "আপনি নাকি কোমরের ওপর (মুখ বাদ দিয়ে) অন্য কোনো জায়গায় ঘুষি মারলে অনায়াসে সহ্য করতে পারেন?"

হুডিনি একটা চিঠি দেখছিলেন, আধা-আনমনাভাবে বললেন, "পারি বই কি।" সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটি দু-তিনটি প্রচণ্ড ঘুষি চালালো হুডিনির তলপেটে। অতর্কিতে আঘাত পেয়ে যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠলো হুডিনির মুখ। পেট চেপে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, "ওভাবে নয়। আগে আমাকে তৈরি হয়ে নিতে হবে। নাও, এইবার মারো যতো খুশি।" বলে শক্ত করলেন পেটের পেশীগুলো। ছেলেটি আবার ঘুষি চালালো, যেন লোহার দেয়ালে আহত হয়ে ফিরে এলো তার বদ্ধমুষ্টি।

কিন্তু আগেকার চোটগুলো মারাত্মক হয়েছিল। তারই ফলে কয়েকদিন পর, ৩১শে অক্টোবর, ১৯২৬ খৃঃ মারা গেলেন হ্যারি হুডিনি।

যাদুকর গণপতি

"শান্তিনিকেতনে যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই দেখলাম গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিক। দেখলাম তাঁর সেই প্রসিদ্ধ বাক্সের খেলা (ইলিউশন বক্স)। এই আসরে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন কিছুক্ষণ। এক যাদুকর আরেক যাদুকরের সামনে বসে আছেন।..."

উদ্ধৃতিটি শ্রীপরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতি-চিত্রণ' গ্রন্থ থেকে। ইলিউশন বক্সটি ছিল একটি বড়ো কাঠের বাক্স। খেলা আরম্ভ হবার আগে সন্তোষ মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও অনেকে বেশ ভালোভাবে বাক্সটি পরীক্ষা করলেন। গণপতির দুখানা হাত পিছমোড়া করে এবং দুখানা পাও কষে বাঁধা হলো। তারপর তাঁকে একটি থলেতে পুরে থলের মুখ বেঁধে সেই বাক্সে পোরা হলো। বাক্সটি চারদিক থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তালা বন্ধ করে বাক্সের সামনে কালো পর্দা ঝুলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দা ভেদ করে দুখানা হাত বেরিয়ে এসে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। হাত দুটি সরে যেতেই পর্দাও সরিয়ে দেওয়া হলো, দেখা গেলো বাকস বন্ধই আছে।

বাক্সের ওপর বাঁয়া-তবলা রেখে পর্দা ঝুলিয়ে দিতেই দর্শকদের ফরমায়েশ মতো তাল বাজতে লাগল বাঁয়া-তবলায়। ভুতুড়ে ব্যাপার! পর্দা সরে গেলো, বাক্স পূর্ববৎ। আবার পর্দার আবরণ। সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর নিজে বেরিয়ে এলেন। বলা হলো, আপনারা যাদুকরকে এমনভাবে চিহ্নিত করে দিন যেন ঐ চিহ্ন দেখে চিনে নিতে পারেন। যাদুকরকে কেউ পরিয়ে দিলেন আংটি, কেউ চশমা। যাদুকর পর্দার আড়ালে যেতেই পর্দা সরিয়ে নেওয়া হলো। দড়ি খুলে, তালা খুলে, বাক্স খুলে, মুখ বাঁধা থলি খুলে দেখা গেলো দর্শকদের দেওয়া আংটি আর চশমা পরা অবস্থায় থলের মধ্যে রয়েছেন তেমনি হাত-পা বাঁধা যাদুকর গণপতি।

গণপতির আরেকটি আশ্চর্য খেলা ছিল "ইলিউশন ট্রী" অর্থাৎ যাদু গাছ। গাছটি ছিল গাছ নয়, একটি খাড়া ক্রস। সেই ক্রসের সঙ্গে তাঁকে শেকল, হাতকড়া ইত্যাদির সাহায্যে এমনভাবে আটকে দেওয়া হতো যে, তা থেকে নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু যেমন ঐ ইলিউশন বক্স, ঠিক তেমনি এই ক্রসের বাঁধনও তাঁকে বন্দী করে রাখতে পারেনি। তিনি দ্রুতবেগে

তা থেকে বেরিয়ে এসে আবার ঐ অবস্থাতেই ফিরে যেতেন। তাছাড়া ঐ কাঠের ক্রসে আটকানো অবস্থাতেই তাঁকে পর্দা দিয়ে ঘিরে পর্দার ভেতর যে পোশাক ছুঁড়ে দেওয়া হতো, সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে দিতেই দেখা যেতো গণপতি সেই ছুঁড়ে দেওয়া পোশাকটি পরে ফেলেছেন, অথচ তাঁর বন্ধন অবস্থা তেমনই রয়েছে।

উক্ত দুটি খেলাই অভাবনীয় ক্ষিপ্রতা এবং নিখুঁত দক্ষতার সঙ্গে দেখাতেন যাদুকর গণপতি। দুটি খেলাকেই ভৌতিক বলে মনে হতো ; অলৌকিক সাহায্য ছাড়া অমন অসম্ভব সম্ভব হয় কি করে? সহজ বিশ্বাসী সেকেলে দর্শকদের কথা নাই বললাম, যাঁরা জানতেন ম্যাজিক জিনিসটা আগাগোড়া ফাঁকি, নিতান্ত একেলে সেই নাস্তিক দর্শকদের মনেও যাদুকর গণপতির ঐ কাণ্ড দেখে খটকা লাগতো : তবে কি সত্যিই গণপতি তন্ত্রসিদ্ধ হয়ে অলৌকিক ভূতুড়ে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন? মিরাক্‌ল-এর যুগ কি তাহলে পুরোপুরি বিগত হয়নি?

গণপতির দেব-দেবীতে ভক্তি ছিল অসাধারণ, তিনি পুজো-আর্চা করতেন নিয়মমতো, খুব ছোটো করে চুল ছাঁটতেন এবং টিকি রাখতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর আচার-ব্যবহার থেকে লোকের মনে এ বিশ্বাস সহজেই হতো যে, তিনি তন্ত্রের সাধনা করেন এবং তার ফলে নানা রকমের অলৌকিক শক্তি তাঁর করায়ত্ত। সাধারণের মনে তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা-ভীতিমিশ্রিত বিশ্বাস যাতে বজায় থাকে সেদিকে তিনি যত্নবান ছিলেন, পেশাদার এনটারটেনার অর্থাৎ জনগণমনোরঞ্জক রূপে এর মূল্য তিনি বুঝতেন।

গণপতির এ দুটি খেলা সর্বশেষ দেখেছিলাম ১৯৩১ খৃস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে একটি স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনীতে অনুষ্ঠিত যাদুকরের কুম্ভমেলায় (স্বনামধন্য যাদুকর রাজা বোসও সেই যাদু কুম্ভমেলায় যোগ দিয়েছিলেন।)। গণপতির বয়স তখন ভাঁটার দিকে। সেই বয়সেও অলৌকিক শক্তিমান যাদুকরের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি আমাদের চোখে প্রায় অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যেই বিস্ময়ের যে মায়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন, তার তুলনা আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি।

গণপতির পিতৃদেব ছিলেন শ্রীরামপুর চাত্‌রা নিবাসী জমিদার। বালক গণপতির ঝোঁক লেখাপড়ার দিকে একেবারেই ছিল না। পাড়ায় গান-বাজনার চর্চা ছিল, তিনি তাইতেই মেতে ছিলেন। অভিভাবকদের চেষ্টা হলো কি করে লেখাপড়ায় গণপতির খানিকটা মন বসানো যায়। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা শোচনীয়ভাবে

ব্যর্থ হলো। লেখাপড়া তাঁকে কিছুতেই করানো গেল না। তিনি দক্ষ হলেন শুধু গানে আর তবলা বাদনে। মূর্খ হয়ে থাকা যে একটা লজ্জার বিষয় হতে পারে, সে কথাটা কিছুতেই তাঁর মাথায় ঢুকলো না। লেখাপড়া না শিখলে জমিদারি সম্পত্তির অংশ তাঁকে দেওয়া হবে না—এই ভয় দেখানো হলো তাঁকে। কিন্তু এই শাসানির ফল হলো উলটো। গণপতির জেদ এবং আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রচণ্ড রকমের। এ ব্যাপারে বাড়ির বড়োদের ওপর ভয়ানক চটে গিয়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে পালালেন। তখন তাঁর বয়স সতেরো কি আঠারো (এ সব কথা শুনেছি গণপতির প্রিয় শিষ্য স্বনামধন্য যাদুকর দেবকুমারের মুখে)।

পালিয়ে তিনি খুব ভালো করেছিলেন, কারণ তা না হলে বাংলার তথা ভারতের যাদুচর্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় গণপতিকে আমরা পেতাম না। বাড়ি থেকে পালিয়ে তিনি বাংলার বাইরে নানা স্থানে ভবঘুরেপনা করে বেড়ালেন, সাধু-সন্ন্যাসীর দলে মিশলেন, তাঁদের অনেক কলকেতে অনেক গাঁজা সাজলেন, তাঁদের কাছ থেকে নানা রকমের গুপ্ত মন্ত্রতন্ত্র, ভবিষ্যৎ গুনবার কায়দা, ঝাড়ফুঁক, নানা রোগের নানা অলৌকিক দাওয়াই ইত্যাদি শিখে নেবার জন্য। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে সাপুড়ে সাহজী (অন্নদাদিদির স্বামী) সাপ জব্দ করার মিথ্যে মন্ত্র শেখাবার লোভ দেখিয়ে ইন্দ্রনাথকে যেমন ঘুরিয়েছিলেন, কয়েকজন সাধু অনেকটা তেমনিভাবেই ঘুরিয়েছিলেন গণপতিকে। গুপ্ত বিদ্যা শিখবার জন্য তাঁর এ অভিযান একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল তা নয়, কিন্তু যতোটা পাবেন বলে আশা করেছিলেন তার তুলনায় পেয়েছিলেন সামান্যই। এই সামান্যকেই কাজে লাগিয়ে অসামান্য করে তুলেছিলেন গণপতি। বাড়ি থেকে পালিয়ে এই ঘোরাঘুরির সময় তিনি দু-এক জন যাদুকরের সংস্পর্শেও এসেছিলেন, তাই থেকে তাঁর যাদু-জীবনের সূত্রপাত।

ঘোরাঘুরি করে ফিরে এসে গণপতি যোগ দিলেন প্রফেসর বোসের সার্কাসে। "বোসেজ সার্কাস" (Bose's Circus) তখন শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে বিখ্যাত। এ দলে কয়েকজন বেশ ভালো সার্কাস খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন সুশীলা নামে একটি বাঙালী মেয়ে। সাহসে এবং দৈহিক শক্তিতে তিনি ছিলেন অসাধারণ; শোনা যায় পাঞ্জা এবং কব্জির জোরে অনেক জোয়ান গোরা সৈনিকও তাঁর কাছে হার মেনেছিল। সুশীলা দেখাতেন বাঘের খেলা। একে মেয়ে, তায় বাঙালী মেয়ে, তাই সুশীলার দুঃসাহসিক বাঘের খেলা ছিল বোসের সার্কাসের সেরা আকর্ষণ। গণপতি সর্বপ্রথম সাধারণ দর্শকদের সামনে

ম্যাজিক দেখাতে শুরু করলেন বোসের সার্কাসে, সার্কাসি খেলার ফাঁকে ফাঁকে। ম্যাজিকে ছিল তাঁর চমৎকার দক্ষতা, অভিনয়ে – বিশেষ করে কৌতুক অভিনয়েও তিনি কম দক্ষ ছিলেন না, মজাদার যাদুর খেলা দেখিয়ে তিনি সার্কাসের দর্শকদের হাসাতে আর তাক লাগিয়ে দিতে লাগলেন। জনপ্রিয় বোসের সার্কাসের জনপ্রিয় এবং প্রায় অপরিহার্য শিল্পী হয়ে উঠলেন যাদুকর গণপতি। পরে গণপতি যখন তাঁর বিখ্যাত ইলিউশন বকস এবং ইলিউশন ট্রী-র খেলা দেখাতে শুরু করলেন, তখন তিনিই হয়ে উঠলেন বোসের সার্কাসের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। সার্কাসের অন্য সমস্ত খেলা নিষ্প্রভ হয়ে গেল গণপতির অবিশ্বাস্য অলৌকিক বাকসের খেলার কাছে। শেষ পর্যন্ত শুধু ঐ বাক্সের খেলা – যা দেখবার জন্যে লোক পাগল, দেখিয়ে গণপতি মাসে তিনশো টাকা পেতে লাগলেন। তখনকার দিনের তিনশো টাকা মানে এখনকার অন্তত হাজার টাকা।

বোসের সার্কাস দলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বহু জায়গায় অসংখ্য লোককে যাদুর খেলা দেখিয়ে বেড়িয়েছেন গণপতি, লাভ করেছেন অসামান্য সম্মান এবং খ্যাতি। বাক্স এবং ক্রসের খেলার পরে আরেকটি খেলাও শুরু করেছিলেন, তার নাম "কংস কারাগার।" বোসের সার্কাস প্রদর্শনীর প্রচারপত্রে খেলাটি ঐ নামেই বিজ্ঞাপিত হতো এবং বহু দর্শক আকর্ষণ করতো। কারাগারটি একটি মানুষকে আটকে রাখবার মতো খাঁচা বিশেষ। এই খাঁচার ভেতর হাতকড়া, ডাণ্ডাবেড়ি ইত্যাদি প্রচুর সংখ্যায় লাগিয়ে গণপতিকে আটকে রাখা হতো, যেন কংসের কারাগারে বন্দী রয়েছেন বসুদেব। ঐ বন্দী অবস্থা থেকে কোনো মানবের সাহায্য ছাড়া বেড়িয়ে আসা কোনোরকম মানবিক উপায়ে সম্ভব নয়। কিন্তু অনায়াসে এবং দ্রুতবেগে তিনি খাঁচা শূন্য করে বেরিয়ে আসতেন এবং তারপর আবার ঠিক সেই অবস্থাতেই ফিরেও যেতেন। ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খাঁচার সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দেখা যেতো, খাঁচার দরজা তেমনি তালা আটকানো এবং তার ভেতরে হাতকড়া, বেড়ি ইত্যাদি দ্বারা অসহায় বন্দী অবস্থায় রয়েছেন গণপতি। ভৌতিক সাহায্য ছাড়া এই অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সম্ভব হতে পারে?

খেলাটি অদ্ভুত বিস্ময়ে ভরা, তার ওপর "কংস কারাগার" নামটিও অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। গণপতি নামটিও তখন কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়ে গেছে। বোসের সার্কাসে লোকে লোকারণ্য হতে লাগলো গণপতির খেলা দেখবার জন্য। সবার মুখে শুধু একটি নাম : গণপতি। সবার মনে এক ধারণা, গণপতির অভিধানে 'অসম্ভব' শব্দটি নেই। পাশ্চাত্য দেশে যাদুকর হ্যারি হুডিনি পলায়নী যাদুরখেলা

দেখিয়ে যে তুমুল বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন, প্রাচ্যে যাদুকর গণপতির বিস্ময়-সৃষ্টি তার সঙ্গে তুলনীয়। তুলনা জিনিসটাই যদিও ভালো নয়, তবু বলা যায় এক হিসাবে পাশ্চাত্যের হুডিনির চাইতে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন আমাদের গণপতি। হুডিনি শুধু বিস্ময় সৃষ্টি করতেন, কৌতুক সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কিন্তু গণপতি বিস্ময় সৃষ্টিতে যেমন ছিলেন অনন্য, তেমনি কৌতুক-সৃষ্টিতেও তাঁর সহজ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। গণপতির ভেতর যেন দুটি মানুষ—ডাক্তার জেকিল এবং মিস্টার হাইডের মতো। ম্যাজিকের ছোটোখাটো খেলা দেখাবার সময় (যেমন একটা বাক্স খালি দেখিয়ে তা থেকে নানারকমের জিনিস বার করা) তিনি কি রকম কৌতুক করে হাসির আবহাওয়া তৈরি করতেন, শ্রীপরিমল গোস্বামী 'স্মৃতি-চিত্রণ' গ্রন্থে তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। বোসের সার্কাসেও বড়ো খেলা-গুলো দেখাবার আগে হাস্যকর পোশাক পরে এসে রুমাল নাচানোর খেলা (পিক্‌লু মণির নাচ) এমন মজাদার মুখভঙ্গী এবং অঙ্গভঙ্গী করে দেখাতেন যে, দর্শক-মহলে হাসির স্রোত বয়ে যেত। তখন কল্পনাও করা যেত না, এই আধা-ক্লাউন লোকহাসানো লোকটিই আবার গুরুগম্ভীর বিস্ময় সৃষ্টি করে স্তম্ভিত করে দেবার ক্ষমতা রাখেন।

রামপ্রসাদের একটি গান আছে, "সুরা পান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে"। গণপতিও জয় কালী বলে সুধা পান করতেন একটু বেশি মাত্রায় ওটা ছিল তাঁর অনেক দিনের নেশা। সার্কাসের কর্তা প্রফেসর বোস অত্যন্ত কড়া লোক ছিলেন, সার্কাসের কোনো শিল্পীর তাই পানদোষ জন্মাতে পারেনি; কিন্তু তাঁর নিষেধের কড়াকড়ি গণপতির ওপর তিনি খাটাতে চেষ্টা করতেন না, নিশ্চিত ব্যর্থ হবেন জেনে। গণপতির বেলায় তাঁর কড়াকড়ির ব্যতিক্রমে সার্কাসের কোনো কোনো শিল্পী ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তা প্রফেসর বোসের অজানা ছিল না, কিন্তু দুর্বাসা গণপতিকে চটাতে সাহস পেতেন না তিনি (অত্যন্ত কড়া মেজাজ এবং অনুরূপ কড়া বচনের জন্য সার্কাসের সবাই গণপতির নেপথ্য নাম দিয়েছিল দুর্বাসা মুনি)।

গণপতি তাঁর ম্যাজিক নিয়ে বোসের সার্কাসে ঢুকেছিলেন সার্কাসী খেলার ফাউ হিসেবে। শেষটায় দেখা গেল গণপতিরই জয়জয়কার, গণপতিই আসল, সার্কাসটাই ফাউ। তখন গণপতি একদিন ঠিক করলেন তিনি নিজে আলাদা দল করবেন, বোসের সার্কাসে আর থাকবেন না।

শুনে প্রফেসর বোস হেসে বললেন, "তোমার সংকল্প সাধু, সন্দেহ নেই। কিন্তু

বাপু, দল চালানো অনেক ঝামেলার ব্যাপার, এতে মাথা ঠিক রেখে কাজ করতে হয়, তোমার মতো মাতালের কর্ম নয়।"

দল চালানো মাতালের কর্ম নয়! এই একটি কথা গিয়ে আঘাত করল গণপতির মনের তন্ত্রীতে। কথাটা শুনে চটলেন না তিনি। বললেন, "বেশ, তাহলে মদ ছেড়ে দেবো।"

আবার হাসলেন প্রফেসর বোস। বললেন, 'কিন্তু মদ তোমাকে ছাড়বে কি?'

"আলবৎ ছাড়বে।" দৃঢ় কণ্ঠে বললেন গণপতি। "ছাড়িয়ে ছাডব।"

শুনে গণপতির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন সার্কাসের মালিক প্রফেসর বোস। আর প্রফেসর বোসের দিকে তাকিয়ে অলক্ষ্যে মৃদু হাসলেন বিধাতা।

তারপর একদিন সারি সারি সুধার বোতল নিয়ে আপন ঘরে বসলেন অনেক দিনের সুধাপ্রেমিক যাদুকর গণপতি। জয় মা কালী বলে আজ এ জন্মের মতো আশ মিটিয়ে সুধা পান করে নেবেন তিনি। বোতলের পর বোতল খালি করে চললেন নিজের ভেতরে, বেলা যত চড়তে লাগলো, নেশা চড়তে লাগলো তদধিক। নেশা চড়তে চড়তে কখন যে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন টের পেলেন না। অদ্ভুত নেশার ঘোরে কেটে গেল গণপতির জীবনের চরমতম নেশাগ্রস্ত দিন।

শুনেছি তারপর জীবনে আর কোনোদিন সুধার বোতল বা বোতলের সুধা স্পর্শ করেননি যাদুকর গণপতি।

বোতলের সুধা, আর বোসের সার্কাস—এই দুয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করলেন যাদুকর গণপতি। প্রথমটির পুরাতন প্রেমিক যাঁরা, তাঁরাই সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন—যাঁরা ও-রসের রসিক নন তাঁরা অনুমান করে নেবেন—ঐ পদার্থটির 'ক্রনিক' নেশা এক কথায় একেবারে ছেড়ে দেওয়া কত কঠিন। এই কঠিনকে সহজে সয়ে নেবার অসামান্য ক্ষমতা ছিল অসাধারণ-চরিত্র গণপতির।

সার্কাসের মালিক প্রফেসর বোস—বলাই বাহুল্য—গণপতিহীন 'বোসেজ সার্কাস'-এর কথা ভেবে খুশী হলেন না, কিন্তু উপায় কি? গণপতি শুধু 'দুর্বাসা'-ই নন, অসাধারণ দৃঢ়সংকল্প, যা ঠিক করে ফেলেছেন তা থেকে টলানো যাবে না তাকে কিছুতেই। দলের দ্বিতীয় হয়ে থাকবেন না অদ্বিতীয় গণপতি; স্বনামধন্য গণপতি স্বনামেই স্বতন্ত্র দল গড়ে তার প্রধানরূপে করবেন একচ্ছত্র আধিপত্য।

এই দল-গড়ার পিছনে আরেকটি প্রেরণারও খানিকটা অংশ ছিল। সেই আগের কথাটা এবারে বলি। বোসের সার্কাসে থাকতে প্রথম দিকে একবার নবদ্বীপে 'পোড়ামাতা'-র মন্দিরের আমন্ত্রণে সেখানে গণপতি এককভাবে তাঁর

যাদুর খেলা দেখিয়েছিলেন। বোসের সার্কাসের কড়া নিয়ম ছিল দলের কোনো মাইনে করা শিল্পী দলের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে খেলা দেখিয়ে উপার্জন করতে পারবে না। কিন্তু দেবীভক্ত যাদুকর দেবী-মন্দিরে যাদু-প্রদর্শনের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেননি; যাদু দেখিয়েছিলেন সার্কাসদলের অধিকারীর আগাম অনুমতি না নিয়েই, এবং বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখে মন্দিরের সবাই নিশ্চিত হয়েছিলেন দেবীর বরে তিনি সত্যিই অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং সেই শক্তির সাহায্যেই তাঁর এইসব অসাধ্যসাধন। যাদু-প্রদর্শনের শেষে মন্দিরের পুরোহিত গণপতিকে ভবিষ্যদ্বাণী শোনান – তিনি দেবী মায়ের আশীর্বাদে স্বাধীনভাবে যাদু-প্রদর্শনের দল গড়ে অসাধারণ খ্যাতি, জনপ্রিয়তা, সম্মান এবং অর্থ অর্জন করতে পারবেন। দেবী-মন্দিরের পুরোহিতের ভবিষ্যদ্বাণী গণপতির কল্পনাপ্রবণ মনে গেঁথে গিয়েছিল। তখনো গণপতি অসামান্য খ্যাতিমান স্বনামধন্য গণপতি হননি।

পূজারী পুরোহিতের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল এবং গণপতি বিশ্বাস করে-ছিলেন তাঁর আশাতীত সাফল্যের মূলে শ্রীশ্রীপোড়ামাতার আশীর্বাদ। তার পর থেকে তিনি সব সময় চিঠিপত্রাদির ওপর সর্বপ্রথমেই লিখতেন "শ্রীশ্রীপোড়া-মাতা ভরসা"।

গণপতির জীবনে একটি অলৌকিক ঘটনার কাহিনী শুনেছি; সে কাহিনীটিও এখানে বলে রাখি। একবার সাহেবগঞ্জে যাদুর খেলা দেখাতে গেছেন তিনি। সেখানে একরাত্রে স্বপ্ন দেখলেন এক দেবীমূর্তি তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে একটি বাড়ির ঠিকানা, বর্ণনা, পথনির্দেশ এবং বাড়ির মালিকের নাম দিয়ে বললেন, "ওরে, আমি এই বাড়িতে এক আলমারির মাথায় এক কোণে অবহেলায় পড়ে আছি। তুই আমাকে সেখান থেকে নিয়ে এসে আমার পুজো করিস।"

আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল গণপতির। রোমাঞ্চিত হলো সারা দেহ। এ স্বপ্ন কি অলীক, না সত্য? অলৌকিক ব্যাপারের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন গণপতি, সাধারণ বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। এ স্বপ্নের সত্যতা যাচাই করতে গেলেন তিনি। স্বপ্নে পাওয়া ঠিকানায় গেলেন, গিয়ে পরম বিস্ময়ে দেখলেন বাড়ির চেহারা, গৃহস্বামীর নাম ইত্যাদি সব মিলে যাচ্ছে। বাড়ির মালিককে বললেন স্বপ্নের কথা। আলমারির মাথায় দেখা গেল সত্যিই একটি দেবী-মূর্তি রয়েছে, হুবহু স্বপ্ন-বর্ণিত চেহারার। বাড়ির মালিক দেবী-মাতার স্বপ্নাদেশের কথা শুনে অভিভূত হলেন, মূর্তিটি দিলেন যাদুকর গণপতিকে। গণপতি দেবী-মূর্তিটিকে নিয়ে এসে তাঁর যথাবিধি নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু আগের কথায় আসা যাক। বোসের সার্কাস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন যাদুকর গণপতি, নিজেই দল করবেন বলে। বোসের সার্কাসের জনকয়েক শিল্পী চলে এলেন তাঁর সঙ্গে, এই দু-তিনজনের মধ্যে ছিলেন মহিলা শিল্পী হিঙ্গনবালা, যাঁর প্রধান খেলা ছিল 'ব্যালান্সিং' বা ভারসাম্যের একটি শক্ত খেলা—একটি বড়ো বলের ওপর দাঁড়িয়ে।

হিঙ্গনবালার এই খেলা বেশ আকর্ষণীয় ছিল, কিন্তু—বলা বোধহয় বাহুল্য—গণপতির অদ্ভুত যাদুর খেলাই ছিল সর্বপ্রথম আকর্ষণ।

তাবু আর দল নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁবু ফেলে খেলা দেখাতে লাগলেন গণপতি। যেখানে যান সেখানেই গণপতির জয়-জয়কার, গণপতির প্রদর্শনীর তাঁবুতে দর্শকে দর্শকারণ্য।

গণপতির যাদু প্রদর্শনীর ছিল দুটি দিক। একটি দিক লৌকিক আমোদ-প্রমোদের, অন্যটি অলৌকিক রহস্যের। গণপতির কতকগুলো খেলা দেখে দর্শকরা বিস্মিত হয়ে তারিফ করতেন তাঁর সুদক্ষ হস্তকৌশলের এবং ধাপ্পা-চাতুর্যের, কিন্তু তাঁর বড়ো খেলা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গণপতির অলৌকিক শক্তিতে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী হতেন।

গণপতির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে অনেকে আসতেন তাঁকে হাত দেখিয়ে ভাগ্য জানতে, গ্রহ-শান্তি করাতে, নানারকম মানসিক, শারীরিক এবং ভূতুড়ে ব্যাধির দাওয়াই নিতে। অনেকেই গণপতির কাছ থেকে পেতেনও বিভিন্ন শক্তির মাদুলি, শেকড়, টোটকা ওষুধ প্রভৃতি। অনেকেই আশ্চর্য উপকারও পেতেন—জানি না তা অলৌকিক শক্তির মাহাত্ম্যে, না দ্রব্যগুণে, না বিশ্বাসের গুণে। যে কারণে বা যেভাবেই হোক, গণপতির দ্বারা অনেকে উপকৃত হয়েছেন একথা সত্য।

হিঙ্গনবালা সেই যে বোসের সার্কাস ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন যাদুকর গণপতির সঙ্গে, তারপর আর কখনো গণপতিকে ছেড়ে যাননি। কিন্তু বোসের সার্কাস ছাড়েননি সেই অসাধারণ বাঙালী মেয়ে সুশীলা, যিনি দুঃসাহসিক বাঘের খেলা দেখাতেন। তাঁর কথা আগেই বলেছি, কিন্তু একটু বলা বাকি রয়েছে।

সার্কাস-দর্শক মহলে গণপতির অলৌকিক বাক্সের খেলার (ইলিউশন বক্স) কাছে সুশীলার দুঃসাহসিক, লোমহর্ষক বাঘের খেলা জনপ্রিয়তায় হেরে গেল, এতে দুঃসাহসিক সুশীলার পক্ষে দুঃখিত হওয়া স্বাভাবিক। তিনি তাই হয়েছিলেন। হয়তো ঈর্ষা হয়েছিল মনে মনে, আর ঈর্ষা থেকে হিংসা। তাই গণপতি

যখন বোসের সার্কাসের মাইনে করা শিল্পী হয়েও নবদ্বীপ পোড়ামাতার মন্দির প্রাঙ্গণে যাদু-প্রদর্শন করেছিলেন সার্কাসের নিয়ম ভঙ্গ করে, তখন এ নিয়ে সার্কাসের শিল্পীমহলে মৃদুগুঞ্জন উঠেছিল ; সে গুঞ্জনে শোনা যায় ব্যাঘ্র-দমন-শিল্পী সুশীলার অংশ ছিল। সে গুঞ্জন গিয়েছিল সার্কাস-মালিক প্রফেসর বোসের কানে এবং যাদুকর গণপতির কানেও। অন্য শিল্পীদের পান থেকে চুন খসানোও অপরাধ, আর গণপতির সাতখুন মাপ, এই ছিল গুঞ্জনের মূল কথা। এ গুঞ্জনে সুশীলারও অংশ আছে সে কথা জেনেছিলেন গণপতি, জেনেও তবু দুর্বাসা মুনির মতো দুর্বাক্য ব্যবহার করেননি, শুধু সার্কাস-মালিককে বলেছিলেন মায়ের মন্দির-প্রাঙ্গণে তিনি মায়ের চরণে যাদু-অঞ্জলি দিয়ে এসেছেন মাত্র. ওটা তাঁর ব্যবসাদারী প্রদর্শন নয় এবং একটি কপর্দকও দর্শনী গ্রহণ করেননি তিনি, কাজেই সার্কাসের কানুন তাতে ভঙ্গ করা হয়নি।

এর পরেই বাঘের খেলা দেখাতে গিয়ে সুশীলা বাঘের থাবায় হঠাৎ আহত হন এবং নিতান্ত সৌভাগ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে যান। ব্যাপারটা হয়তো নিতান্তই আকস্মিক , দৈবাৎ ঘটেছিল। গণপতির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ-গুঞ্জনের সঙ্গে ব্যাপারটার হয়তো কোনো রকম কার্যকারণ সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু শোনা যায় সুশীলার মনে ধারণা হয়েছিল গণপতির প্রতি তিনি অন্যায় করে-ছিলেন, অপ্রত্যাশিত বাঘের থাবার আঘাতে তারই দৈবী ইঙ্গিত।

এরপর গণপতি যখন বোসের সার্কাস ছেড়ে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গিনী হলেন ঐ সার্কাসেরই শিল্পী হিঙ্গনবালা, তখন সুশীলা থেকে গেলেন বোসের সার্কাসেই, বোসের সার্কাসের প্রধান আকর্ষণ হয়ে। তখন কী ভাবের উদয় হয়েছিল ব্যাঘ্র-দময়ন্তী সুশীলার মনে, তা আজ মীমাংসাতীত অনুমানের বিষয় মাত্র। অসামান্য প্রতিদ্বন্দ্বী গণপতির বিদায়ে তিনি কি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন, না বিষণ্ণ ? ঈর্ষাকাতর প্রতিদ্বন্দ্বিনীর চোখে দেখে এতদিন যাঁকে ভেবেছেন পরম অপ্রিয়, বিদায়-বেলায় তাঁকে কি মনে হয়নি পরম প্রিয় যাদুকর বলে, মনে কি হয়নি কবিগুরুর ভাষায় :

"তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন" ?

হয়তো হয়েছিল, হয়তো হয়নি। ঠিক জানিনে, জানবার উপায়ও নেই।

শুধু বড়ো বড়ো শহরেই নয়, ছোটো ছোটো শহরে এবং শহরতলিতে, এমন কি অনেক পল্লী অঞ্চলেও ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়িয়েছেন গণপতি। শুধু যাদু-প্রদর্শনেই নয়, শুনেছি নাট্যাভিনয়ে তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসামান্য।

আমি নিজে অবশ্য শুধু তাঁর যাদুর খেলাই দেখেছি-বহুবার, নাট্যাভিনয় দেখিনি, যদিও যাদু-প্রদর্শনের সময় তিনি যে চমৎকার অভিনয় করতেন, তাতে তিনি যে নাট্যমঞ্চেও চমৎকার অভিনয় করবেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য যাদুকরের কথা মনে পড়ছে: স্যার ওয়ালটার স্কটের দেশের মানুষ জন হেনরি অ্যাণ্ডারসন, "উইজার্ড অভ দি নর্থ" (Wizard of the North) – উত্তর দেশের যাদুকর। স্কটের 'রব রয়' উপন্যাসের কয়েকটি দৃশ্যের নাট্যরূপ তিনি তাঁর যাদু প্রদর্শনের ফাউ বা ভূমিকা হিসেবে মঞ্চস্থ করতেন; তাতে নায়ক রব রয়ের ভূমিকায় তিনি নিজেই অভিনয় করতেন।

কৌতুকপ্রিয়তা এবং চেহারার দিক দিয়ে গণপতির মিল ছিল উনিশ শতকের স্বনামধন্য মার্কিন যাদুকর আলেকজাণ্ডার হারম্যান-এর (Alexander Herrmann) সঙ্গে। দুজনেই লম্বা, ছিপছিপে, সগুম্ফ। দুজনেই যাদু প্রদর্শন-মঞ্চের বাইরেও – দোকানে, বাজারে, বৈঠকে, রেস্তোরাঁয় – ছোটোখাটো অথচ অদ্ভুত বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে মজা করতেন।

যাদুর খেলা দেখিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে গেছেন গণপতি। সারা ভারতের কথা জানি না, বাঙলা দেশে অন্তত শুধু যাদুকে পেশা করে অমন অসামান্য অর্থ-সাফল্য আর কেউ লাভ করতে পারেননি, বর্তমান যুগের যাদুকর পি. সি. সরকার ছাড়া।

যাদুকর গণপতি শেষ জীবনটা সাধন-ভজনেই কাটিয়ে গেছেন। অর্থ-উপার্জন করে কলকাতার উপকণ্ঠে বরানগরে যে সম্পত্তি করেছিলেন তা দেবোত্তরিত দুহাতে তিনি যেমন টাকা রোজগার করেছেন, তেমনি পরের উপকারে দানও করে গেছেন অকাতরে। অনেক শোনা গল্পের একটি গল্প বলি। এক জায়গায় যাদুর খেলা দেখানো শেষ হয়ে গেছে। গণপতির সঙ্গে দেখা করলেন এক দরিদ্র, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ। গণপতির কাছে তাঁর একটি আর্জি আছে, সে আর্জি মঞ্জুর করতেই হবে। হাওয়া থেকে টাকার পর টাকা ধরার বিদ্যেটা শিখিয়ে দিতে হবে তাঁকে, নিদারুণ অর্থাভাব আর সহ্য হয় না, পারানির কড়ির অভাবে মেয়েটার ভালো সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছে।

অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল যাদুকর গণপতির দুটি চোখ। গরিব ব্রাহ্মণকে বললেন "ভাই, সত্যি সত্যি হাওয়া থেকে টাকা ধরার বিদ্যে জানলে কি আর এত লোকজন, লটবহর নিয়ে ঘুরে ঘুরে যাদুর খেলা দেখিয়ে টাকা রোজগার করতে হত আমাকে?"

যুক্তিটা হৃদয়ঙ্গম করে তখন হতাশ হলেন কন্যাদায়গ্রস্ত গরিব ব্রাহ্মণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে হতাশ হতে হয়নি। সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করে ব্রাহ্মণের মেয়েটির ভালো বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন গণপতি।

অসাধারণ জীবন গণপতির, অসাধারণ মৃত্যুর কাহিনী এই রকম শুনেছি। শেষ খাটে শুয়ে পথ দিয়ে চলেছে চিরনিদ্রিত শ্মশানপথের যাত্রী। বাহকদের মুখে "রাম নাম সৎ হ্যায়"। সেই মৃদু ধ্বনি কানে এলো অসুস্থ অর্ধশয়ান যাদুকর গণপতির।

"চলেছ বন্ধু? যাও। আমিও তোমার পিছনে যাচ্ছি।" বললেন তিনি।

সেদিন তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের মন্দিরে অন্নকূট উৎসব। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রসাদ গ্রহণ করছে কত ভক্ত, কত দরিদ্রনারায়ণ। মন্দিরে আরাধ্য দেবতার বিগ্রহকে জড়িয়ে ধরলেন গণপতি। তারপর ধীরে ধীরে ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। সেদিন ২০শে নভেম্বর, ১৯৩৯ খৃস্টাব্দ।

শয়তান ও ম্যাসকেলিন

অনেক দিন আগে একটি ছোটোগল্প আমার বড়ো ভালো লেগেছিল। গল্পটি ছোটো করেই বলি।

সারা শহরে সাড়া পড়ে গেছে, সে সাড়া জাগিয়েছেন একজন যাতুকর। গল্পের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যাতুকরের নাম "এম্‌রে দি গ্রেট।" তাঁর প্রতিটি খেলা এমন নিখুঁত যে যদিও দর্শকদের সবাই জানেন খেলাগুলো সম্পূর্ণ লৌকিক এবং ফাঁকি, তবু সবারই মনে হচ্ছে খেলাগুলো অলৌকিক, এবং খাঁটি যাতু, ফাঁকি নয়, ফাঁকি হতে পারে না।

সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা শহরের সেরা রঙ্গালয়ে যাতুর খেলা দেখিয়ে চলেছেন যাতুকর 'এম্‌রে দি গ্রেট'। প্রতি সন্ধ্যায় হল ভর্তি, একটি আসনও শূন্য থাকে না। অনেকেই একাধিকবার দেখতে আসছেন, এমন আশ্চর্য যাতুশিল্পীর খেলা বহুবার দেখলেও পুরনো হয় না।

একটি বিশেষ সন্ধ্যা। রঙ্গালয়ের মঞ্চে হলভর্তি দর্শকদের বিস্মিত চোখের সামনে যাতু প্রদর্শন করেছেন যাতুকর এম্‌রে। হলশুদ্ধ লোক মন্ত্রমুগ্ধ। সারা হল জুড়ে অলৌকিক যাতুর আবহাওয়া। সকলেরই মনে হচ্ছে এ যাতুকরের অসাধ্য কিছু নেই, যে-কোনো অসম্ভব এঁর পাল্লায় পড়লে সম্ভব হতে বাধ্য হবে।

অন্যান্য সন্ধ্যায় যেসব খেলা দেখান সেগুলো দেখানো হয়ে গেলে, "এম্‌রে দি গ্রেট" বললেন, "এইবার আমি কয়েকটি এমন খেলা দেখাবো যা আপনাদের এর আগে কখনো দেখাইনি।"

দেখালেন। এ খেলাগুলো তাঁর আগেকার খেলাগুলোর চাইতে আরো অনেক বেশি অদ্ভুত, আশ্চর্য, মজাদার। কোনো কোনো খেলার শেষে উচ্ছ্বসিত হাততালিতে হলের দেয়ালগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো; আর কোনো কোনো খেলার শেষে বিস্ময়ের ভার এমন প্রচণ্ড হয়ে চেপে বসল সবার মনে যে কারও হাত তালি দিতে উঠলো না, প্রতি জোড়া হাত মহাবিস্ময়ে অবশ।

এক ভদ্রলোকের মাথার টুপি ধার করে নিয়ে টুপিটি খালি দেখিয়ে যাতুকর এম্‌রে তার ভেতর থেকে পর পর ক্রমাগত বার করতে লাগলেন জিনিসের পর জিনিস—রুমাল, ফুল, নিশান, পুতুল, পাখিশুদ্ধ পাখির খাঁচা, খরগোস, ছাতা,

টেবিল-ঘড়ি, লাঠি, চীনা লণ্ঠন, গ্যাসভরা রবারের বেলুন, ভ্যানিটি ব্যাগ, বোতল, বল, আরো অনেক কিছু। খেলার শুরুতে যে মঞ্চ ছিল ফাঁকা, খেলার শেষে সে মঞ্চ ভরে গেল এইসব জিনিসে। আশ্চর্য ব্যাপার! এ সম্ভব হলো কি করে? হাততালিতে হল ভরে উঠলো। টুপিটিকে আবার খালি দেখিয়ে টেবিলের ওপর চিৎ করে রেখে দিলেন "এম্‌রে দি গ্রেট", তারপর দর্শকদের সমবেত হাততালির অভিনন্দনকে অভিবাদন জানালেন সামনের দিকে ঝুঁকে।

হাততালি থেমে গেলে নানাদিক থেকে মন্তব্য শোনা গেল : আশ্চর্য! অদ্ভুত! অভূতপূর্ব। অতুলনীয়! ইত্যাদি। হঠাৎ হলশুদ্ধ সবাইকে চমকে দিয়ে তৃতীয় সারির একজন দর্শক অদ্ভুত রকমের অট্টহাসি হেসে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সবার দৃষ্টি এবং মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠলেন তিনি। লোকটির পরনে কালো পোশাক, দেহ ছিপছিপে লম্বা, চোখা চেহারা, ছুঁচোলো গোঁফ, সরু ছুঁচোলো মিশকালো দাড়ি। অদ্ভুত এই ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "আমি একবার স্টেজে আসতে পারি কি?" প্রশ্নটির লক্ষ্য মঞ্চের ওপর দাঁড়ানো যাদুকর "এম্‌রে দি গ্রেট"।

এম্‌রে অভিজ্ঞ, পাকাপোক্ত যাদুকর, যাকে বলা যায় দস্তুরমতো ঝানু। বহুবার বহু চালাক তাঁকে জব্দ করতে গিয়ে নিজেরাই উলটো জব্দ হয়ে গেছেন। জব্দ করবার কায়দায় সিদ্ধহস্ত, সিদ্ধমুখ, সিদ্ধমগজ "এম্‌রে দি গ্রেট", তবু যেন একটু দ্বিধার সুর ধ্বনিত হলো তাঁর কণ্ঠে, যখন তিনি বললেন, "আসুন।"

রহস্যময় লম্বা লোকটি দৃঢ় পদক্ষেপে মঞ্চে উঠে গিয়ে যাদুকর এম্‌রে-র পাশে দাঁড়ালেন দর্শকদের মুখোমুখি। বললেন : "বন্ধুগণ, আপনাদের এই প্রিয় যাদুকর এতক্ষণ আপনাদের এক ধরনের যাদু দেখালেন। আপনারা অনুমতি করলে আমি আরেক ধরনের যাদু দেখাবো, যেমনটি আপনারা কখনো দেখেননি।"

লোকটির চেহারা, সাজপোশাক, কথাবার্তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, চুম্বকের মতো টানে, কিন্তু মনে স্বস্তি আনে না। তবু কৌতূহলের দাবি আরো জোরালো হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সুতরাং অনুমতি মিললো। যাদুকর এম্‌রেও মাথা নাড়লেন এমন দোমনা ভাবে যে তার মানে হাঁ-ও হতে পারে, 'না' হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। দর্শকদের অনুমতি পেলেন ভদ্রলোক। রহস্যময় ভদ্রলোক। এ ভদ্রলোককে কেউ চিনতে পারলেন না। খুব সম্ভব তিনি এ শহরের বাইরে থেকে এসেছেন। সুতরাং গল্প বলার সুবিধার জন্য তাঁকে বলা যাক 'আগন্তুক'।

আগন্তুক বললেন, "যাদুকর এম্‌রে দেখালেন শূন্য টুপির ভেতর থেকে এই

জিনিসগুলোর আবির্ভাব। এবার আমি দেখাবো একটি একটি করে এই সবগুলো জিনিসেরই এই শূন্য টুপির ভেতরে তিরোভাব।"

বাঁ হাতে টুপিটা তুলে নিয়ে ডান হাতে একটির পর একটি জিনিস নিয়ে টুপির ভেতর অদৃশ্য করে দিতে লাগলেন তিনি। রুমাল, ফুল, নিশান, পুতুল, পাখিশুদ্ধ খাঁচা, খরগোস, ছাতা, টেবিল-ঘড়ি, লাঠি, চীনা লণ্ঠন, গ্যাসভরা রবারের বেলুন, ভ্যানিটি ব্যাগ, বোতল, বল, আরো অনেক কিছু। গোটা স্টেজ ভর্তি ছিল এই সব জিনিসে সুসজ্জিত হয়ে; আগন্তুক যাদুকরের যাদুতে দু'মিনিটে খালি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক টুপিটা ছুঁড়ে দিলেন টুপির মালিকের হাতে। মালিক লুফে নিলেন টুপি। নিয়ে দেখেন কি আশ্চর্য! টুপির ভেতরটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। এতগুলো জিনিস তবে কোথায় গেল?

হলশুদ্ধ সবাই স্তম্ভিত। এত বেশি অভিভূত সবাই, যে হাততালি দেবার ক্ষমতা নেই কারও। যাদুকর "এম্‌রে দি গ্রেট"-ও স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, মুখে কথা সরছে না তাঁর। কি কৌশলে এ খেলা দেখানো সম্ভব হতে পারে, কিছুতেই বুঝতে পারছেন না তিনি।

মুচকি হাসলেন আগন্তুক যাদুকর। দর্শকদের লক্ষ্য করে বললেন, "আপনাদের ভেতর আরেকজন ভদ্রলোক আমাকে টুপি ধার দেবেন কি?"

দিলেন এক ভদ্রলোক। নিতান্তই নিরীহ ভদ্রলোক টুপি, কোনোরকম চালাকি নেই তার ভেতর। আগন্তুক যাদুকর দর্শকদের ভেতর ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দর্শকের ফরমায়েশ মতো যে-কোনো জিনিস সঙ্গে সঙ্গে বার করে তাঁদের হাতে দিতে লাগলেন সেই শূন্য টুপি থেকে। যিনি যা চাইছেন, হুকুম করবার সঙ্গে সঙ্গেই টুপির ভেতর হাত ঢুকিয়ে বার করে তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছেন আগন্তুক যাদুকর—চকোলেটের টিন, টেনিস বল, মাউথ অর্গ্যান, চিরুনি, বই, সাবানের বাকস, পরচুলা, খাঁচা, হাতুড়ি, বিউগল্‌, তাসের প্যাকেট, দোয়াত, আপেল, আঙুরের গোছা, পাউরুটি, আরো অনেককিছু। আশ্চর্য! আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ আছে নাকি এই রহস্যময় ব্যক্তিটির কাছে? নইলে ধার-করা খালি টুপি থেকে ফরমায়েশ মতো যে-কোনো জিনিস বেরিয়ে আসে কি করে?

এইবারে মঞ্চে ফিরবার পালা, 'রিটার্ন জার্নি'। এই ফেরৎ যাত্রার পথে ঐ জিনিসগুলি একটি একটি করে ফেরৎ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে টুপিটির ভেতরে ফেলে দিতে লাগলেন আগন্তুক যাদুকর—পাউরুটি, আঙুরের গুচ্ছ, চকোলেটের টিন, বই, সাবানের বাক্‌স ইত্যাদি সব কিছু। তারপর যাঁর টুপি তাঁর মাথায় টুপিটি

চাপিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন মঞ্চের ওপর। কিন্তু জলজ্যান্ত এতগুলো জিনিস যে সকলের চোখের সামনে ঐ টুপির ভেতর ঢোকালেন, সেগুলো গেল কোথায়? এ যে আজগুবি ভুতুড়ে ব্যাপার!

আগন্তুক যাদুকর তারপর বললেন, "বন্ধুগণ! সবার শেষে আপনাদের যে খেলাটি দেখাবো সে খেলাটির নায়িকা নির্বাচনের ভার আপনাদের ওপর। আমি আমার যাদুকর বন্ধুর এই টেবিলটি মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ধার নিচ্ছি।" বলে মঞ্চের ওপর তিন পায়ার যে ছোট্টো গোল টেবিলটি দাঁড়িয়েছিল, তাকে হাতের ইশারা করতেই সেটি নিজে থেকেই সরে এসে মঞ্চের সামনের দিকে এসে দাঁড়ালো। যেন কয়েকজন অদৃশ্য ভূত তাকে টেনে নিয়ে এলো। স্তম্ভিত করাই যাঁর পেশা এবং নেশা, সেই যাদুকর "এম্‌রে দি গ্রেট" স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন বিস্মিত তিনি কখনো হননি, হবেন বলে আশাও করেননি। তিনি মঞ্চের এক ধারে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন যেন আগন্তুক যাদুকর তাঁকে সম্মোহিত করে আদেশ করেছেন "আপনি চুপ করে ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকুন।" যাদুকর "এম্‌রে দি গ্রেট"-এর সহকারীরাও মঞ্চের দুধারের দুই নেপথ্যে বিস্ময়ে আত্মহারা। আড়াল থেকেই তারা দেখছে এই রহস্যময় আগন্তুকের অলৌকিক কাণ্ড। তারা জানে যাদুকর "এম্‌রে"-র সবগুলো খেলার গুপ্ত কৌশল, তাই তাঁর কোনো রহস্য তাদের কাছে রহস্য নয়। কিন্তু এই অদ্ভুত লোকটির অদ্ভুত কাণ্ড-গুলোর কোনো ব্যাখ্যার নাগাল পেলো না তাদের সকলের সমবেত বুদ্ধি।

ডান হাত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খালি দেখিয়ে শূন্য থেকে একটি শাদা রুমাল ধরে নিলেন আগন্তুক যাদুকর। রুমালটি হাওয়ায় দোলাতে দোলাতে এক বেশ বড়ো টেবিল-ক্লথে পরিণত করে তাই দিয়ে গোল টেবিলটা ঢেকে দিলেন তিনি। স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন দর্শকবৃন্দ।

"এবার আপনাদের পছন্দমতো একজন সেরা সুন্দরীকে আমি এই টেবিলের ওপর নিয়ে আসবো।" বললেন আগন্তুক যাদুকর। "বলুন কাকে দেখতে চান আপনারা? সালোমি? হেলেন? ক্লিওপ্যাট্রা?

"ক্লিওপ্যাট্রা।" উচ্চকণ্ঠে বললেন একজন। "ক্লিওপ্যাট্রা। ক্লিওপ্যাট্রা" প্রতিধ্বনি হলো বহু কণ্ঠে।

"ক্লিওপ্যাট্রা!" গভীর এবং গম্ভীর রহস্যময় কণ্ঠে বললেন আগন্তুক যাদুকর। "বেশ, তাহলে লক্ষ্য রাখুন এই টেবিলের ওপর। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে। মন বিক্ষিপ্ত করবেন না অন্য কোনোদিকে। আপনাদের মনঃসংযোগের সুবিধার

জন্য আমি শুধু এই টেবিলের ওপর আলো রেখে বাকি সমস্ত আলো নিবিয়ে দিচ্ছি।”

সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল হলের অন্য সমস্ত আলো, শুধু মঞ্চের দুধারের ওপর দিক থেকে উজ্জ্বল আলো এসে পড়লো গোল হয়ে টেবিলের চারধারে। “ক্লিওপ্যাট্রা! ক্লিওপ্যাট্রা! ক্লিওপ্যাট্রা!” রহস্য-গভীর কণ্ঠে যেন তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন রহস্যময় আগন্তুক। সারা হল জুড়ে দমবন্ধ করা স্তব্ধতা, একটা আলপিন পড়লেও তার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটি চোখ তাকিয়ে আছে মঞ্চে দাঁড়ানো ঐ টেবিলটির ওপর।

সহসা ও কি? টেবিলক্লথের মাঝখানটা আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে উঠছে কি করে? কাপড়ের তলায় অদ্ভুতভাবে একটা গোল জিনিসের আবির্ভাব ঘটেছে, সেটাই টেবিলক্লথটিকে ঠেলে নিয়ে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে একজন মানুষের সমান উঁচুতে উঠে গেল, টেবিলক্লথের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটি আস্ত মানুষ। সেই মানুষটি ধীরে ধীরে খসিয়ে পায়ের তলায় টেবিলের ওপর ফেলে দিল টেবিলক্লথটি। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে অবর্ণনীয়া রূপসী মোহিনী নারী মূর্তি। দু'চোখে বিদ্যুতের চমক, অধরের কোণে মায়াবিনীর হাসি। প্রাচীন মিশরীয় বেশ পরিহিতা স্বল্পবসনা এবং স্বচ্ছবসনা সুন্দরী।

“ক্লিওপ্যাট্রা!” গম্ভীরকণ্ঠে যেন রহস্যময়ীর পরিচয় দিলেন রহস্যময় আগন্তুক। যাদুমন্ত্রে আবির্ভূতা হয়েছে ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া মোহময়ী ক্লিওপ্যাট্রা, যে ক্লিওপ্যাট্রার মোহিনীমন্ত্রে অভিভূত হয়েছিলেন জুলিয়াস সীজার আর মার্ক অ্যান্টনি!

নারীর রূপ এমন অপরূপ হতে পারে? বুকের রক্তে দোলা দিতে পারে এমন করে? এমন অস্থির চঞ্চল করে তুলতে পারে মনকে?

কি যেন বললো ক্লিওপ্যাট্রা মৃদু মধুরকণ্ঠে। প্রাচীন মিশরী ভাষা বোধহয়, তাই ভালো বোঝা গেল না, কিন্তু সবার কানে যেন মধু ঝরালো ঐ মায়াবিনী সৌন্দর্য-সাম্রাজ্ঞীর মাদকতাময় কণ্ঠস্বর।

ধীরে ধীরে নত হয়ে টেবিল-ক্লথটা তুলে নিয়ে তাই দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলল ক্লিওপ্যাট্রা। আফশোষে ভরে উঠলো হলশুদ্ধ সবার মন।

জলে উঠলো আবার একসঙ্গে হলের সবগুলো আলো। টেবিলের ওপর ক্লিওপ্যাট্রা দাঁড়িয়ে আছে টেবিল-ক্লথের তলায় আত্মগোপন ক'রে! কিন্তু কে তাকে বলেছিল আড়ালে নিজেকে গোপন করতে?

ক্লিওপ্যাট্রা-দর্শন-মশগুল সবাই, আগন্তুকের দিকে নজর রাখেননি কেউ।

আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলে সবাই দেখতে পেতেন আগন্তুক যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে নেই ; শুধু সেখানে কেন, কোথাও তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। সবাই তাকিয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে ঐ টেবিলের ওপর টেবিল-ক্লথে ঢাকা ক্লিওপ্যাট্রার দিকে। হলশুদ্ধ সবাই চাইছেন খসে পড়ুক টেবিল-ক্লথের আবরণ। আবার দেখা দিক মোহময়ী সৌন্দর্য-সাম্রাজ্ঞী ক্লিওপ্যাট্রা। খসে পড়ল টেবিল-ক্লথের আবরণ। কিন্তু কোথায় ক্লিওপ্যাট্রা ? দেখা গেল তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন সেই রহস্যময় আগন্তুক যাদুকর !

এত বিস্ময় আর এত বেদনা উপস্থিত দর্শকদের ভেতর কেউ আর কখনো এক সঙ্গে অনুভব করেননি। তাছাড়া এবার ঐ আগন্তুক যাদুকরের মুখের হাসির দিকে তাকিয়ে তাঁরা যেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এ লোকটি এতক্ষণ যা দেখালেন তা কোনোরকম স্বাভাবিক বা লৌকিক উপায়ে ঘটানো সম্ভব নয়, এর পিছনে অলৌকিক রহস্য কিছু নিশ্চয় রয়েছে। কী সে রহস্য ? কী সে শক্তি ?

"আজ রাতের মতো এখানেই খেলা শেষ হলো।" বললেন আগন্তুক যাদুকর। মঞ্চের সামনে পড়ে গেল সেই রাত্রের মতো শেষ যবনিকা। চিন্তা করতে করতে ফিরে গেলেন দর্শকবৃন্দ।

যবনিকার ওপাশে মঞ্চের ওপর এই রহস্যময় আগন্তুকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাদুকর 'এম্‌রে দি গ্রেট' বললেন "কি করে আপনি এ সব অদ্ভুত কাণ্ড করলেন ? এ তো লৌকিক যাদুবিদ্যা নয়।"

"কিন্তু যে-কোনো লোককে আমি আমার এই আশ্চর্য বিদ্যায় পাকা বানিয়ে দিতে পারি। আমি আজ যা-কিছু ক'রে দেখালাম সে সব ছাড়াও আরও অনেক বিস্ময়কর কাণ্ড তুমি করে দেখাতে পারবে। যাদু-জগতে তোমার জুড়ি থাকবে না, যদি তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করো। তোমার যাদুর খ্যাতি দেখে শুনে তোমাকে শিষ্য বানাবার জন্যেই এসেছি।"

যাদুকর এম্‌রে বললেন, "আমাকে শিষ্য বানাবার জন্য আপনার এত আগ্রহ ?"

আগন্তুক বললেন, "হ্যাঁ। শিষ্য বানাবার আগ্রহ আমার অসীম।"

"কিন্তু" বললেন যাদুকর 'এম্‌রে দি গ্রেট', "আপনি আজ যে খেলাগুলো দেখালেন, মানুষী বিদ্যায় সেগুলো সম্ভব নয়। মনে হয় এ শয়তানী বিদ্যা ; স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে !"

আগন্তুক মৃদু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, "যুবক, তুমি সত্যের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছো। আরেকটু হলেই পুরোপুরি পৌঁছে যেতে।"

"তার মানে?"

"আমি স্বয়ং শয়তান।"

এই হলো গল্পটির চুম্বক। শুক্‌নো সংক্ষেপ করতে গিয়ে স্বভাবতই গল্পের অধিকাংশ রস নিংড়ে ফেলে দিতে হয়েছে, তবু এই কংকাল থেকেও হয়তো রক্ত-মাংসযুক্ত পুরো গল্পটির উৎকৃষ্টতার খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে।

গল্পটি চমৎকার, কিন্তু কল্পনা থেকে বানানো। এ গল্পের 'আগন্তুক' যাদুকরের অলৌকিক খেলা দেখে দর্শকদের ভেতর সন্দেহ জেগেছিল স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। এই সন্দেহের ফলেও পরিস্থিতিটা যাদুকরের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু ইংরেজি ভাষায় একটা প্রবাদ আছে "Truth is stranger than fiction" অর্থাৎ সত্য ঘটনা কাল্পনিক ঘটনার চাইতে বেশি অদ্ভুত হয়। অদ্ভুত বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখিয়ে একবার কুসংস্কারগ্রস্ত, শয়তান-ভীত ক্ষিপ্ত জনতার হাতে একজন যাদুকরের প্রাণ-সংশয় ঘটেছিল ইংলণ্ডে, ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে, লণ্ডনের কিছু দূরে একটি মফস্বল শহরে— অথবা আধা-শহর আধা-গ্রামে। তিনি ইংলণ্ডের তথা বিশ্বের যাদু-চর্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়— জন নেভিল ম্যাসকেলিন (John Nevil Maskelyne)।

১৮৬৭ খৃস্টাব্দ। লণ্ডনের অল্প দূরে একটি ছোট শহর। সেই শহরের একটি রঙ্গালয়ে এক সপ্তাহব্যাপী যাদু-প্রদর্শনী চলবে, প্রচার-পত্রে ঘোষণা করা হয়েছে। যাদু প্রদর্শন করবেন যাদুকর জন নেভিল ম্যাস্‌কেলিন (John Nevil Maskelyne) এবং জর্জ কুক (George Cooke)। শিগ্‌গিরই লণ্ডন শহরের ক্রুস্টাল প্যালেস (Crystal Palace) রঙ্গালয়ে এঁদের কয়েক সপ্তাহব্যাপী যাদু প্রদর্শনের চুক্তি হয়েছে, তার আগে মফস্বল শহরে এক সপ্তাহের জন্য এই প্রদর্শনী।

প্রদর্শনী শুরু হলো সোমবার থেকে। ম্যাস্‌কেলিন এবং কুক, দুজনেই দক্ষ যাদুকর। দুজনের ভেতর চেহারা, ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত-বুদ্ধি, যান্ত্রিক দক্ষতা, উদ্যম প্রভৃতির দিক দিয়ে ম্যাস্‌কেলিনই শ্রেষ্ঠতর এবং ইংলণ্ডের তথা পৃথিবীর যাদু-চর্চার ইতিহাসে তাঁর অবদান অসামান্য। খ্যাতিও তাই।

অদ্ভুত বিস্ময়কর তাঁদের যাদুর খেলাগুলো সারা শহরে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। আশাতীত সাফল্যে অসামান্য খুশী হলেন দুজন যুবক যাদুকর, দুজনেরই বয়স তখনো ত্রিশ পেরোয়নি। খুশী হওয়াই অবশ্য স্বাভাবিক. কিন্তু তাঁদের যাদু প্রদর্শন এত ভালো বলেই যে কী ভীষণ বিপদের মুখে তাঁদের পড়তে হবে এবং

কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে, তা জানতে পারলে বোধ হয় এতটা খুশী তাঁরা হতেন না। সেই ভীষণ বিপদের কাহিনীই বলব।

কিন্তু তার আগে আগেকার কথা একটু বলে নেওয়া দরকার। যাকে বলে গোড়ার কথা। অথবা কবিগুরুর ভাষায় – দীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানো। জন নেভিল ম্যাস্‌কেলিন (১৮৩৯-১৯১৭) তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন চেলটেনহ্যাম (Cheltenham) শহরে এক ঘড়ি-নির্মাতার দোকানে শিক্ষানবিশ রূপে। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং কারিগরী দক্ষতা কাজে লাগিয়ে পরবত জীবনে যাদুজগতে তিনি অসামান্য বিস্ময় সৃষ্টি করে গেছেন, এইখানেই তার সূত্রপাত। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ফরাসী যাদু-সম্রাট রবেয়ার উদ্যাঁ (Robert Houdin) – যাঁকে বলা হয়ে থাকে বর্তমান বা আধুনিক যাদু-বিদ্যার জনক (Father of Modern Magic) – তাঁর প্রথম জীবনে ঘড়ির কাজই শিখেছিলেন এবং কয়েকটি বিস্ময়কর যোগাযোগের ফলে যাদু বিদ্যায় আকৃষ্ট না হলে হয়তো ঘড়ি-নির্মাণের ব্যবসাতেই তিনি জীবন কাটাতেন।

বলছিলাম জন নেভিল ম্যাসকেলিনের কথা। ঘড়ি-নির্মাতার দোকানে শিক্ষানবিশি করছেন, এমনি সময় একদিন ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে আনমনে চলেছেন চেলটেনহ্যাম শহরের এক ফুটপাথ ধরে। যে রাস্তার ধার দিয়ে তিনি চলেছেন, আরেকটি রাস্তা এসে পড়েছে সেই রাস্তায়। সেই আরেক রাস্তার ফুটপাথের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছেন আরেকটি যুবক জর্জ কুক (George Cooke)। তিনিও ভাবুক মানুষ, আসছিলেন খানিকটা আনমনা ভাবেই। দুই আনমনা তরুণ ভাবুক – ম্যাস্‌কেলিন আর কুক – আসছেন দুই দিক থেকে, কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না। কোনাকুনি এসে পারস্পরিক ধাক্কা খেলেন দুজনে। দুজনেই অপ্রস্তুত, দুজনেই দুঃখিত, দুজনেই দুজনের কাছে মাপ চাইলেন, তারপর দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর করমর্দন, পরিচয়, আলাপ, ভাব। কথাপ্রসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল, দুজনেরই যাদুবিদ্যায় একটু-আধটু উৎসাহ আছে। একই বিষয়ে দুজনেরই শৌখিন উৎসাহ ; এরই মাধ্যমে বন্ধুত্ব গভীর হয়ে উঠল দুজনের। দুজনেই ঠিক করলেন যাদুবিদ্যাটা একটু ভালো করে শিখলে মন্দ কি ! শখ যখন আছে, সে শখ ভালো করেই মেটানো যাক। এইভাবে শুরু হলো পৃথিবীর যাদুচর্চার ইতিহাসে বিখ্যাততম বন্ধুত্ব।

দুই বন্ধুতে মিলে শুরু করলেন একটি শৌখিন যাদু সমিতি, এর ভেতর জুটিয়ে

নিলেন আরো কয়েকটি তরুণ বন্ধুকে। এঁদের বৈঠক বসতে লাগল মাঝে মাঝে, এক-একবার এক-একজন সভ্যের বাড়িতে। বৈঠকে সভ্যদের যাদু প্রদর্শন, যাদু-সম্পর্কিত গ্রন্থ পাঠ, আলোচনা ইত্যাদি হতো। আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিলো যান্ত্রিক কৌশলে কি ভাবে নানারকম যাদুর বিস্ময় সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই দিকে জন নেভিলেরই মাথা খেলত ভালো, কারণ ঘড়ির কাজে নানারকম যন্ত্রপাতি নিয়ে তাঁকে নাড়াচাড়া করতে হতো। ঘড়ির নির্মাণ সংক্রান্ত কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে যাদুসংক্রান্ত নানারকম যান্ত্রিক গবেষণা করে যেতে লাগলেন জন নেভিল ম্যাসকেলিন।

একদিন একটি ব্যাপার ঘটলো, যাতে জন নেভিলের মনের ভেতর একটুখানি খটকা লাগল। তিনি যে ঘড়ির দোকানে শিক্ষানবিশি করতেন, সেই দোকানে একদিন এলেন একজন অদ্ভুত চেহারার লম্বা চুল আর অল্প দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক। জন নেভিলের হাতে একটি অদ্ভুত রকমের যন্ত্র দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন এর ভেতরে একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে, তার জায়গায় নতুন স্প্রিং বসিয়ে দিতে হবে। কিন্তু অদ্ভুত যন্ত্রটি কি কাজে দরকার হয় সে প্রশ্নের কোনো জবাব তিনি দিলেন না, প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলেন। দু-একদিন বাদে যন্ত্রটি মেরামত হয়ে গেলে পর সেটি নিয়ে সেই ভদ্রলোক জন নেভিলের হাতে দশ শিলিং দিলেন। মজুরি বাবদ দু শিলিং রেখে জন নেভিল বাকি আট শিলিং ভদ্রলোককে ফেরৎ দিতে যাচ্ছেন, তখন তিনি চুপি চুপি বললেন "ও আর আমাকে ফেরৎ দিতে হবে না। তোমাকে উপহার দিলাম। তার বিনিময়ে—আমি যে এসেছিলাম, একথাটা ভুলে যাও।"

জন নেভিল ভাবলেন লোকটি সিঁদেল চোর-টোর হবে, যে যন্ত্রটি মেরামত করিয়ে নিয়ে গেল সেটি হয়তো বা সিঁদ কাটতেই দরকার হয়। এ লোকের কাছ থেকে ঘুষ খাওয়া ঠিক হবে না। সুতরাং উপহার তিনি নিলেন না, ফিরিয়ে দিলেন।

দুদিন বাদে চেলটেনহ্যামের সেই তরুণ যাদুকরের বৈঠকে—যার কথা আগেই বলেছি—একজন সভ্য বললেন দু'জন মার্কিন 'স্পিরিচুয়ালিস্ট' (spiritualist) বা ভৌতিক যাদুকরের কথা। চেলটেনহ্যাম থেকে অনেক দূরে এক শহরে তাঁরা অতি অদ্ভুত ধরনের যাদু প্রদর্শন করছেন। দাড়িওয়ালা 'মিডিয়াম' ভদ্রলোক যে সব প্রশ্ন করছেন, অদৃশ্য ভুতুড়ে হাত রহস্যজনকভাবে টেবিলের ওপর টোকা মেরে আওয়াজ করে করে সেই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

দাড়িওয়ালা মিডিয়াম! টেবিলের ওপর টোকা! সঙ্গে সঙ্গে জন নেভিলের মনে পড়ে গেল সেই অদ্ভুত চেহারার দাড়িওয়ালা লোকটির কথা, আর সেই রহস্যময় যন্ত্রটির কথা, যার ভাঙা স্প্রিংটি তিনি সারিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝে নিলেন ঐ যন্ত্রটিই টেবিলে টোকা দেবার 'অটোম্যাটিক' (automatic) বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। দর্শকরা এটিকে দেখতে পান না, কিন্তু যে কেউ টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে এটিকে কার্যকরী করতে পারেন।

সেই রাত্রের বৈঠকেই সেই যাদু-চক্রের সভ্যেরা, বিশেষ করে জন নেভিল ম্যাস-কেলিন, শপথ করলেন এই ধরনের যন্ত্রাদি বা অন্য কৌশলের সাহায্য নিয়ে পরলোক থেকে আত্মা আনাবার ভান করে যে সব ভুয়ো মিডিয়াম বিশ্বাসপ্রবণ লোকদের ঠকায়, তাদের বুজরুকির রহস্য ভেদ করে সাধারণের সামনে তাদের মুখোস খুলে দিতে হবে।

কিন্তু উক্ত মার্কিন মুলুক থেকে আসা ভৌতিক যাদুকর যেখানে তাঁদের ভৌতিক যাদু-প্রদর্শন করছিলেন, সে জায়গা অনেক দূরে; এই তরুণ যাদু-উৎসাহীরা অতদূর যাবার ফুরসৎ বা সুযোগ পেলেন না। এ ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহও ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়লো। যাই হোক, এঁরা ঠিক করলেন যাদুচর্চা তো অনেক হলো, এবারে কয়েকটি শৌখিন যাদু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে চেলটেন-হ্যামবাসীদের তাক লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? যথা চিন্তা, তথা কাজ। ম্যাস-কেলিন-কুক বন্ধুদ্বয় এবং তাঁদের সহকারীরা যাদুকুশলী হিসেবে শহরে বেশ একটু নামই কিনলেন; শহুরেদের মনে জোর বিশ্বাস জন্মালো—এ ছোকরারা অনেক কিছু জানে, এদের কাছে কোনোরকম বুজরুকি চলবে না।

তারপর একদিন···

চেলটেনহ্যাম শহরে ঘোষণা প্রচারিত হলো বিখ্যাত ড্যাভেনপোর্ট (Daven-port) ভ্রাতৃদ্বয়ের আসন্ন আগমন-বার্তা। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় বহু নরনারীকে বিস্মিত করে এবার আসছেন চেলটেনহ্যামে। চেলটেনহ্যামের একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি তখন ম্যাসকেলিন আর কুককে এসে বললেন, "তোমাদের হাতে নির্ভর করছে এ শহরের মান-মর্যাদা। দেখো, ওরা স্রেফ বুজরুকি দেখিয়ে যেন আমাদের বোকা বানিয়ে চলে যেতে না পারে। তোমরা অনেক বুজরুকি-জানা যাদু-বিশারদের দল, ভালো করে নজর রেখো—ওরা যে ভূত আনিয়ে নানারকম অসম্ভবকে সম্ভব করে, সে কি সত্যি সত্যি ভুতুড়ে ব্যাপার, না ভেলকিবাজি, সেইটে ধরবার দায়িত্ব তোমাদের।"

এবার এই ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা একটু বলি। এঁদের নাম আইরা ইরাস্টাস ড্যাভেনপোর্ট (Ira Erastus Davenport) এবং উইলিয়াম হেনরি ড্যাভেনপোর্ট। এঁদের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো (Buffalo) শহরে, যথাক্রমে ১৮৩৯ এবং ১৮৪১ খৃস্টাব্দে। ঊনবিংশ শতাব্দীর যাদু-জগতে এদের মতো নাটকীয় অভিনয় আর কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে জানা যায়নি। অল্প বয়সেই ভৌতিক মিডিয়াম রূপে এঁরা খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে জন কোল্স (John Cole,) নামে একজন প্রেততাত্ত্বিক এই দু-ভাইকে নিউ-ইয়র্ক শহরে নিয়ে আসেন। নিউইয়র্কে কয়েকটি ভৌতিক-চক্র-বৈঠকে এঁরা বেশ একটু ভীতিপূর্ণ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। চক্রে যারা যোগ দিতেন, তাদের সাধারণ সাধারণই ধারণা হত— এই দুটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভ্রাতার আবাহনে বাতি নেবানো অন্ধকারে ভূতেরা এসে গীটার, ব্যাঞ্জো প্রভৃতি বাজনা বাজায় এবং আরো নানারকম অদ্ভুত ব্যাপার করে যায়। ডাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়কে এই বৈঠকে দুপাশে এমন ভাবে বেঁধে রাখা হত যে, তাদের দ্বারা এসব ব্যাপার সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বলেই সবার মনে হত, কারণ বাতি জ্বালতেই দেখা যেত ওরা দুজন যেমন বাঁধা ছিলেন ঠিক তেমনি বাঁধা রয়েছেন।

কিছুদিন বাদে এঁদের সেয়াঁস (Seance) বা চক্র-বৈঠকে অনুষ্ঠিত ভূতুড়ে কাণ্ডগুলির বৈচিত্র্য আরো বেড়ে গেল, ডাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়ই বাড়ালেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার বহুস্থানে বেশ সাফল্যপূর্ণ সফরের পর দু-ভাই ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে এলেন ইংলণ্ড জয় করতে, তাদের ম্যানেজাররূপে এলেন উইলিয়াম ফে (William Fay) এবং বক্তারূপে ডাঃ জে. বি. ফারগুসন নামে একজন ধর্মযাজক। ইংলণ্ডে তাঁদের প্রথম ভৌতিক চক্র বৈঠক বসল ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে। সেই বৈঠকের অন্ধকারে ভূতেরা এসে যে সব অদ্ভুত কাণ্ড করে গেল, তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হল পরদিন খবরের কাগজে। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন ভূত-বিশারদ ভ্রাতৃদ্বয়। বৈঠকের পর বৈঠক চলতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খ্যাতি আর অর্থ দুইই এক সঙ্গে পেতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা এলেন চেলটেনহ্যাম শহরে। এখানকার টাউন-হলে তাঁদের ভৌতিক যাদু-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল।

জন নেভিল ম্যাসকেলিন তখন ছাব্বিশ বছর বয়স্ক যুবক যাদুকর। একজন যাদুকর আরেকজন যাদুকরের যাদু-খেলার গুপ্ত কৌশল সাধারণের কাছে ফাঁস করে দেবেন না, যাদুকর সমাজের এই হচ্ছে সাধারণ নীতি। এ নীতি জন

নেভিলও মানতেন। কিন্তু এ নীতি ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না, কারণ এঁরা দাবি করতেন এঁরা যাদুকর নন, খাঁটি ভৌতিক মিডিয়াম, এবং এঁদের বৈঠকে যে সব অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটে, সেগুলো ভূতেরা অর্থাৎ পরলোকগত আত্মারাই এসে করে যায়। দু-ভাই যে শহরেই যেতেন সেখানেই শহরবাসীদের বলতেন,—আপনাদেরই বাছাই-করা বিচক্ষণ লোক নিয়ে একটি কমিটি গড়ুন, যে কমিটির কাজ হবে খুব কাছাকাছি থেকে হুশিয়ার হয়ে আমাদের ওপর নজর রাখা, যেন আমরা কোনোরকম চালাকির সাহায্য গ্রহণ না করি।"

উত্তেজিত উৎসুক দর্শকে ভরে গেছে টাউন-হলের ভেতরটা। একটি আসনও খালি নেই। বন্ধ হয়ে গেল হলের দরজাগুলো, জানলায় জানলায় টেনে দেওয়া হল পর্দা, যেন খোলা জানালা দিয়ে বাইরের আলো ভেতরে না আসে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ডাঃ ফারগুসন ঘোষণা করলেন—লোকান্তরিত আত্মারা আলো সইতে পারে না, তাই তাদের আবাহনের জন্য অন্ধকারের প্রয়োজন। তিনি আরো ঘোষণা করলেন ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়—আইরা ইরাসটাস এবং উইলিয়াম হেনরি—পেয়েছেন পরলোকগত আত্মাদের আবাহন করে নিয়ে আসবার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। বললেন, "একটু পরেই আপনারা যেসব অদ্ভুত ব্যাপার দেখবেন, সেগুলো সংঘটিত হবে এই চক্রে আহূত অশরীরী আত্মাদের দ্বারা। ড্যাভেনপোর্ট-ভায়েরা বন্দী অবস্থায় দুদিকে দুজনে বসে বসে ধ্যানযোগে তাদের আহ্বান করে আনবেন মাত্র। এর ভেতর এঁদের কোনো রকম চালাকি নেই, সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে এবং কোনো রকম চালাকি টের পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তা ঘোষণা করে দেবার জন্যে আপনাদের কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি এসে মঞ্চের ওপর আসন গ্রহণ করুন।"

যে-কয়েকজন বাছাই-করা প্রতিনিধি দর্শকমহল থেকে উঠে গিয়ে মঞ্চের ওপর আসন গ্রহণ করলেন, তাদের ভেতর দুজন ছিলেন—জন নেভিল ম্যাসকেলিন এবং তাঁর বন্ধু জর্জ কুক। তারপর মঞ্চে আবির্ভূত হলেন কালো পোশাক-পরা ড্যাভেনপোর্ট-ভ্রাতৃদ্বয়। এলো একটা কাঠের তৈরী ক্যাবিনেট, কাপড়-চোপড় রাখবার 'ওয়ার্ডরোব' (wardrobe) বা আলমারি গোছের, তার ভেতর এপাশ থেকে ওপাশে লম্বা একটি বেঞ্চ। ক্যাবিনেটের ভেতর ঢুকে দুভাই পরস্পর থেকে যথাসম্ভব দূরে, বেঞ্চের দুধারে বসলেন। তাঁদের হাত-পা বেঞ্চের সঙ্গে বেশ পোক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হল এমনভাবে, যেন সেই বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া তাঁদের নিজেদের পক্ষে সম্ভব নয়। বেঞ্চের মাঝখানে, দু-ভাই

থেকে যথেষ্ট দূরে রাখা হলো গীটার, ছড়িসহ বেহালা, পেতলের তৈরী একটি শিঙা, ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। ভেজিয়ে দেওয়া হল ক্যাবিনেটের দরজাগুলো।

আলো নিবিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল ঘণ্টা। বাজল শিঙা। বাজল বেহালা। তারপর ক্যাবিনেটের দরজা খুলে বাইরে, স্টেজের ওপর উড়ে এসে পড়ল বাদ্যযন্ত্রগুলো। দর্শকবৃন্দ ভীত, শিহরিত। সবারই ধারণা ক্যাবিনেটের ভেতরে ভূত আবির্ভূত হয়েই এই সব কাণ্ড করছে, কারণ দুই ভ্রাতাকে তো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে, তাঁদের নড়াচড়া করবার উপায় নেই, বাদ্যযন্ত্রগুলোর নাগাল পাওয়া তো দূরের কথা।

আবার যেইমাত্র আলো জলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল দু-জন ড্যাভেনপোর্ট যেমন ছিলেন তেমনি বেঞ্চের দুপাশে বসে আছেন, দুজনেরই হাত-পা এমন শক্ত করে বাঁধা যে, দড়ির পাকগুলো যেন মাংসের ভেতর কেটে বসে গেছে! সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে জন নেভিল ম্যাস্‌কেলিন বলে উঠলেন—"আমি এঁদের বুজরুকি ধরে ফেলেছি।"

দর্শকবৃন্দ একবার চমকে উঠেছিলেন ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের ভৌতিক ক্ষমতার নমুনা দেখে। আরেকবার চমকে উঠলেন জন নেভিলের এই ঘোষণা শুনে। এই ঘোষণার ঘোরতর প্রতিবাদ জানালেন ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের ম্যানেজার। সেই প্রতিবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে জন নেভিল দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন,—"ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের খেলাগুলো শুধু কৌশল এবং অভ্যাসের ফল, এদের সঙ্গে লোকান্তরিত আত্মার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তিন মাসের ভেতর এঁদের সবগুলো খেলাই আমি আপনাদের করে দেখাব, তাতে ভূতের কোনো সম্পর্কই থাকবে না।"

ড্যাভেনপোর্ট-ভ্রাতৃদ্বয়কে ভুয়ো বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা এখানে যেমন হলো, আগেও কয়েকবার হয়েছিল। কিন্তু এঁদের পসার এবং আয়ও কিছুমাত্র কমে নি, কারণ সাধারণ মানুষ অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করবার জন্যে বড় বেশী উৎসুক, বড বেশী ব্যাকুল। আর ইংরেজিতে একটি কথা আছে, "The will to believe ultimately becomes belief itself" অর্থাৎ "বিশ্বাস করবার প্রবল ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসেই পরিণত হয়", সে কথাটা খুবই সত্যি। জন নেভিল ম্যাস্‌কেলিন বলেছিলেন তিনমাস, কিন্তু তিনমাস দরকার হল না। দুমাসের ভেতরই ম্যাস্‌কেলিন এবং কুক-এর যাদু প্রদর্শনীর প্রথম প্লাকার্ড (প্রাচীরপত্র) পড়ল চেলটেনহ্যাম শহরের দেয়ালে দেয়ালে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার—ড্যাভেনপোর্টদের ভূতুড়ে খেলার গুপ্ত কৌশল জন নেভিল ম্যাসকেলিন কি করে টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন ড্যাভেনপোর্টদের ক্যাবিনেটের দরজার সামনে। তাঁদের যাদু-চক্রের একজন সভ্য ছিলেন জানালার কাছাকাছি। তাঁকে বলা ছিল জন নেভিল পা দিয়ে মেঝেতে টোকা দিলেই জানালার পর্দা ক্ষণিকের জন্য সরিয়ে বাইরের আলো ভেতরে ঢুকতে দেবেন। জন নেভিলের যেইমাত্র মনে হলো ক্যাবিনেটের মধ্যের দরজাটা খুলে যাচ্ছে, অমনি তিনি মেঝেতে পায়ের টোকা দিয়ে ইশারা করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে জানালার পর্দা ক্ষণিকের জন্য সরে গেল। সেই ক্ষণিকের আলোতেই একমুহূর্তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জন নেভিল লক্ষ্য করলেন, "একটি বাদ্যযন্ত্র তুলে আপন হাতে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছেন আইরা ড্যাভেনপোর্ট!" হঠাৎ আলো এসে পড়তেই বিদ্যুদ্বেগে বেঞ্চের ওপর নিজের বসবার জায়গায় ফিরে গিয়ে অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত দক্ষতার সঙ্গে কাঁধ গলিয়ে দিলেন দড়ির বাঁধনের তলায়। অর্থাৎ চোখের পলকে ফিরে গেলেন পূর্বেকার বন্দী অবস্থায়। সঙ্গে সঙ্গে জন নেভিল বুঝে নিলেন যত কষেই বাঁধা হোক-না কেন, ড্যাভেনপোর্টরা সেই বাঁধন থেকে বেরিয়ে এসে আবার সেই বন্দী অবস্থাতেই ফিরে যেতে পারেন অতিশয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। বন্ধন-মুক্ত হাত দিয়ে অন্ধকারে নানাবিধ 'ভূতুড়ে কাণ্ড' ঘটিয়ে আবার যখন খুশি তখনই বন্দী অবস্থায় ফিরে যাওয়া—এই হল ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের গুপ্ত কৌশল। এই আবিষ্কারকে ভিত্তি করে চলল গবেষণা, আবিষ্কার এবং অভ্যাস। ফলে তিন মাসের আগে, দুমাসের ভেতরই ড্যাভেনপোর্টদের খেলাগুলো রপ্ত করে ফেললেন যাদুকর ম্যাসকেলিন এবং যাদুকর কুক।

সেই খেলাগুলো আজ স্বাভাবিক নিয়মে (অর্থাৎ বিনা ভূতে) করে দেখাবেন ম্যাসকেলিন ও কুক। শুধু তাই নয়, ড্যাভেনপোর্টরা যা দেখিয়ে গেছেন তার চাইতেও অনেক বেশি অদ্ভুত কাণ্ড করে দেখাবেন এঁরা, পূর্ণ দিবালোকে।

দেখালেনও তাই। ড্যাভেনপোর্ট ভাইরা যে খেলাগুলো দেখিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, ম্যাসকেলিন ও কুক সেই খেলাগুলিই আরো নিখুঁতভাবে করে দেখালেন। কিন্তু দর্শক মহলে এক ভদ্রলোক তবু যেন সন্তুষ্ট হলেন না, তাঁর মনে একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব রয়ে গেল।

"বেশ তো, আপনি তাহলে দয়া করে উঠে আসুন এই ক্যাবিনেটের ভেতর" —বলা হলো ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক উঠে গিয়ে বসলেন ক্যাবিনেটের ভেতর।

তাঁর চোখ বেঁধে দেওয়া হল কাপড় দিয়ে আর তাঁর দুটি হাত বেঁধে দেওয়া হল দু'পাশে বসা দুজন যাদুকরের হাঁটুর সঙ্গে। বলা বাহুল্য, যাদুকর দুজনও দড়ির বাঁধনে বন্দী। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল ক্যাবিনেটের। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনেটের ভেতরে শুরু হল বিচিত্র বাজনার ঐকতান। একটু পরে ক্যাবিনেটের দরজাগুলো খুলে গেল আপনা থেকেই। দেখা গেল ম্যাসকেলিন এবং কুক ঠিক যেমন ছিলেন তেমনি দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় রয়েছেন, খুঁতখুঁতে ভদ্রলোকও চোখ বাঁধা আর দুহাত যাদুকরদ্বয়ের হাঁটুর সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় বসে আছেন, তফাতের ভেতর শুধু এই যে, নতুন ভদ্রলোকের মাথায় চেপে বসে আছে একটি বাদ্যযন্ত্র! বাঁধন খুলে দেওয়া হলো, ভদ্রলোক জব্দ হয়ে মুখ কাচুমাচু করে এসে বসে পড়লেন দর্শক মহলে।

দুজন যাদুকরকে তখন আগেকার বাঁধনের ওপর আরো দড়ি দিয়ে আরো পোক্ত করে বাঁধা হল। এমন কি গেরোগুলোর ওপর গালা দিয়ে শীলমোহরও করে দেওয়া হল। আরেকজন দর্শক ভদ্রলোক বললেন—এবার দুজন যাদুকরের চার হাতের ওপর ময়দা চাপিয়ে দেওয়া হোক। তাই দেওয়া হল। হাত দিয়ে কিছু করতে গেলেই হাত থেকে ময়দা পড়ে যাবে। একে দড়ির বন্ধন, তার ওপর এই ময়দার বন্ধন। এবার নিশ্চয়ই জব্দ হবেন যাদুকরদ্বয়।

কিন্তু দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাবিনেটের ভেতর সংগীত যন্ত্রগুলো আবার বাজতে শুরু করল। বাজনা থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকমহল থেকে একজন তাড়াতাড়ি খুলে দিলেন ক্যাবিনেটের দরজাগুলো। দেখা গেল দুজন যাদুকর ম্যাসকেলিন এবং কুক, তেমনি অসহায় বন্দী অবস্থায় বসে আছেন দুদিকে চুপচাপ, দুজনের হাতভরা ময়দা যেমন ছিল তেমনি আছে, এক কণাও ছিটকে পড়েনি। দড়িতে কষে গেরো বেঁধে দিয়েছিলেন যে গ্রন্থিবিশারদ নাবিক ভদ্রলোক, তিনি এসে গেরোগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। গেরোগুলির ওপর গালা দিয়ে যে শীলমোহর করা হয়েছিল, সেগুলোও পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল সব ঠিক আছে।

এ অবস্থায় ক্যাবিনেটের দরজাগুলো আবার বন্ধ করে দেওয়া হল। বন্ধ করে দেবার মিনিট চারেকের ভেতর দুই যাদুকর বন্ধু হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত অবস্থায়, কিন্তু দুজনের চার হাতেই ময়দা যেমন ছিল তেমনই রয়েছে!

দর্শকবৃন্দ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছিলেন বললে খুব বেশি বলা হয় না। কিন্তু বিস্ময়ের এখানে শেষ নয়। জন নেভিল ম্যাসকেলিন স্টেজের ওপর আনালেন

একটা ভারি কাঠের বাক্স। বাক্সটি তিন ফুট লম্বা, দু ফুট চওড়া, আর খাড়াইতে দেড় ফুট। দর্শকের হাতে বাক্সটি ছেড়ে দেওয়া হলো, তাঁরা ভালো করে সেটাকে পরীক্ষা করলেন। বাক্সের ভেতরে জায়গা বেশী নয়, তবু কোনোরকমে তার ভেতরে ঢুকে বসলেন জন নেভিল। বাকসটা তালা বন্ধ করে চাবিটি দিয়ে দেওয়া হল দর্শকের হাতে। একজন দর্শক বাক্সটিকে দড়ি দিয়ে জড়িয়ে বাঁধলেন, গেরোতে শীলমোহর করে দিলেন। সে অবস্থায় বন্দী যাদুকর সহ বন্ধ এবং বাঁধা বাক্সটিকে ক্যাবিনেটের ভেতর তুলে দিয়ে, বাক্সটির ওপরে কয়েকটি ঘণ্টা রেখে ক্যাবিনেটের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল। দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাগুলো বাজতে শুরু করলো, তারপর দরজা ঠেলে একটি একটি করে সবগুলো ঘণ্টা বাইরে এসে পড়লো। সর্বশেষে দরজাগুলো যখন সম্পূর্ণ খুলে গেল, তখন দেখা গেল যাদুকর জন নেভিল ম্যাসকেলিন বসে আছেন বাক্সটির ওপর। অথচ বাকসটি যেমন তালাবন্ধ আর দড়ি দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা ছিল তেমনি আছে, দড়ির গেরোর ওপর শীলমোহরও অটুট রয়েছে!

অলৌকিক 'ভৌতিক' শক্তির ভান করে ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয় যে খেলাগুলো দেখিয়ে গিয়েছিলেন আলো নিবিয়ে, সেই খেলাগুলো এবং তাঁদের চাইতেও বেশি বিস্ময়কর খেলা দেখালেন ম্যাসকেলিন ও কুক পুরো দিনের আলোয়, সম্পূর্ণ লৌকিক কৌশল খাটিয়ে। বিস্মিত, পুলকিত দর্শকবৃন্দ ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। ম্যাসকেলিন আর কুকের জয়-জয়কার। সাফল্যের নেশায় মেতে উঠলেন দুজন তরুণ যাদুকর। শহরে তাদের নিশ্চিত রুজি-রোজগারের মোহ-মায়া কাটিয়ে তাঁরা ঠিক করলেন একটা প্রকাণ্ড রকমের ঝুঁকি নেবেন—সফরে বেরোবেন তাঁদের ভ্রামামাণ যাদুপ্রদর্শনী নিয়ে। অসীম সাহস, অসীম উৎসাহ, অসীম আশা তাঁদের। দুরাশা আর দুঃসাহসও বলা যায়, কারণ সেই নীতিবাতিকগ্রস্ত ভিক্টোরিয়ান যুগে প্রমোদ-মঞ্চের প্রতি সমাজের দৃষ্টি খুব প্রসন্ন ছিল না। তাছাড়া এ দুই যাদুকর বন্ধুর আর্থিক পুঁজিরও খুব প্রাচুয ছিল না, অথচ এ ধরনের উদ্যোগে প্রচুর পুঁজির প্রয়োজন।

যাই হোক, ভ্রাম্যমাণ যাদুপ্রদর্শনী নিয়ে ঘুরতে লাগলেন যাদুকর ম্যাসকেলিন এবং কুক। প্রথম প্রথম তাঁদের প্রদর্শনীতে বেশ ভিড় হতে লাগল, কারণ ভুতুড়ে ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিনা ভূতে এরা কি রকম খেলা দেখাবেন, এ বিষয়ে সবারই মনে কৌতূহল। কিন্তু পরলোক থেকে ভূত এসে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করছে, এ বিশ্বাসে বা কল্পনায় যে নাটকীয় রোমাঞ্চ আছে, যে রোমাঞ্চ

ছিল ড্যাভেনপোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের 'অলৌকিক' প্রদর্শনীতে, ঠিক তারই অভাব ছিল ম্যাস্‌কেলিন আর কুকের যাদুপ্রদর্শনীতে। এঁরা তো সোজাসুজি বলেই দিচ্ছেন এঁদের খেলাগুলোর সঙ্গে ভূতের বা কোনো অলৌকিক শক্তির সম্পর্ক নেই। তার মানেই খেলাগুলোর মূলে রয়েছে লৌকিক কৌশল অর্থাৎ ধাপ্পা ; যদিও ধাপ্পা ঠিক কোথায় কোথায় সেটা ধরা যাচ্ছে না। সুতরাং নতুনত্বটা কেটে গেলেই দর্শক সাধারণের উৎসাহ, কৌতূহল ইত্যাদি ঝিমিয়ে আসতে লাগল।

দু-বছর নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এসে তারপর ম্যাসকেলিন ও কুক তাঁদের যাদু প্রদর্শনের ব্যবসাটি বন্ধ করে দেবেন ভাবছেন, এমন সময় এলো লণ্ডনের 'ক্রুস্ট্যাল প্যালেস' রঙ্গালয়ের ম্যানেজারের কাছ থেকে কয়েক সপ্তাহব্যাপী যাদু প্রদর্শনের আমন্ত্রণ, গোড়াতেই যার কথা বলেছি।

এইবার তাহলে গোড়ার কথাতেই ফিরে আসা যাক। লণ্ডন শহরে 'ক্রুস্ট্যাল প্যালেস' রঙ্গালয়ে কয়েক সপ্তাহব্যাপী যাদু-প্রদর্শন শুরু করবার আগে মফস্বল শহরের এক রঙ্গালয়ে এক সপ্তাহের চুক্তিতে যাদু-প্রদর্শন শুরু করলেন ম্যাসকেলিন এবং কুক। দুদিনের প্রদর্শনীর পরেই সারা শহরে গুজব রটে গেল—এঁরা দুজন সাধারণ যাদুকর নন, খোদ শয়তানের সঙ্গে এঁদের অন্তরঙ্গতা আছে। এঁরা শয়তানের বন্ধু, কিংবা শয়তানের উপাসক।

বুধবার সন্ধ্যার প্রদর্শনীতে বেশ ভাল আসনে এসে বসলেন শহরের গীর্জার একজন বহু-সম্মানিত গোঁড়া ধর্মযাজক। গীর্জার পাদ্রী এসেছেন রঙ্গালয়ে তাঁদের যাদু খেলা দেখতে, দুজন যাদুকরই আনন্দে গৌরবে আত্মহারা। দ্বিগুণ উৎসাহে খেলা দেখালেন সেদিন। খেলা অদ্ভুত ভাল হল। পরদিনও এলেন পাদ্রীসাহেব। আরো উৎসাহিত হলেন যাদুকর দুজন। তারও পরের দিন পাদ্রীসাহেব এলেন আরো কয়েকজন গুরুগম্ভীর বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে। দুই যাদুকরের অদ্ভুত খেলা দেখে তাঁদের সবারই মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

পরদিন। শনিবার। যাদু-প্রদর্শনী শুরু হবে আরেকটু পরেই। দেখা গেল রঙ্গালয়ের বাইরে জড়ো হয়েছে একটি বৃহৎ ক্ষিপ্ত জনতা, তার নেতা সেই বৃদ্ধ পাদ্রীসাহেব। সেই কয়েক শো খ্যাপা মানুষকে তিনি এগিয়ে নিয়ে আসছেন রঙ্গালয়ের দিকে।

একটু পরেই স্টেজে আবির্ভূত হতে হবে, তাই স্টেজের নেপথ্যে তৈরি হচ্ছেন দুই যাদুকর বন্ধু। তাঁদের কানে ভেসে আসছে বাইরের দুরন্ত কোলাহল। আনন্দে ভরপুর তাঁদের মন—অসামান্য জনপ্রিয় হয়েছে তাঁদের যাদু-প্রদর্শন,

টিকেট-প্রার্থীর ঐ কোলাহলই তার প্রমাণ। এমন সময় ছুটে এলেন রঙ্গালয়ের ম্যানেজার। তার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, জামা ছেঁড়া, শরীরের দু-এক জায়গা কেটেও গেছে।

"ভয়ংকর ব্যাপার। পিছনের দরজা দিয়ে শিগগির পালান।" বললেন ম্যানেজার, হাঁফাতে হাঁফাতে।

"কেন? কী হয়েছে? খুলে বলুন ব্যাপারটা।"

"সময় নেই। কথা কাটাকাটি না করে শিগগির পালান। ওরা এসে আপনাদের নাগাল পেলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। শুধু আপনাদের নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই হলের সব কিছু ওরা ভেঙে-চুরে তচনচ করবে। ঐ বুড়ো পাদ্রী ওদের সবাইকে বুঝিয়েছে, আপনারা খোদ শয়তানের চেলা—আপনাদের এই সব অদ্ভুত কাণ্ড শয়তানের কীর্তি, মানুষের কর্ম নয়।"

জন নেভিল প্রথমে ভাবলেন জনতার মুখোমুখি হয়ে তাদের ভুল ভেঙে দেবেন। কিন্তু 'রক্ত চাই' জাতীয় হুঙ্কার শুনে তিনি মত বদলালেন। সঙ্গে তাঁর নবপরিণীতা সুন্দরী বধূ, তাঁকে এই বিপদের মুখে ফেলা ঠিক হবে না, ভাবলেন তিনি। ম্যানেজার রঙ্গালয়ের সামনের দিকের দরজা বন্ধ করে রেখে জনতাকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখলেন। সেই সুযোগে পিছনের দরজা দিয়ে প্রাণ নিয়ে সদলে পলায়ন করলেন কুক এবং ম্যাসকেলিন-দম্পতি। যাদু-প্রদর্শনে অসাধারণ সাফল্য আরেকটু হলেই তাঁদের অকাল-মৃত্যুর কারণ হত। অতি-ভালো যে সব সময় ভালো নয়, এ ঘটনাটি তার বিশিষ্ট উদাহরণ।

একটি অভিশপ্ত খেলা

১৭৮৫ খৃস্টাব্দে ফিলিপ অ্যাস্টলির লেখা যাদুবিদ্যা বিষয়ক একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির নাম 'ন্যাচারাল ম্যাজিক' অর্থাৎ লৌকিক (বা স্বাভাবিক) যাদুবিদ্যা। লেখক একজন যুবক—বিখ্যাত ঘোড়সওয়ার, পেশাদার সৈনিক, শখের যাদুকর। বইটির ভূমিকায় তিনি তাঁর সৈনিক জীবনের কয়েকটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন ; বিশেষ করে তিনি বন্দুকের গুলি ধরার লোমহর্ষক খেলাটি কিভাবে আবিষ্কার করেছিলেন—অথবা কী পরিস্থিতিতে আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন—তারই কাহিনী।

তিনি লিখেছেন, সৈন্যদলে তাঁর দুজন সহকর্মীর ভেতর একবার ভয়ানক ঝগড়া হল, দুজনে দুজনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। ঠিক হল, আগামীকাল খুব ভোরে হবে তাঁদের লড়াই। দুজনেই পিস্তল হাতে পরস্পরের দিকে পেছন ফিরে কিছু দূরে দাঁড়াবেন, মধ্যস্থের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে কুড়ি পা এগিয়ে এসে গুলি ছুঁড়বেন।

দুজনেই পিস্তল চালাতে পাকা ওস্তাদ, সুতরাং দুজনের ভেতর অন্তত এক-জনের মৃত্যু অবধারিত। মনোমালিন্যের ফলে বন্ধুর হাতে বন্ধুর মৃত্যু হবে, অ্যাস্টলির তা ভালো লাগলো না। অথচ দুটি বন্ধুই ভয়ানক একগুঁয়ে, দুজনেরই আত্মসম্মান জ্ঞান ভয়ানক টনটনে, পিস্তলের লড়াই থেকে তাঁদের নিবৃত্ত করা যাবে না কিছুতেই। তাহলে কী উপায়ে তাঁদের দুজনেরই প্রাণ এবং মান দুই-ই একসঙ্গে বাঁচান যায় ? দ্রুতবেগে মাথা ঘামাতে লাগলেন অ্যাস্টলি। প্রথমেই বলেছি, তিনি ছিলেন শখের যাদুকর। হাত-সাফাই আর চোখে ধুলো দেবার নানারকম কায়দা তাঁর জানা ছিল, এদিকে তাঁর মাথাও ভালই খেলতো। উপায় তিনি বার করে ফেললেন। প্রতিদ্বন্দ্বী দুজনের সামনেই তিনি যথাসময়ে পিস্তলের নলের ভেতর গুলি আর বারুদ পুরে দিলেন। পরস্পরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বার সময় আওয়াজ শুনে প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভাবলেন গুলি ছুটল, কিন্তু আসলে তা শুধু বারুদের ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, যে গুলি দুটি পিস্তল থেকে ছুটে বেরোবার কথা, তারা তখন বিশ্রাম করছে অ্যাস্টলির পকেটে।

দুজনেই গুলি ছুঁড়েছেন, সুতরাং দুজনেরই জেদ এবং মান বজায় থেকেছে।

কিন্তু দুজনেরই মনে থেকে গেল একটি বিস্ময় – দুটি গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো কি করে ? তাঁরা কি বুঝতে পেরেছিলেন এর মূলে ছিল অ্যাস্টলির যাদু-কৌশল ? হয়তো পেরেছিলেন, অথবা হয়তো পারেননি। যাই হোক, দুজনের প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ফিলিপ অ্যাস্টলি যে যাদু-কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, তারই উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা 'বুলেট ধরার খেলা' (বুলেট ক্যাচিং ট্রিক) অনেক যাদুকরের শোচনীয় মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

এঁদের ভেতরে একজন ছিলেন ভারতীয় যাদুকর। ১৮১৪ খৃস্টাব্দে লণ্ডনের প্রমোদ-জগতে বেশ একটু সাড়া জাগিয়েছিলেন যাদুকর রামস্বামী ও সম্প্রদায়। এঁদের যাদুক্রীড়ার তালিকায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল এই "বুলেট ধরার খেলা"। ইংলণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় বছর তিনেক যাদু-প্রদর্শন করে ১৮১৮ খৃস্টাব্দে রামস্বামী যাদু-সম্প্রদায় গেলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরে খেলা দেখাতে। দুর্ঘটনা ঘটল সেইখানে। রামস্বামী দলের একজন যাদুকর উড়ন্ত বুলেট কামড়ে ধরে ফেলার লোমহর্ষক খেলা দেখাতেন। পিস্তলে বুলেট পুরে পিস্তলটি একজন যুবকের হাতে দেওয়া হতো। যুবকটি যাদুকরকে লক্ষ্য করে পিস্তল চালাতেন। 'গুড়ুম' করে আওয়াজ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যেত বুলেটটিকে যাদুকর কামড়ে ধরে ফেলেছেন।

কিন্তু সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার রাত্রে নিয়তি এক নিষ্ঠুর খেলা খেললেন। সম্ভবত ভুলের বশে কৌশলযুক্ত পিস্তলের বদলে আসল টোটাভরা পিস্তল ছুঁড়তে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, অথবা অন্য এমন কোনো ভুল হয়েছিল যার ফলে অন্যান্য রাতের মতো শুধু বারুদের ফাঁকা আওয়াজ না হয়ে আসল বুলেটই ছুটে বেরুলো। আসল পিস্তল থেকে সত্যি সত্যি আসল বুলেট ছুটলে সে বুলেট কামড়ে ধরে ফেলা কোনো মানবসন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। রামস্বামী সম্প্রদায়ের সেই হতভাগ্য যাদুকরের পক্ষেও সুতরাং তা সম্ভব হল না। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলেন। ভারতের এক যাদুকর যাদুর খেলা দেখাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন সুদূর আয়ার্ল্যাণ্ডে।

এর বছর দুই-বাদে জার্মানীর আর্নস্টাডট (Arnstadt) শহরে যে দুর্ঘটনা ঘটল এই একই মারাত্মক খেলা দেখাতে গিয়ে, তার কাহিনী আরও শোচনীয়, আরও মর্মান্তিক। পোল্যাণ্ডের যাদুকর দ্য লিনস্কির (De Linsky) খ্যাতি তখন সারা ইউরোপ জুড়ে। তিনি সাদর আমন্ত্রণ পেলেন আর্নস্টাডট থেকে – সেখানে যাদু প্রদর্শন করতে হবে যুবরাজ ফন শোয়ার্ৎসবুর্গ সণ্ডারহাউসেনের (Prince

von Schwartzburg Sonderhausen) প্রাসাদে। আশাতীত সম্মানের আনন্দে আত্মহারা যাদুকর দ্য লিন্‌স্কি পত্নীকে বললেন, 'এইবার আমাদের বরাত খুলে গেল। এখন থেকে আমার প্রচার-পুস্তিকায় যুবরাজের নাম ছাপতে পারব আমার যাদুমুগ্ধ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। যাদু জগতে বাড়বে মর্যাদা। আর এর পর আমার যাদু-প্রদর্শনীর দক্ষিণাও দেব চড়িয়ে। কম টাকায় আর কোথাও খেলা দেখাব না। এবারে রাজা-রাজড়াদের প্রাসাদে-প্রাসাদে যাদু দেখিয়ে বেড়াব। ইউরোপ জুড়ে এখন তো রাজা-রাজড়ার ছড়াছড়ি।'

খুশী হয়ে উঠলেন তাঁর পত্নী, যাদু-সহকারিণী মাদাম দ্য লিন্‌স্কি, রাজা-রাজড়ার প্রসঙ্গ শুনে। দামী মণি-মুক্তা জহরতাদি রাজকীয় উপহার নিশ্চয়ই প্রচুর মিলবে। সারা ইউরোপের রাজা-রাজড়াদের প্রিয়তম যাদুকর যাদুসম্রাট দ্য লিন্‌স্কির সহধর্মিণী তিনি ; কত নারী ঈর্ষান্বিতা হবে তাঁর অসামান্য সৌভাগ্যে। হায় মাদাম দ্য লিন্‌স্কি !

১০ই নভেম্বর, ১৮২০ সাল। সন্ধ্যা ঘনিয়েছে কিছুক্ষণ হল। আর্নস্টাডট শহরে যুবরাজ ফন শোয়ার্ংসবুর্গ সণ্ডারহাউসেনের প্রাসাদে চমৎকার জমেছে যাদুকর দ্য লিন্‌স্কির যাদু-প্রদর্শন। এইবারে দেখান হবে তাঁর যাদু-ভাণ্ডারের সবচেয়ে বিস্ময়কর, সবচেয়ে ভয়ংকর, সবচেয়ে বেশি শিহরণ জাগান খেলা।

স্টেজের একদিকে সারি দিয়ে দাঁড়াল ছ'জন সৈনিক—যুবরাজের দেহরক্ষী। সবারই হাতে বন্দুক। দর্শকদের পরীক্ষিত কার্তুজ আপন আপন বন্দুকে পুরে তৈরি হয়ে দাঁড়াল তারা, ইঙ্গিত পেলেই একসঙ্গে গুলি চালাবে। আপাদমস্তক সামরিক সাজে সজ্জিত উদ্যত-বন্দুক এই ছ'জন সাক্ষাৎ যমদূতের মুখোমুখি স্টেজের ওধারে কে ? যাদুকর দ্য লিন্‌স্কি ? না, তিনি নন। দাঁড়িয়ে আছেন কুসুম-সুকুমারতনু তন্বী সুন্দরী মাদাম দ্য লিন্‌স্কি।

অসাধারণ পরিস্থিতি। এর অসাধারণত্বের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষ-ভাবে উপস্থিত প্রত্যেকের, বিশেষ করে যুবরাজ পরিবারের, মনোযোগ আকর্ষণ করলেন যাদুকর দ্য লিন্‌স্কি। তিনি বললেন, "মাদাম দ্য লিন্‌স্কিই সমগ্র বিশ্বে একমাত্র মহিলা যিনি যাদু-শক্তিতে বন্দুকের উড়ন্ত বুলেট হাতে ধরে ফেলতে পারেন। তার চাক্ষুষ প্রমাণ আপনারা এখ্‌খুনি দেখতে পাবেন। আসল কার্তুজ—আপনারাই পরীক্ষা করে দিয়েছেন—আসল বন্দুকে পুরে গুলী চালাচ্ছে ছ'জন সত্যিকারের সৈনিক। বিশ্বের যাদু-প্রদর্শনের ইতিহাসে এ অভূতপূর্ব, অভাবনীয়, অভিনব।..."

নির্ভীক, নিষ্কম্প, নিঃসংশয় কণ্ঠস্বর যাদুকর স্থ লিন্স্কির। তাঁর যাদুকর জীবনে আজ এক মহা গৌরবের দিন, যাদু-প্রদর্শনের ইতিহাসে আজ এক নূতন নজির তৈরি হবে। কিন্তু ওদিকে দুরুদুরু কাঁপছে মাদাম স্থ লিন্স্কির বুক। মুখে ফুটিয়ে রেখেছেন মৃদু হাসি, কিন্তু ঐ হাসি পারেনি তাঁর অন্তরের ভীতিকে পুরোপুরি আড়াল করে রাখতে। তাঁর সারা মন জুড়ে রয়েছে বিরাট আশঙ্কা, আর দুহাতে লুকান আধ-ডজন বুলেট। এই লুকান বুলেটগুলিই দুহাতে 'ধরতে' হবে ঠিক ফাঁকা আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গেই।

কিন্তু আওয়াজ যদি ফাঁকা না হয়? যদি একটি বন্দুক থেকেও সত্যি সত্যি আসল বুলেট বেরিয়ে আসে, তাহলে?

যাদুকর স্থ লিন্স্কি যে নিশ্চিন্ত ছিলেন, তার কারণ ঐ ছ'জন সৈনিককে তিনি আগেই গোপনে শিখিয়ে রেখেছিলেন তারা যেন বন্দুকে পুরবার আগে কার্তুজের মুখটা দাঁত দিয়ে কেটে নেবার সময় বুলেটটাও মুখের ভেতর টেনে নিয়ে সেখানেই লুকিয়ে রাখে। (তখনকার কার্তুজ ঐভাবে দাঁতে কেটে বন্দুকে ভরা হত।) তাহলে কোনো বন্দুকেই বুলেট পোরা হবে না। পোরা হবে শুধু বারুদ-ভরা বুলেটহীন কার্তুজ। তার ফলে বন্দুকের ঘোড়া টিপলে বারুদের ফাঁকা আওয়াজ-টাই শুধু হবে, বুলেট ছুটবে না।

এভাবে তালিম দিয়ে সেই ভরসাতেই তিনি মাদামকে অভয় দিয়েছিলেন। মাদাম বলেছিলেন, "কিন্তু এরা এ ধরনের যাদু খেলায় শিক্ষিত বা অভ্যস্ত নয়, এত অল্প অভ্যাসে এরা নিখুঁতভাবে তৈরি হতে পারবে কি? তাছাড়া এরা অশিক্ষিত, তোমার সব কথা ভাল করে বুঝেছে কিনা তার ঠিক কি? আমার কিন্তু বড় ভয় করছে।"

যাদুকর তাঁর সেই ভয়কে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "কোনো ভয় নেই। আমি ওদের বারকয়েক রিহার্সাল দিয়ে নিয়েছি যে।"

পতিদেবতার পীড়াপীড়িতে সতী দেবী 'অগত্যা' রাজী হয়েছিলেন, মনজোড়া নিদারুণ আশঙ্কা নিয়ে। শেষকালে সতীর আশঙ্কাই সত্য হল। ইঙ্গিত পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সৈনিকরা যে যার বন্দুকের ঘোড়া টিপল মাদামকে লক্ষ্য করে, ঠিক যেমনটি করবার কথা ছিল। প্রচণ্ড আওয়াজ হল, আর সঙ্গে সঙ্গেই মর্মান্তিক আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন মন্দভাগ্য মাদাম স্থ লিন্স্কি। একজন সৈনিক ভুল করেই হোক বা দুষ্টুমি করেই হোক, কার্তুজ থেকে বুলেটটি কামড়ে মুখের ভিতর নিয়ে নেয়নি। বন্দুকের ভেতরই পুরে দিয়ে-

ছিল। সেই বুলেটটিই মাদাম দ্য লিন্‌স্কির দেহ বিদ্ধ করে তাঁর মৃত্যুর কারণ হল।

এর মাত্র কিছুদিন আগে যাদুকর দ্য লিন্‌স্কির একমাত্র সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল। এবার তিনি স্ত্রীকে হারালেন, আর সেইসঙ্গে তাঁর নতুন ভাবী সন্তানকে, আর কয়েক মাসের ভেতরই যার পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে তাকাবার কথা ছিল। পত্নীর শোকে এবং নিদারুণ আফশোষে যাদুকর দ্য লিন্‌স্কি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী যাদুকর রবেয়ার উদ্যাঁ (Robert Houdin) তাঁর স্মৃতি-কাহিনীতে একটি করুণ কাহিনী বিবৃত করেছেন। উদ্যাঁর যাদুবিদ্যার গুরু ছিলেন একজন কাউণ্টের পুত্র। তাঁর নাম এদমঁ দ্য গ্রিসি (Edmond De Grisy), যাদু-জগতে তিনি ছিলেন 'টরিনি' (Torrini) নামে খ্যাত। উদ্যাঁকে তিনি যে তাঁর আপন ভাণ্ডার উজাড় করে যাদুবিদ্যায় তালিম দিয়েছিলেন, তার কারণ উদ্যাঁকে তিনি তাঁর আপন একমাত্র পুত্রের মত স্নেহ করতেন। এবং এই স্নেহের কারণ—রবেয়ার উদ্যাঁর চেহারার সঙ্গে যাদুকর 'টরিনি'র স্বর্গত পুত্র জিওভানি দ্য গ্রিসির চেহারার আশ্চর্য মিল ছিল। তাই তিনি যেন উদ্যাঁর মধ্যে তাঁর সেই হারানো ছেলেকে খুঁজে পেতেন। এই ছেলের শোচনীয় মৃত্যু সম্বন্ধে 'টরিনি' উদ্যাঁকে বলেছিলেন :

স্ট্রাসবুর্গ (Strasburg) শহরের সেরা রঙ্গালয়ে আমি যাদু প্রদর্শন করছি। প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটি দর্শক উদগ্রীব হয়ে রয়েছে আমার বিখ্যাত মর্মস্পর্শী খেলাটি দেখবার জন্যে, যে খেলাটির নাম দিয়েছিলাম 'উইলিযাম টেল্‌-এর পুত্র'। এ খেলায় আমার পুত্র জিওভানি অবতীর্ণ হত সুইস বীর উইলিয়াম টেল-এর পুত্র ওয়াল্‌টারের ভূমিকায়। তফাৎ এই যে আপেলটি ওয়ালটারের মত মাথার ওপর না রেখে জিওভানি তার দু-পাটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে রাখত। আমি ইশারা করতেই একজন দর্শক জিওভানিকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি চালাতেন। দেখা যেত গুলিটি ঐ আপেলটিকে বিদ্ধ করে আপেলের ভেতরেই আটকে রয়েছে।

খেলাটির মূল কৌশল ছিল পিস্তলের আসল গুলির পরিবর্তে নকল গুলি ব্যবহারে। একজন অভিজ্ঞ রাসায়নিক আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে কয়েকটি ধাতুর গুঁড়ো মিশিয়ে এমনভাবে গুলি তৈরি করা যায় যা দেখতে প্রায় হুবহু আসল সীসার গুলির মতই হত। এই নকল গুলি পিস্তলে ব্যবহার করবার আসল গুলির সঙ্গে মিশিয়ে রাখলে সহজে তফাৎ বোঝা যেত না। এই

নকল গুলি বারুদসহ পিস্তলে পুরে দিলে গুঁড়িয়ে যেতো ; ফলে পিস্তলের ঘোড়া টিপলে আওয়াজ আর ধোঁয়া হতো ঠিকই, কিন্তু গুলি ছুটতো না। (বলা বাহুল্য আপেলের ভেতরে যে গুলিটি পাওয়া যেত সেটি অন্য গুলি এবং আসল গুলি, দর্শক কর্তৃক পিস্তল থেকে ছোঁড়া গুলি নয়।)

সেই নিদারুণ সন্ধ্যায় কি মর্মান্তিক ভুল আমার হয়ে গেল ! নিশ্চয়ই মেকি গুলির পরিবর্তে পিস্তলে একটি আসল গুলিই ভরা হয়ে গিয়েছিল, হতভাগ্য আমি তা খেয়াল করিনি। দর্শকদের একজন প্রতিনিধি উদ্যত পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ; আমি জানি না ঐ পিস্তলের ভেতরেই রয়েছে আমার পুত্রের মৃত্যুবাণ, আমারই ইশারার অপেক্ষায়।···

"ইশারা করলাম। গর্জন করে উঠলো পিস্তল। গুলি চলে গেল আমার একমাত্র পুত্রের ললাট ভেদ করে। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল জিওভানি, দুঃসহ যন্ত্রনায় দু-একবার এপাশ-ওপাশ করল। তারপর সব শেষ।"

এ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮২৬ খৃস্টাব্দে, অবশ্য রবেয়ার উদ্যা তাঁর আত্মস্মৃতি গ্রন্থে যে কাহিনী লিখেছেন তা যদি সত্য হয়। 'যদি' বললাম এই কারণে যে কেউ কেউ সন্দেহ করেছেন উদ্যা তাঁর স্মৃতিকথায় অনেক বানান গল্পকেও সত্যি বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, অনেক সামান্য ব্যাপারকে অসামান্য বলে চালাবার জন্যে প্রচুর রঙ চড়িয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত আত্মচরিত-লেখক রুশোর মত।

কিছু কিছু গুল-গল্প, কিছু কিছু অতিরঞ্জন উদ্যা-র স্মৃতিকথায় থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু উক্ত কাহিনীটির সত্যতায় বিশ্বাস হয় এইজন্যে যে বন্দুকের গুলি আটকানোর এই মারাত্মক খেলায় তিনি কোন মানুষকে বন্দুক বা পিস্তলের গুলির লক্ষ্য বানাতেন না। মনে হয় 'টরিনি'র পুত্রের শোচনীয় মৃত্যু-কাহিনী শুনে তিনি সাবধান হয়েছিলেন, তাই যাদু-প্রদর্শনের খাতিরে নিজের বা অন্য কারও প্রাণহানির ঝুঁকি নিতে রাজী হননি। তাঁর খেলায় গুলি ছোঁড়া হত ছুরির ফলায় বেঁধান একটি আপেলকে লক্ষ্য করে। তারপর ঐ আপেলের ভেতর থেকে তিনি সেই (?) গুলিটি বার করে দেখাতেন।

বিখ্যাত হ্যারি হুডিনি-র (Harry Houdini) মতো বেপরোয়া যাদুকর পৃথিবীতে খুব বেশি জন্মাননি। যাদু-জগতে অতুলনীয় সাড়া জাগাবার উদগ্র নেশায় তিনি দুঃসাহসিক যাদুর খেলায় বহুবার মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তিনি যখন ঠিক করলেন তিনিও এই গুলি আটকানোর খেলা দেখাবেন আরো

রহস্যময় আরো লোমহর্ষকরূপে, তখন মার্কিন যাদু-জগতের প্রবীণতম যাদুকর হ্যারি কেলার বললেন, "হ্যারি, আমি তোমায় পুত্রের মত স্নেহ করি। এই সর্বনেশে, অভিশপ্ত খেলা তুমি দেখাতে যেও না। এ খেলায় তুমি যত হুঁশিয়ারই হও-না কেন, বিপদের ঝুঁকি থেকে যাবেই। বৃদ্ধের কথা রাখ, এ খেলা দেখাবার দুর্মতি ত্যাগ কর। আমাদের একমাত্র হুডিনিকে হারালে সে লোকসান আমাদের সইবে না।"

হুডিনি এ অনুরোধ রেখেছিলেন।

শনিবার ২৩শে মার্চ, ১৯১৮ খৃস্টাব্দ। রাত্রি। লণ্ডন শহরের উডগ্রীন এম্পায়ার রঙ্গালয়। "বিস্ময়কর চীনা যাদুকর" চুং লিং সূ-র (Chung Ling Soo) যাদু-প্রদর্শনী। অতুলনীয় এই যাদুকরের যাদুমুগ্ধ ভক্ত দর্শকে হল ভর্তি ; একটি আসনও খালি নেই। প্রত্যেক জোড়া চোখে অসীম কৌতূহল।

"বিস্ময়কর চীনা যাদুকর" (Marvellous Chinese Conjurer) – এই তিনটি শব্দের সঙ্গে শুধু লণ্ডন নয়, ইংলণ্ডের প্রমোদ জগৎ তখন গত আঠার বছর ধরে পরিচিত। তিন শব্দের এই বর্ণনাটি যে চুং লিং সূ-র সম্বন্ধে নিখুঁত-ভাবে প্রযোজ্য, সে বিষয়ে যাদু-আমোদী সাধারণের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। শুধু যে তাঁর যাদুর ছোটো বড়ো সবগুলো খেলাই আশ্চর্য রহস্যময় ছিল, এবং সেগুলো কি করে সম্ভব দর্শকরা তা প্রচুর মাথা ঘামিয়েও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতেন না, তাই নয়। চোখ-চমকান জমকাল রঙে রঙিন রেশমী পর্দা, তার ওপর চীনা ড্রাগন এবং আরো নানারকমের নকশা আঁকা, প্রাচ্য পদ্ধতিতে মনোমুগ্ধকর মঞ্চসজ্জা, নেপথ্যের আবহ-সঙ্গীতে প্রাচ্য সুর, প্রাচ্য ছন্দ, সব কিছু মিলিয়ে সারা মঞ্চ জুড়ে থাকত প্রাচ্য আবহাওয়া, যে আবহাওয়া ছড়িয়ে যেত সারা হলে। যাদুকরের দলের সবাই চৈনিক সাজে সজ্জিত। সবার ওপরে সেরা আকর্ষণ স্বয়ং অতুলনীয় যাদুকর চুং লিং সূ, তাঁর মুখে অমায়িক রহস্যভরা মৃদু হাসি, পরনে ঢিলেঢালা রঙিন চীনা আলখাল্লা। তাঁর চৈনিক কায়দায় চলাফেরা অঙ্গভঙ্গী সব কিছুই অপরূপ, নয়নাভিরাম। তিনি ইংরাজি আদৌ জানতেন না, অথবা ভাল জানতেন না – দর্শকদের তাই ধারণা – তাই তিনি নীরবেই দেখিয়ে চলতেন খেলার পর খেলা, বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগিয়ে। অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তাঁর নির্বাক যাদু-প্রদর্শন দর্শকদের করে রাখত মন্ত্রমুগ্ধ, নির্বাক ; শুধু মাঝে মাঝে যখন বিস্ময় চরমে উঠত, তখন দর্শকদের সমবেত উল্লাসধ্বনিতে ভরে উঠত সারা প্রেক্ষাগৃহ।

আজ শনিবার ২৩শে মার্চ, ১৯১৮। রাতের প্রদর্শনীতে যাঁরা চুং লিং সূ-র যাদুর খেলা দেখতে এসেছেন, তাঁদের অনেকে গত কয়েক রাত ধরে রোজই আসছেন, একটি রাতও বাদ না দিয়ে। পাকা খানদানী ওস্তাদের উচ্চাঙ্গ সংগীত

যেমন বারবার শুনেও পুরনো হয় না, যতো বেশিবার শোনা যায় ততই আরো বেশি করে ভাল লাগে, চুং লিং সূ-র প্রদর্শিত একই খেলা রাতের পর রাত দেখেও তেমনি আশ মেটে না দর্শকদের। এই কথাই নানাভাবে জাগছে হলশুদ্ধ দর্শকদের মনে। তাঁরা ভাবছেন অন্যান্য রাতের মতো আজ রাতেও খেলার শেষে বিস্ময়-পুলকিত চিত্তে বাড়ি ফিরে যাবেন। তাঁরা জানেন না নিয়তির বিধানে আজকের রাতটা অন্য রাতের চাইতে কী ভীষণ রকম আলাদা, জানেন না আজ রাতে এই উডগ্রীন এম্পায়ার হলে তাঁদের চোখের সামনে একটু পরেই কী নিদারুণ মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটবে।

বেশ কিছুক্ষণ যাদুর খেলা দেখিয়ে মঞ্চের নেপথ্যে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছেন চুং লিং সূ। শুধু বিশ্রাম নয় তৈরিও হয়ে নিচ্ছেন পরের খেলাটির জন্য। যাদু-বিরতির এই সময়টা দর্শকদের মশগুল রাখছেন চুং লিং সূ-র জাপানী স্টেজ-ম্যানেজার কামেতারো (Kametaro) তাঁর নিজের খেলা দিয়ে। 'জাগ্‌লিং' (Juggling) অর্থাৎ বল, চামচ, ছুরি, প্লেট প্রভৃতি নানারকম জিনিস নিয়ে নানা কায়দায় লোফালুফির এবং ভারসাম্যের খেলায় তিনি পাকা ওস্তাদ। হরেক রকম সার্কাসী খেলায়ও তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। এছাড়া একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলা তিনি দেখান, সেটি হচ্ছে একেবারে খালি পায়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার তলোয়ারের একটি মই বেয়ে বেয়ে উঠে উল্টো দিক দিয়ে অন্য মই দিয়ে নীচে নেমে যাওয়া। তলোয়ারের ধারাল ফলাগুলো ওপরমুখো, তারই ওপর পা দিয়ে দিয়ে ওঠা-নামা; একচুল এদিক ওদিক হলেই পা কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে থাকতে হবে। এটা যাদুর খেলা নয়, অর্থাৎ এর ভেতরে কোনো ফাঁকির কৌশল নেই, এর কৌশল শুধু অসীম সাহস, আত্ম-বিশ্বাস আর নির্ভুলভাবে পা ফেলা। এ খেলার তুলনায় সার্কাসের উঁচু ট্রাপিজের খেলাও অনেক বেশী নিরাপদ। খেলাটি এমন সাংঘাতিক রকম বিপজ্জনক যে চুং লিং সূ অনেকবার কামেতারোকে বলেছেন "কামেতারো, এই মারাত্মক খেলাটিকে বাদ দাও তোমার খেলার ঝুলি থেকে। এটার বদলে অন্য কোনো খেলা দেখাও।" কিন্তু…

এবারে যাদুকর চুং লিং সূ-র কথা কিছু বলে নিই, বিশেষ করে তাঁর কয়েকটি সেরা খেলার কথা। চুং লিং সূ ছিলেন লম্বা সুগঠিত সুপুরুষ। তাঁর সহধর্মিণী এবং সহকারিনী সুঈ সীন (Suee Seen) ছিলেন ছোটখাট মানুষ; অসাধারণ বুদ্ধিমতী, অসাধারণ চটপটে। সুঈ সীনকে নিয়ে চুং লিং সূ

"মুক্তার জন্ম" (Birth of a Pearl) নামে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত একটি চমৎকার খেলা দেখাতেন। এ খেলাটি দেখাতে যেমন ভালবাসতেন চুং লিং সু, তেমনি দেখে কখনো আশ মিটত না দর্শকদের। যাদুপ্রদর্শনী নিয়ে বিশ্বের যেখানেই তিনি গেছেন—গেছেন অনেক জায়গায়—সেখানেই এ খেলাটি দেখিয়েছেন চুং লিং সু। খেলাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক। স্টেজের উপর একটা কাপড়ের পর্দা সরে যেতেই দেখা যেতো সমুদ্রের তলার দৃশ্য—এখানে ওখানে সামুদ্রিক আগাছা, শ্যাওলা-ঢাকা পাথর ইত্যাদি, আর স্টেজের মাঝখানে একটা বিরাট শুক্তি বা ঝিনুক। চুং লিং সু সেই ঝিনুকের দু-পাটি সম্পূর্ণ ফাঁক করে খুলে দর্শকদের পরিষ্কার দেখিয়ে দিতেন ঝিনুকের ভেতরটা নিঃসন্দেহে ফাঁকা। তারপর দু-পাটি মুখোমুখি চেপে বন্ধ করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝিনুকটি ফাঁক করতেই দেখা যেত ওপরের ঢাকনাটি ঠেলে তুলে শুক্তির ভেতর থেকে মুক্তার মতো বেরিয়ে আসছেন সু-প্রিয়া সুঈ সীন! ১৯০৯ খৃস্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ায় যাদু-প্রদর্শনের সময় এ খেলাটি ছিল সু-র অন্যতম প্রধান খেলা।

কামানের খেলাটিও চমৎকার। দুপাশে দুই চাকাওয়ালা কামান গড়িয়ে গড়িয়ে আনা হল স্টেজের মাঝখানে। দুজন সহকারী কামানের মুখের ভেতর একটি মস্ত গোলা পুরে দিলেন। লম্বা চওড়া চুং লিং সু ছোটোখাটো সুঈ সীনকে অবলীলাক্রমে দুহাতে শূন্যে তুলে যেন জোর করেই কামানের মুখের ভেতর পুরে দিলেন। সুঈ সীন কামান-গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে যেতেই চুং লিং সুর ইঙ্গিতে কামান দাগা হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে কানে তালা লাগান প্রচণ্ড আওয়াজ। দর্শকমহলে ভীতি, উদ্বেগ, শিহরণ ইত্যাদি। কামানের গোলাটা আর সুঈ সীন বেচারা কোথায় গিয়ে পড়বে কে জানে? গোলাটা কিছু দূর উঠেই স্টেজের ওপর পড়ে গেল। কিন্তু কোথায় গেলেন শ্রীমতী সুঈ সীন? হঠাৎ বিস্ময়ের সমবেত গুঞ্জরন শোনা গেল দোতলায় দামী আসনের সারিগুলো থেকে। সেইখানে দাঁড়িয়ে হাসছেন সুঈ সীন। হাসিমুখে তিনি বিলোতে শুরু করলেন চুং লিং সু-র ছবি-ওয়ালা পোস্টকার্ড। কিন্তু কামানের ভেতর থেকে অদৃশ্য হয়ে উনি ওখানে গিয়ে পৌছলেন কি করে?

আরেকটি খেলা। একটি নিচু টেবিল স্টেজে এনে রাখা হল পাদ-প্রদীপের সামনে। তার ওপর দাঁড়ালেন শ্রীমতী সুঈ সীন! শ্রীমতীকে ঢেকে ফেলা হল একটা ফাঁপা ঢাকনা দিয়ে। তারপর ঢাকনাটা তুলে ফেলতেই দেখা গেল শ্রীমতী অদৃশ্য, তার জায়গায় একটা গাছে বোঁটায় বোঁটায় ঝুলছে কমলালেবু! কাঁচি

দিয়ে বোঁটা কেটে একটি-একটি করে অনেকগুলো কমলালেবু চুং লিং সু ছুঁড়ে দিলেন প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন অংশে দর্শকদের হাতে। কিন্তু সুঙ্গ সীন গেলেন কোথায়? কোনোরকমে গুটিসুটি মেরে টেবিলের তলায় লুকিয়ে নেই তো? না না, ঐ তো শ্রীমতী নেপথ্য থেকে মঞ্চে প্রবেশ করছেন মৃদু ছন্দে পা ফেলে ফেলে। কিন্তু এ অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সম্ভব হলো?

তীর দিয়ে লক্ষ্যভেদের খেলাটা তো রীতিমত লোমহর্ষক। স্টেজের এক ধারে একটি চাঁদমারী। অন্যদিকে যাদুকর চুং লিং সু-র হাতে গজখানেক লম্বা একটি ইস্পাতের ফলা বসানো তীর। ধনুকের ছিলায় তীরের যে দিকটা বসানো হয়, সেদিকটার সঙ্গে একটি লম্বা ফিতে এঁটে দিলেন যাদুকর। তারপর একি? তীর আছে ধনুক নেই কেন? ধনুকের অভাবে বন্দুকের নলের ভেতরই ফিতে-ওয়ালা তীরটা পুরে দেওয়া হল। বন্দুক হাতে স্টেজে চাঁদমারীর বিপরীত দিকে হাঁটু গেড়ে বসে চাঁদমারীর কেন্দ্রবিন্দুটিকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়বার জন্য তৈরি হলেন চুং লিং সু। সেই কেন্দ্রবিন্দু লক্ষ্য করে তীর যে পথে ছুটবে, ঠিক সেই পথের মাঝখানে দাড়িয়ে শ্রীমতী সুঙ্গ সীন। তাকে য়েন একটু ভীতা, সন্ত্রস্তা দেখা যাচ্ছে। খুবই স্বাভাবিক। কারণ তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করবেনই চুং লিং সু। অবস্থা সঙ্গীন। থেমে গেল অর্কেস্ট্রা সংগীত। সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে গভীর নিস্তব্ধতা। বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন যাদুকর। দুম করে আওয়াজ হলো বন্দুকের, শোনা গেল সুঙ্গ সীনের অর্ধস্ফুট আর্তনাদ। সব কিছু ছাপিয়ে শোনা গেল বায়ুপথে উড়ন্ত তীরের যাত্রার ধ্বনি। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল তীরটি লক্ষ্যভেদ করেছে, চাঁদমারীর ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে বিঁধে দুলছে প্রচণ্ড ধাক্কায়। তীরটি শ্রীমতী সুঙ্গ সীনকে এফোঁড় ওফোঁড় ভেদ করে চলে গেছে নিশ্চয়ই! তা নইলে লক্ষ্য ভেদ করল কি করে? পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ফিতেটা শ্রীমতীর দেহ ভেদ করে চলে গেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য পর্দা। তারপরই হাসিমুখে পর্দার এপারে এসে দর্শকদের উদ্দেশে অভিবাদন জানালেন চুং লিং সু আর সুঙ্গ সীন। কিছুই হয়নি সুঙ্গ সীনের। স্বস্তিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন দর্শকবৃন্দ, কিন্তু এ অদ্ভুত ব্যাপারটা সম্ভব হল কি করে?

হাওয়া থেকে মাছ ধরার খেলাটিও (Aerial Fishing) চুং লিং সু-র হাতে আশ্চর্য মায়াজালের সৃষ্টি করত। এ-খেলায় মাছ ধরবার ছিপ হাতে নিয়ে প্রবেশ করে বঁড়শিতে টোপ গেঁথে চুং লিং সু দর্শকদের চোখের সামনে হাওয়া থেকে বঁড়শিতে সোনালি মাছ ধরতেন। হঠাৎ কি করে কোথা থেকে এসে বঁড়শির

ডগায় ধরা পড়ে ছটফট করছে সোনালি মাছ, তাই ভেবে ভেবে দর্শকেরা কূল-কিনারা পেতেন না। বঁড়শি থেকে অতি সন্তর্পণে মাছটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটা কাচের জলপাত্রে ছেড়ে দিতেন যাদুকর; মাছটা চমৎকার সাঁতার কেটে বেড়াত। এভাবে বঁড়শিতে একটির পর একটি করে বেশ কয়েকটি মাছ ধরে জলপাত্রে ছেড়ে দিতেন চুং লিং সু। সত্যিকারের জলজ্যান্ত মাছ, নকল মাছ নয়। উনিশ শতকের শেষদিকে কোনো কোনো যাদুকর (বিখ্যাত মার্কিন যাদুকর হ্যারি কেলার তাঁদের একজন বলে শুনেছি) এ খেলাটি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু চুং লিং সু-র হাত পড়ার আগে এ খেলা তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। চুং লিং সু এ খেলা দেখাতে শুরু করার পর অনেক যাদুকর তাঁর নকল শুরু করেন, কিন্তু কোনো নকলই আসলের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। কী কৌশলে চুং লিং সু এই আশ্চর্য খেলাটি দেখান, অনেক মহলে অনেক গাঁজাখুরি জল্পনা-কল্পনাও হয়েছিল তাই নিয়ে।

চুং লিং সু ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৯১৭ খৃস্টাব্দের প্রথমার্ধে। সেই প্রথম, সেই শেষ। তাঁর খেলা স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। স্বনামধন্য যাদুকর "রয় দি মিস্টিক" (ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়) আমার প্রশ্নের জবাবে তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন :

"বিদেশী যাদুকরদের মধ্যে চুং লিং সু-র খেলাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার খেলাতে ম্যাজিক দেখিতেছি বলিয়া মনে হয় নাই, মনে হইতেছিল যে স্বপ্ন দেখিতেছি, এমনই অপূর্ব তাঁহার খেলা। বহু 'ইলিউশন' (বড় খেলা) একটার পর একটা করিয়া তিনি দেখাইতেন। ইলিউশনগুলির ফাঁকে ফাঁকে নানাপ্রকার ছোটো ও মাঝারি খেলা এমন নিপুণভাবে দেখাইতেন যে, দর্শকগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইত। তাঁহার হাতে 'চাইনিজ লিংকিং রিঙ্‌স' (Chinese Linking Rings) এক বিস্ময়কর ব্যাপার। ভাষায় তাহা বোঝান যায় না। তাঁহার 'ইলিউশন'-গুলির মধ্যে 'পীপ্‌লস্ অব অল নেশনস্' (বিভিন্ন জাতির বা দেশের মানুষ) এবং 'ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড' (ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক) আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লাগিয়া ছিল। চীনা সাজ-সজ্জায় তিনি খেলা দেখাইতেন, কোনও প্রকার কথা বলিতেন না, আভাসে ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ করিতেন। প্রত্যেকটি খেলা দেখাইবার পর তাঁহার হাসিটি দর্শকের চিত্ত জয় করিয়া নিত। ঐরূপ মনোমুগ্ধকারী হাসি আর কোথাও দেখি নাই।"

উপরে উল্লিখিত 'পীপ্‌লস্ অব অল নেশনস্' (অথবা 'দি ওয়ার্লড অ্যাণ্ড ইট্‌স্

পীপ্‌ল্‌') খেলাটি চুং লিং স্থ-র একটি অনবদ্য সৃষ্টি। স্টেজের মাঝামাঝি রাখা হত পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা একটি 'গ্লোব' (গোলক)—সেটির ব্যাস বা খাড়াই চার ফুট। গ্লোবটি ধীরে ধীরে ঘোরাতেন চুং লিং স্থ, আর এক-একবার খানিক-ক্ষণের জন্য গ্লোবের গায়ে একটি দরজা খুলে ধরতেন। ভিন্ন ভিন্ন বারে হল্যাণ্ড, আফ্রিকা, ব্রিটেন, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের এক-একজন মানুষ (কখনো মেয়ে, কখনো বা পুরুষ), গ্লোবের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেন যার যার দেশের বিশিষ্ট জাতীয় পোশাক পরে। প্রত্যেক দেশের মানুষ বেরিয়ে আসবার আগে সে দেশের জাতীয় পতাকাও গ্লোবের ভেতর থেকে বার করতেন চুং লিং স্থ। চীন দেশের মানচিত্রের কাছে গ্লোবটিকে থামিয়ে চুং লিং স্থ যখন গ্লোবটিকে একটু ফাঁক করে চীনদেশের জাতীয় পতাকা বার করে আনতেন, তার ঠিক পরেই গ্লোবের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেন চীনা পোশাকে সজ্জিতা শ্রীমতী স্থঈ সীন। খেলাটি যেমন চমৎকার জমকালো, নানা রঙের বাহারে নয়নাভিরাম, তেমনি দর্শকদের মন বিস্মিত হত এই ভেবে যে ঐটুকু ছোটো গ্লোবের ভেতর ছোটোখাটো একজন মানুষেরই কোনো রকমে জায়গা হতে পারে, দশ, বারোজন লোক ওর ভেতর থেকে বেরোলো কি করে?

এবার ফিরে আসা যাক ২৩শে মার্চ, ১৯১৮ তারিখের রাতে, উডগ্রীন এম্পায়ার রঙ্গালয়ে। জাপানী কামেতারোর খেলা দেখান শেষ হয়ে গেছে। এবারে শুরু হবে আজকের রাতে চুং লিং স্থ-র শেষ খেলা।

আবার স্টেজের সামনে ওপরদিকে উঠে গেল জমকালো রঙিন যবনিকা। স্টেজ ফাঁকা। নেপথ্যে যন্ত্রসংগীত উঁচু থেকে নিচুতে নেমে এল, মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে। তারপর সমবেত পদক্ষেপের আওয়াজ। পেছনের আড়াল পার হয়ে এগিয়ে এসে স্টেজের দুধারে দাঁড়াল চীনদেশী জমকালো সামরিক পোশাকে সজ্জিত দুই সারি চীনা সৈনিক। তারপর অনেকগুলো ভেরী বেজে উঠল, দুই সারি সৈনিকের মধ্য দিয়ে সোনালি রঙের সুন্দর পালকিতে চড়ে এসে পাদপ্রদীপের সামনে নেমে দাঁড়িয়ে দর্শকবৃন্দকে সস্মিত অভিবাদন জানালেন চীনা মান্দারিনের জমকালো আলখাল্লা পরা "বিস্ময়কর চীনা যাদুকর" চুং-লিং-স্থ।

দর্শকদের পরীক্ষিত দুটি বুলেট পোরা হলো দুটি বন্দুকে। মঞ্চের একধারে দাঁড়ালেন দুজন বন্দুকধারী; চুং-লিং-স্থ দাঁড়ালেন তাঁদের উলটো দিকে, দুটি বন্দুকের উদ্যত নলের মুখোমুখি। শ্রীমতী স্থঈ সীন তাঁর হাতে তুলে দিলেন একটি চীনেমাটির প্লেট। প্লেটটা বুকের সামনে এগিয়ে ধরে তাই দিয়ে বন্দুকের

বুলেট আটকাবার জন্য তৈরি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন চুং লিং সু। ইঙ্গিত পেলেই বন্দুকের ঘোড়া টিপবে দুজন বন্দুকধারী। আওয়াজ করে ধোঁয়া ছেড়ে ছুটবে এক জোড়া বুলেট।

দর্শক মহলের ভেতর অনেকেই চুং লিং সু-র এ খেলা অনেকবার দেখেছেন; সবাই জানেন চুং লিং সু-র হাতে ধরা চীনে মাটির প্লেটে বাধা পেয়ে বুলেট দুটো পড়ে যাবে স্টেজের ওপর, তুলে দেখা যাবে এ দুটো সত্যিই দর্শকদের চিহ্নিত বুলেট। তবু সারা হল নিস্তব্ধ, সবারই হৃদয়ে উদ্বেগ। যদি দৈবাৎ তাঁদের প্রিয় যাদুকরের কোনো বিপদ ঘটে যায়?

ইঙ্গিত করলেন চুং লিং সু, ঈষৎ মাথা হেলিয়ে। আগেকার প্রত্যেকবারের মতই আওয়াজ করে ছুটলো বুলেট, কিন্তু আজ আর প্লেটে ধরা পড়ল না। হঠাৎ কেঁপে উঠে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন বিনা মেঘে বজ্রাহতের মত, তারপর মঞ্চের পর লুটিয়ে পড়লেন চুং লিং সু। পর্দা ফেলে দেওয়া হল। শেষ হয়ে গেল রাতের প্রদর্শনী। শেষরাতে শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন অনন্য যাদুকর চুং লিং সু, বন্দুকের গুলি চলে গিয়েছিল তাঁর ফুসফুস ভেদ করে।

রবিবার ভোরবেলা খবরের কাগজে-কাগজে প্রকাশিত হল শোক-সংবাদ: চুং লিং সু আর ইহজগতে নেই। সেইসঙ্গে আরেকটি বিস্ময়কর খবর: চুং লিং সু আসলে চীনাও নন, চুং লিং সু-ও নন, তিনি চীনা ছদ্মবেশে একজন মার্কিন যাদুকর, তাঁর আসল নাম উইলিয়াম এল্‌স্‌ওয়ার্থ রবিনসন (William Ellsworth Robinson)।

দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে চীনা যাদুকর চুং লিং সু-র ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে তাঁর যাদুমুগ্ধ অগণিত দর্শকের চোখে অনায়াসে ধুলো দিয়ে এসেছেন মার্কিন যাদুকর উইলিয়াম রবিনসন। যাদুজগতে এমন সফল, সার্থক অভিনেতা আর জন্মান নি।

তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অলিভ (Olive) রবিনসন চীনা নারীর ছদ্মবেশে "সুঈ সীন" ছদ্মনামে যাদুকর স্বামীর যাদু-সহকারিণীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কুমারী জীবনে তিনি ছিলেন অলিভ পাথ, বোস্টন শহরের একটি থিয়েটার কোম্পানির নৃত্য এবং সংগীত-শিল্পী।

চুং লিং সু-র মৃত্যু-রহস্য নিয়ে অনেকদিন ধরে নানা মহলে জল্পনা-কল্পনা চলেছিল। চুং লিং সু নিজে কিছু বলে যেতে পারেননি মরবার আগে; বলতে পারার মত অবস্থা তাঁর ছিল না। এ মৃত্যুর তিনরকম ব্যাখ্যা হয়েছে:—

(১) চুং লিং সু-র মৃত্যুর কারণ আকস্মিক দুর্ঘটনা।

(২) চুং লিং সুকে এভাবে হত্যা করা হয়েছিল ঈর্ষা, প্রতিহিংসা অথবা ঐ জাতীয় অন্য কোনো কারণে।

(৩) চুং লিং সু আর্থিক, মানসিক বা অন্য কোনো কারণে জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে আত্মহত্যার এই বিচিত্র উপায়টি বেছে নিয়েছিলেন।

যাদু-জগতে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে দুর্ঘটনাই চুং লিং সু-র মৃত্যুর কারণ। তবু আজও অনেকেরই মনে সংশয় থেকে গেছে—তাঁদের কাছে চুং লিং সু-র মৃত্যু আজও রহস্যময়, যে রহস্যের সমাধান হবে না কোনোদিন।

আরেকবার ভারতে এসে বেশীদিন ধরে খেলা দেখাবার পরিকল্পনা করেছিলেন চুং লিং সু। সে আসা তাঁর আর হল না।

এই মারাত্মক খেলাটি যাঁদের প্রাণ নিয়েছে, তাঁদের ভেতর সর্বপ্রধান, সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে বিচিত্রজীবন এবং সবচেয়ে প্রতিভাবান অতুলনীয় যাদুকর চুং লিং সু। চুং লিং সু মানে "ডবল সৌভাগ্য"। এই "ডবল সৌভাগ্য" নামধারী যাদুকরকেই যাদু-রঙ্গমঞ্চে বন্দুকের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস!

চুং লিং সু-র মৃত্যুকাহিনী বললাম। এইবার বলি তাঁর জীবনকাহিনী, যা তাঁর মৃত্যুকাহিনীর চাইতে কম রোমাঞ্চকর নয়।

গোড়া থেকেই শুরু করি। উইলিয়াম এল্‌স্‌ওয়ার্থ রবিনসন (William Ellsworth Robinson) জন্মগ্রহণ করেছিলেন নিউ ইয়র্ক শহরে ১৮৬১ খৃস্টাব্দে। উনিশ-কুড়ি বছর বয়স থেকেই তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে যাদুর খেলা দেখাতে শুরু করেন। তাঁর ভাণ্ডারে ছিল কিছু হস্ত-কৌশলের খেলা, কিছু ভুতুড়ে খেলা, কিছু চিন্তা-পাঠের খেলা (Mind Reading)। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে তিনি একটি তরুণী নৃত্য ও সংগীত-শিল্পীর সংস্পর্শে আসেন। তরুণীটির নাম অলিভ পাথ (Olive Path), খুব ছোটোখাটো বলে তাঁর ডাক নাম ছিল "ডট" (Dot)। ডট পাথ হয়ে গেলেন ডট রবিনসন। উইলিয়াম এবং ডট দুজনে মিলে মাথা খাটিয়ে মেহনত করে এবং রিহার্সাল দিয়ে যে খেলার প্রোগ্রাম তৈরি করলেন তা তখনকার রঙ্গজগতে অভিনব। দর্শকদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করার যে পদ্ধতির ভিত্তিতে তাঁদের এই প্রোগ্রাম তৈরি হয়েছিল, তাই "ব্ল্যাক আর্ট" নামে পরিচিত।

উইলিয়াম রবিনসন নিজেকে এই পদ্ধতির আবিষ্কারক বলে দাবি করতেন।

কিন্তু "ব্ল্যাক আর্ট" পদ্ধতির মূল আবিষ্কারক প্রকৃতপক্ষে ম্যাক্স্ আউজিঙ্গার (Max Auzinger) নামে একজন জার্মান। তিনি একটি রঙ্গালয়ে অভিনয় করতেন এবং স্টেজ ম্যানেজার অর্থাৎ মঞ্চাধ্যক্ষের কাজও করতেন। কিভাবে এই চমৎকার পদ্ধতিটি তাঁর মাথায় হঠাৎ এসেছিল, সে এক মজার কাহিনী। আউ-জিঙ্গারের পরিচালনায় একটি নতুন নাটক অভিনীত হচ্ছিল। তার একটি দৃশ্যে দেখা গেল নিষ্ঠুর পিতা তাঁর অবাধ্য কন্যাকে শায়েস্তা করবার জন্য রেখেছেন আঁধার কারাকক্ষে বন্দিনী করে। বেচারা যেদিকে তাকায় সেইদিকেই কালো দেওয়াল। কারাগারের বীভৎসতা খুব ভাল করে ফুটিয়ে তুলবার জন্য মঞ্চাধ্যক্ষ আউজিঙ্গার মঞ্চের তিনদিকই কালো, মখমলের পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন। মেয়েটির পাষাণ-হৃদয় পিতৃদেবের একটি কোমল-হৃদয় নিগ্রো ক্রীতদাস ছিল; তার সারা দেহ আবলুশ কাঠের মত কালো হলেও মনটি ছিল শাদা। তার প্রাণ কেঁদে উঠল বন্দিনী লুসির বেদনায়। কারাকক্ষের ছাদের কাছাকাছি জানালা, বন্দিনী লুসির নাগালের অনেক উঁচুতে। সেই জানলা-পথে ঝুলিয়ে দেওয়া দড়ির মই বেয়ে কারাকক্ষের ভেতর নেমে এল সেই কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাস, লুসিকে বন্দিনী দশা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে বলে। ক্রীতদাসটির এই আকস্মিক নাটকীয় আবির্ভাবে দর্শকমহলে সাড়া জাগবার কথা, কিন্তু ম্যাক্স্ আউজিঙ্গার দেখলেন কী আশ্চর্য, সাড়ার নাম-গন্ধও নেই। ব্যাপার কি? তখন মঞ্চের নেপথ্য থেকে মঞ্চের দিকে তাকাতেই এক মুহূর্তে ব্যাপারটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি দেখলেন কালো পোশাক পরা কালো নিগ্রোটির দেহের আর পোশাকের কালো রং স্বল্পালোকিত মঞ্চের তিন পাশের কালো মখমলের পর্দার রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে সে চলাফেরা করা সত্ত্বেও তাকে চোখে দেখা যাচ্ছে না, শুধু সে যখন মুখ খুলছে তখন তার শাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে; অর্থাৎ পেছনের আর দু'পাশের কালোর সঙ্গে শরীরের আর পোশাকের কালো মিশে গিয়ে দেখা যাচ্ছে না, দাঁত দেখা যাচ্ছে শাদা বলে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্স্ আউজিঙ্গারের মাথায় খেলে গেল "ব্ল্যার্ক আর্ট"-এর মূল তত্ত্ব। এরই ওপর ভিত্তি করে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ম্যাক্স্ আউজিঙ্গার "ব্ল্যাক আর্টে"র খেলা প্রথম দেখালেন বার্লিন শহরের একটি রঙ্গালয়ে, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের জুন মাসে।

উইলিয়াম রবিনসন তাঁর "ব্ল্যাক আর্টে"র খেলা দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন "আক্মেদ বেন আলি" (Achmed Ben Ali) ছদ্মনামে, প্রাচ্য-গন্ধী নাম দর্শক মহলকে আরো বেশি আকর্ষণ করবে বিবেচনা করে। বোধ করি অনুরূপ

কারণেই ম্যাক্স্ আউজিঙ্গার তাঁর "ব্ল্যাক আর্টে"র খেলা দেখাতেন "বেন আলি বে" (Ben Ali Bey) ছদ্মনামে। "আকমেদ বেন আলি" ছদ্মনামা রবিনসনের এই নতুন ধরনের খেলার খ্যাতি যাদুজগতে এমন ছড়িয়ে পড়ল, যে তখনকার দুজন সেরা মার্কিন যাদুকর আলেকজাণ্ডার হারম্যান (Alexander Herr-mann) এবং হ্যারি কেলার (Harry Kellar)—পরলোকে গিয়েও যাঁরা যাদু-জগতে আজও খ্যাতিমান রয়েছেন—তাঁকে নিজের দলে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত রবিনসন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যোগ দিলেন হ্যারি কেলারের দলে।

কেলার ছিলেন যেমন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যাদু প্রদর্শক, তেমনি ছিল তাঁর দূরদৃষ্টি আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তিনি যে রবিনসনকে নিজের দলে টানলেন, তার কারণ শুধু রবিনসনের "ব্ল্যাক আর্ট" নয়। কেলার জানতেন রবিনসনের যাদু-উদ্ভাবনী বুদ্ধি এবং সেই সঙ্গে তাঁর হাতের কারিগরি দক্ষতা অসাধারণ। রবিনসন যে কেলারের দলে ঢুকলেন তা শুধু তাঁর "ব্ল্যাক আর্ট" নিয়ে নয়; কেলারের প্রোগ্রামে রবিনসনের তৈরি অন্যান্য কয়েকটি বিস্ময়কর খেলাও যুক্ত হল। "ব্ল্যাক আর্টে"র খেলায় রবিনসন আগে ছিলেন "আক্‌মেদ বেন আলি", কেলারের দল ছেড়ে যখন আলেক্‌জাণ্ডার হারম্যানের দলে যোগ দিয়েছিলেন, তখন হয়েছিলেন "আবদুল খাঁ।"

সে সময়ে পরলোক আর প্রেততত্ত্ব নিয়ে মার্কিন মুলুকের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর আলোচনা আর গবেষণা চলেছিল। লোকান্তরিত প্রিয়জনের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের স্বাভাবিক কামনায় অনেকে মিডিয়ামের সাহায্য গ্রহণ করতেন। এই সুযোগে অনেক চতুর পুরুষ এবং চতুরা নারী মিডিয়ামগিরির ভান করে লোক ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করতেন, অর্থাৎ প্রিয়জনবিয়োগে যাঁরা ব্যথিত, তাঁদের পকেট মারতেন লোকান্তরিত আত্মা নামিয়ে আনার ভাঁওতা দিয়ে। বিভিন্ন কৌশলে এই ভুয়ো মিডিয়ামের দল এমন সব অদ্ভুত ব্যাপার করে দেখাতেন, যা দেখে মুগ্ধ দর্শকরা ভাবতেন ভৌতিক সাহায্য ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে এ ধরনের ব্যাপার ঘটানো অসম্ভব, সুতরাং এই মিডিয়ামরা সত্যি সত্যি আত্মা আনতে পারেন এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। তরুণ যাদুকর উইলিয়াম রবিনসন এই মিডিয়ামী ভাঁওতা সম্বন্ধে প্রচুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে-ছিলেন, পরে এদের ব্যবহৃত গুপ্তকৌশলগুলি ব্যাখ্যা করে একটি গ্রন্থ রচনা করবেন বলে। (ভুতুড়ে স্লেটের লেখা এবং অন্যান্য ভৌতিক খেলা সম্বন্ধে-

রবিনসন রচিত গ্রন্থখানা এই জাতীয় গ্রন্থের সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।)

ভূয়ো মিডিয়ামদের ব্যবহৃত নানা কৌশল রবিনসন তাঁর যাদুর খেলায় কাজে লাগাতেন। ভুতুড়ে খেলায় অমন অভিজ্ঞ রবিনসনকে দলে পেয়ে হ্যারি কেলার যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি যেখানেই তাঁর যাদু-প্রদর্শন করতেন সেখানেই তাঁর প্রোগ্রামের একটি অংশে শুধু ভুতুড়ে খেলা দেখিয়ে প্রমাণ করতেন ভৌতিক মিডিয়ামরা খাঁটি ভৌতিক ব্যাপার বলে যা দেখান তা প্রকৃতপক্ষে ফাঁকির খেলা বা ভেল্‌কি মাত্র, ভূত বা আত্মার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। মিডিয়াম-জব্দ-করা নকল-ভুতুড়ে যাদুক্রীড়ার উদ্ভাবনে এবং প্রদর্শনে রবিনসন হলেন তাঁর অমূল্য দক্ষিণ হস্ত।

১৮৯৩ সালে কেলারের দল ছেড়ে রবিনসন দম্পতি যোগ দিলেন মার্কিন যাদু জগতের আরেকজন দিক্‌পাল, আলেকজাণ্ডার হারম্যানের (Herrmann the Great) দলে। হারম্যানের সাহচর্যেই রবিনসনের প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটল। হারম্যানের অভিনয় প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ ; তিনি সযত্নে শিক্ষা দিয়ে রবিনসনকে আদর্শ সহকারীরূপে গড়ে তুললেন। হারম্যানের শিক্ষায় রূপসজ্জায় এবং অভিনয়ে রবিনসন এমন দক্ষ হয়ে উঠলেন যে মাঝে মাঝে তিনি যখন হারম্যানের ছদ্মবেশে মঞ্চে যাদু-প্রদর্শন করতেন, তখন দর্শকরা তাঁকে ভুল করতেন আসল হারম্যান বলে। কিন্তু রবিনসন-হারম্যান সহযোগিতা বেশিদিন টিকল না। হারম্যান মারা গেলেন ১৮৯৬ সালে। তাঁর যাদু-প্রদর্শনীর উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লিওন হারম্যান এবং পত্নী শ্রীমতী অ্যাডিলেইড হারম্যান (Adelaide Herrmann)। এঁদের দলে কিছুদিন থেকে তারপর সস্ত্রীক বেরিয়ে এলেন রবিনসন, স্বাধীনভাবে যাদু-প্রদর্শন করতে লাগলেন "রহস্যময় রবিনসন" নামে।

কিছুদিন বেশ অসুবিধাই ভোগ করতে হল তাঁকে, কারণ যাদুকর মহলে তাঁকে অসামান্য প্রতিভা বলে জানলেও দর্শকমহলে রবিনসন নামটির তেমন প্রচার ছিল না। তাছাড়া মার্কিন দেশে তখন দেশী যাদুকর ছাড়াও বিদেশী যাদুকর প্রচুর আসছেন যাদু দেখাতে।

এই বিদেশী যাদুকরদের ভেতর একজন ১৮৯৯ সালের মে মাসে মার্কিন মুলুকে পা দিয়েই প্রমোদ-জগতে অভূতপূর্ব সাড়া জাগালেন। ভদ্রলোক একজন খাঁটি চীনা যাদুকর, নাম চী লিং কোয়া। চী লিং কোয়া-র মার্কিন ব্যবস্থাপকবৃন্দ ভেবে

দেখলেন প্রমোদ-জগতে, বিশেষ করে যাদু-জগতে, নামের যাদুর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। "চী লিং কোয়া" নামটা তেমন শ্রুতিমধুর বা আকর্ষণীয় নয়। সুতরাং চী লিং কোয়া নাম বদলে হলেন "চিং লিং ফু" (Ching Ling Foo)।

নিউ ইয়র্ক শহরের একটি বিশিষ্ট রঙ্গালয়ে যাদু-প্রদর্শন শুরু করলেন খাঁটি চীনা যাদুকর চিং লিং ফু ও সম্প্রদায়। মার্কিন জনসাধারণের কাছে এই প্রাচ্য যাদু-প্রদর্শনী হলো এক অসাধারণ নতুন জিনিস। এই অসাধারণ নূতনত্বই হলো চিং লিং ফু'র যাদু-প্রদর্শনীর সব চেয়ে বড় আকর্ষণ।

চীনা আলখাল্লা প'রে মঞ্চে আবির্ভূত হতেন চিং লিং ফু। তাঁর প্রধান খেলা ছিল শূন্য থেকে জলভরা একটি বড় পাত্র যাদুমন্ত্রে বার করা। (আসলে অবশ্য সেটা বেরোতো তাঁর বিরাট আলখাল্লার ভেতর থেকে)। তাঁর আরেকটি আশ্চর্য খেলায় তিনি একটি রেশমী শাল ঘুরিয়ে ফিরিযে খালি দেখিয়ে সেই শালের তলা থেকে একটি মানবশিশু বার করতেন। এই শিশুটিও আসতো তাঁর আলখাল্লারই ভেতর থেকে। অবশ্য চিং লিং ফু এমন দক্ষতার সঙ্গে এদের বার করতেন যে দর্শক সাধারণ বিস্ময়ে মুগ্ধ হত। প্রাচ্য জাঁকজমকপূর্ণ এমন যাদু-প্রদর্শনী মার্কিন মুলুকে আর কখনো দেখা যায়নি। একে অভিনব, তাঁর ওপর চিং লিং ফু ছিলেন সত্যিকারের দক্ষ যাদুশিল্পী। তাই চার মাসের ওপর একই রঙ্গালয়ে চলল চিং লিং ফুর প্রাচ্য যাদু প্রদর্শনী, তবু দর্শকের ভিড় কমবার কোনো লক্ষণ নেই।

এই অসামান্য সাফল্যেই কি চিং লিং ফুর মাথা ঘুরে গেল? তিনি একটি পাগলামি করে বসলেন। চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে দিলেন তাঁর এই শূন্য থেকে জলভরা পাত্র বার করার খেলা যে কেউ নকল করে দেখাতে পারবে তাকেই তিনি এক হাজার ডলার পুরস্কার দেবেন। প্রচার, প্রোপাগাণ্ডা বা পাবলিসিটি স্টান্ট হিসেবে এ ধরনের চ্যালেঞ্জের দাম আছে. কিন্তু চিং লিং ফুর বেলায় এর কিছুমাত্র দরকার ছিল না, কারণ রাতের পর রাত এমনিতেই দর্শকের ভিড় হচ্ছিল প্রচণ্ড. তাছাড়া এই রঙ্গালয়ের পর আমেরিকার নানা স্থানে তাঁর যাদু-প্রদর্শনের জন্য বেশ লম্বা মেয়াদী চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, বিধাতার বিধানেই বিচিত্র খেয়াল জাগলো সাফল্যগর্বী চীনা যাদুকর চিং লিং ফুর মনে। তাঁর এই এক হাজার ডলারের চ্যালেঞ্জ বেশ বড়ো হরফের শিরোনামা দিয়ে ছাপা হল কাগজে কাগজে।

চট করে খ্যাতি আর মর্যাদা বাড়াবার আর সেই সঙ্গে এক হাজার ডলার

রোজগারের এমন চমৎকার সুযোগ ছেড়ে দিলেন না উইলিয়াম রবিনসন। তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। (শোনা যায় রবিনসন নাকি চিং লিং ফু যে রঙ্গালয়ে যাদুপ্রদর্শন করছিলেন সেখানে এক সন্ধ্যায় একটা বড় বাক্‌সে চীনা আলখাল্লা এবং বড় জলের পাত্র নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন খেলা দেখাবেন বলে)। পিছিয়ে গেলেন চিং লিং ফু। কাগজে তাঁর চ্যালেঞ্জের ঘোষণা ছাপা বন্ধ করে দিলেন। ঘোষিত পুরস্কার পাবার সুযোগ পেলেন না যাদুকর রবিনসন। চিং লিং ফুর এই অন্যায়, অশোভন, অভদ্র, কাপুরুষোচিত ব্যবহারে ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হলেন তিনি। কিন্তু এ নিয়ে তখন মামলা-মোকদ্দমা বা অপর কোনোরকম গোলমাল করলেন না। তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

এর পরের বছরের একটি সন্ধ্যা। পারী শহরের একটি বিশ্ব-বিখ্যাত রঙ্গালয়ে (Folies Bergere) চিং লিং ফুর অনুকরণে যাদু-প্রদর্শন করবেন যাদুকর হপ সিং লু (Hop Sing Loo) ও সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে খাঁটি চীনদেশের মানুষ শুধু সার্কাসী কসরতের শিল্পী (acrobat) ফী লুঙ (Fee Lung)। হপ সিং লু দম্পতি আসলে শ্রীমান উইলিয়াম ও শ্রীমতী ডট রবিনসন। প্রায় বিশ বছর ধরে পাশ্চাত্য ভঙ্গিতে পাশ্চাত্য পোশাক পরে যাদুর খেলা দেখিয়ে আসছেন রবিনসন, এখন একেবারে ভোল পাল্‌টে চীনা পোশাকে চীনা ভঙ্গিতে চীনা যাদুকরের ভূমিকায় অভিনয় করে যাদু দেখাতে হবে। ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। একে বলা যায় 'রেভোলিউশনারি চেঞ্জ', বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। ফী লুঙের কাছে রবিনসন দম্পতি বেশ কয়েকদিন ধরে তালিম নিয়েছেন চীনা পোশাক পরার, চীনা কায়দায় চলাফেরা অঙ্গভঙ্গি হাবভাবের, যেন নকল বলে ধরা না পড়তে হয়।

মঞ্চে তখন দুই কুস্তিগীরের লড়াই চলছে। তাঁদের মধ্যে একজন রাশিয়ার বিশ্ব-বিখ্যাত কুস্তিগীর হ্যাকেনস্মিট : তিনি যেমন সুপুরুষ, তেমনি শক্তিমান, তেমনি সাহসী, তেমনি অসামান্য জনপ্রিয়। প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত দর্শক উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে কুস্তি দেখছে।

হ্যাকেনস্মিট এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর কুস্তি-লড়াইর পরই আসবে হপ সিং লুর পালা। চীনা ছদ্মবেশ পরে রবিনসন হয়ে গেলেন হপ সিং লু। একেবারে আলাদা মানুষ। চীনা ধরনের হাসি, চীনা কায়দায় হাঁটা, চীনা ধরনের চোখের চাউনি—দেখে শ্রীমতী ডট রবিনসন (তিনিও চীনা রমণীর ছদ্মবেশে) বললেন "চমৎকার! বোঝাই যাচ্ছে না তুমি চীনাম্যান নও। মনে হচ্ছে আজ রাতে বাজিমাত করবে তুমি।"

শুনে বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন। হ্যাকেনস্মিটের কুস্তি শেষ হল, মঞ্চে প্রবেশ করলেন যাদুকর হপ সিং লু। খাঁটি চীনাম্যান যেন। ছোটোখাটো খেলাগুলো মোটামুটি চালিয়ে দেওয়া গেল, কিন্তু ফ্যাসাদ বাধলো চিং লিং ফুর সেই বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় খেলাটি দেখাতে গিয়ে—শূন্য থেকে একটি বড় জলপূর্ণ পাত্র বার করা। জলভরা পাত্রটি গোপনে ঝুলছিল হপ সিং লুর আলখাল্লার ভেতর, চিং লিং ফুর কায়দামতো। কিন্তু একটু আগেই জলপাত্রের ঢাকনাটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কারণ হ্যাকেনস্মিটের কুস্তি যখন চরমে উঠেছে তখন দর্শকমহলে উত্তেজনার হৈ-হল্লা শুনে লোভ সামলাতে না পেরে একজন মঞ্চকর্মী পিছন থেকে কুস্তি দেখবার জন্য ঐ সযত্নে রক্ষিত জলপাত্রটির ওপরই উঠে দাঁড়িয়েছিল। যদিও শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে কোনোরকমে কাজ চালিয়ে নেবার মত মেরামত করে নেওয়া হয়েছিল, তবু ঐ সামান্য ক্ষতিটুকুই অসামান্য ফ্যাসাদ বাধালো। হপ সিং লু একটি চাদর উল্টে-পাল্টে খালি দেখিয়ে একটি হাতের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন, উদ্দেশ্য—তারই আড়ালে দর্শকদের অজ্ঞাতসারে আলখাল্লার তলা থেকে জলভরা পাত্রটি বার করে এনে ঢাকনাটা খুলে ফেলবেন, আর সঙ্গে-সঙ্গেই চাদরটা সরিয়ে দেখিয়ে দেবেন যাদুমন্ত্রে শূন্য থেকে জলে ভরা একটি পাত্র আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু তার আগেই দুর্ভাগ্যবশত ঢাকনাটা আলগা হয়ে গিয়ে সবটুকু জল পড়ে গিয়ে স্টেজ ভেসে গেল, ভিজে গেল হপ সিং লুর আলখাল্লা আর আলখাল্লা তলায় লুকানো হাঁসগুলিও ঘাবড়ে গিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বিচিত্র ডাক ডাকতে শুরু করল। এক কথায় বলা চলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড।

পর্দা টেনে দেওয়া হল তাড়াতাড়ি। ওদিকে সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে প্রচণ্ড হাসি আর টিটকারির হল্লা চলছে। এমন পেটে খিল ধরানো হাসির ব্যাপার এ রঙ্গালয়ে আর কখনো দেখা যায়নি। রাগে, দুঃখে, অপমানে, লজ্জায় দাঁত কড়মড় করতে-করতে এলেন রঙ্গালয়ের ম্যানেজার। পরপর কয়েক রাত্রি যাদুর খেলা দেখাবেন হপ সিং লু, এই রকম কথা হয়েছিল। কিন্তু ক্ষিপ্ত ম্যানেজার মশাই বললেন "খুব হয়েছে, আর নয়। অদ্যই তোমার শেষ রজনী। তুমি এবার মানে-মানে বিদেয় হও।"

বিদেশে এসে প্রথম অভিনয়েই এই ধাক্কা খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখলেন উইলিয়াম আর ডট রবিনসন। গভীর হতাশায় ভরে উঠল তাঁদের দুজনের মন।

কিন্তু বিধাতা যখন অসামান্য সদয় হন, তখন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। এই

রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বাতিল হবার নোটিশ পাবার পর মুহূর্তেই এসে হাজির লণ্ডন শহরের রঙ্গজগতের একজন দালাল, বুকিং এজেন্ট। তিনি বললেন "আপনার স্টাইল আমার ভালো লেগেছে, মিস্টার লু। একটু ঘষামাজা করে নিলেই লণ্ডনে আপনার খেলা চমৎকার চলবে। আমি তার ব্যবস্থা করব।"

"কী আশ্চর্য! এই ব্যাপারের পরেও আপনি বলছেন···?"

ভদ্রলোক বললেন "আরে রাম রাম। এ তো হল আকস্মিক দুর্ঘটনার ব্যাপার। এতে আপনার দোষ কোথায়? যাকগে, আমার প্রস্তাবে আপনি রাজি তো?"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন রবিনসন ওরফে হপ সিং লু।

"কিন্তু" এজেন্ট ভদ্রলোক বললেন, "হপ সিং লু নামটা রঙ্গজগতের পক্ষে তেমন জুৎসই নয়। তাছাড়া নামটা খাঁটি চীনে নামও নয়। তার চাইতে বরং ···দাঁড়ান, ভেবে দেখি···হ্যাঁ, একটা নাম আমার মাথায় এসে গেছে—চুং লিং সু'। খাঁটি চীনা নামও বটে, রঙ্গজগতের পক্ষে বেশ জমাট গালভরা নামও বটে। তাছাড়া, এ নামের মানেটাও ভাল—ডবল সৌভাগ্য। রাজি?"

রাজি হলেন রবিনসন। অর্থাৎ হপ সিং লু রাজি হলেন আগামী হপ্তা থেকে চুং লিং সু হতে।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরে শুরু হল "চুং লিং সু"-র যাদু-জীবন। ১৯০০ সালের মাঝামাঝি লণ্ডনের "আলহামরা (Alhamra) রঙ্গালয়ে শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই অসামান্য সাফল্য লাভ করলো চুং লিং সুর যাদু-প্রদর্শনী। 'আলহামরা'-ই ছিল তখন লণ্ডন শহরের সেরা রঙ্গালয়। এখানে তিনমাসব্যাপী সাফল্যের ফলে যাদুকর চুং লিং সু রঙ্গ-জগতের এজেন্টদের পরম প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। প্রাচীরপত্রে এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপনে চুং লিং সু নিজেকে পরিচয় দিতেন বিস্ময়কর চীনা যাদুকর (Marvellous Chinese Conjurer) বলে। যেমন নিজেকে, তেমনি তাঁর প্রত্যেকটি খেলাকে এমনভাবে চীনা পোশাক পরাতেন তিনি, যে দর্শক সাধারণ তাঁর যাদু-প্রদর্শনীকে খাঁটি চৈনিক যাদু-প্রদর্শনী বলেই গ্রহণ করে নিয়েছিল।

১৯০৫ সালের একেবারে গোড়াতেই শুরু হল পরম কৌতুকময় পরিস্থিতি। নকল চীনা যাদুকর চুং লিং সুর বিরাট যাদু-প্রদর্শনী চলেছে লণ্ডনের হিপোড্রোম (Hippodrome) রঙ্গালয়ে। তারই অনতিদূরে এম্পায়ার রঙ্গালয়ে তাঁর প্রদর্শনী নিয়ে এলেন আসল চীনা যাদুকর চিং লিং ফু ও সম্প্রদায়। আসলে আর নকলে

বাধলো লড়াই। চিং লিং ফুর প্রদর্শিত অধিকাংশ খেলাই লণ্ডনের দর্শকরা গত পাঁচ বছর ধরে দেখে আসছেন চুং লিং সুর প্রদর্শনীতে। ফুর প্রদর্শনীতে নতুন বা মৌলিক কিছুই ছিল না। সুতরাং চীনা যাদুবিদ্যার প্রতিনিধিরূপে দর্শক সাধারণ গ্রহণ করলেন সুকেই, ফুকে নয়। তাঁরা যে ফুর প্রদর্শনী দেখতে যেতেন, তা শুধু 'দেখে আসা যাক এই নতুন লোকটি কি কি দেখাতে পারে' এই ভাবটুকু নিয়ে।

চিং লিং ফু চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করলেন "চুং লিং সু যদি আমার প্রোগ্রামের প্রধান খেলাগুলোর দশটি খেলাও দেখাতে পারে তাহলে আমি তাকে এক হাজার পাউণ্ড দেবো।" কাগজে-কাগজে এ নিয়ে বেশ লেখালিখি চললো। এই চ্যালেঞ্জে রবিবাসরীয় সংবাদপত্র "উইকলি ডিসপ্যাচ" (Weekly Dispatch) ও উৎসাহিত হয়ে উঠল। ঠিক হলো এই পত্রিকার অফিসেই নির্দিষ্ট তারিখে এই চ্যালেঞ্জের নিষ্পত্তির জন্য দুই যাদুকরের যাদুর লড়াই হবে।

মার্কিন মুলুকে যাকে একহাজার ডলারের বাজিতে চ্যালেঞ্জ করে বেকায়দায় পড়েছিলেন, চুং লিং সু যে সেই লোক, প্রথমে তা বুঝতে পারেননি চিং লিং ফু। যখন জানতে পারলেন, তখন খবরের কাগজের মাধ্যমে তিনি জানালেন "চুং লিং সু আসল চীনা যাদুকর নয়, রবিনসন নামক একজন মার্কিন প্রতারক মাত্র।"

নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে বিরাট গাড়িতে চড়ে "উইকলি ডিস্‌প্যাচ" কাগজের অফিসে এলেন যাদুকর চুং লিং সু (উইলিয়াম রবিনসন) এবং তাঁর সহ-কারিণী-সহধর্মিণী সুঙ্গ সীন (শ্রীমতী ডট রবিনসন)। তাঁদের মাথার উপর তখন মস্ত জমকালো চীনদেশী ছাতা ধরে আছেন সু-র মঞ্চ-পরিচালক (স্টেজ-ম্যানেজার) গম্ভীর-বদন ফ্রাঙ্ক কামেতারো।

চুং লিং সু এলেন, কিন্তু এলেন না চিং লিং ফু। অথচ যাদুর লড়াই দেখবার জন্য এসে ভিড় করেছেন সাংবাদিকদল, আর রঙ্গজগতের অনেকে। তাঁদের নিরাশ করলেন না চুং লিং সু, কয়েকটি চমৎকার খেলা দেখিয়ে তাঁদের চিত্ত জয় করলেন।

নিজেই চ্যালেঞ্জ করে নিজেই এলেন না কেন, এই প্রশ্নের জবাবে খবরের কাগজে চিং লিং ফু একটি বিবৃতিতে জানালেন চুং লিং সু যদি প্রমাণ করতে পারেন তিনি খাঁটি চীনদেশী, তাহলেই তিনি তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবেন, নতুবা নয়। চ্যালেঞ্জের এক হাজার পাউণ্ড এলো না চুং লিং সুর পকেটে। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রচারের দিক দিয়ে চুং লিং সুর যে লাভ হলো, তার দাম এক হাজার পাউণ্ডের কম নয়।

এখানে একটি কথা বলা হয়তো অবান্তর হবে না। ১৯২৩ সালে হ্যারি হুডিনি এই প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তা থেকে বোঝা যায় পত্রিকা ("উইক্‌লি ডিস্‌প্যাচ") অফিসে তিনি যাবেন এমন কথা চিং লিং ফু কখনো বলেননি, এবং তিনি যাবেন এমন আশাও কেউ করেননি। কি ব্যাপার চলেছে চিং লিং ফু কিছুই জানতেন না বুঝতেন না, (কারণ ইংরাজি তিনি জানতেন প্রায় না-জানারই মতো); চিং লিং ফুর এই অসুবিধার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে লাভবান হয়েছিলেন চুং লিং সু।

হুডিনির সব কথাই যে চোখ বুজে মেনে নেওয়া চলে তা নয়, এবং চুং লিং সুর অসামান্য খ্যাতি, মর্যাদা এবং জনপ্রিয়তা হুডিনির মনে কিছুটা ঈর্ষাগত বিদ্বেষেরও সৃষ্টি করেছিল, এও হয়তো অন্তত খানিকটা সত্যি। তবু হুডিনির মন্তব্য একেবারে বাতিল করে দিতে পারি না। এবং বারবার দুবার চিং লিং ফু যে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে নিজের মান খুইয়ে চুং লিং সুর মর্যাদা আর খ্যাতি বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছিলেন, সেই চ্যালেঞ্জও চিং লিং ফু সজ্ঞানে, স্থিরবুদ্ধিতে, বিশেষভাবে বিবেচনা করে এবং বিনা প্ররোচনায় করেছিলেন কিনা, সে প্রশ্নও মনে জাগতে পারে। সে যাই হোক, নকল চীনা যাদুকর আসল চীনা যাদুকরের চাইতে বিশ্বব্যাপী অনেক বেশী খ্যাতি অর্জন করলেও চিং লিং ফুও অসামান্য যাদুশিল্পী রূপে স্বীকৃত হয়েছেন। ১৯১৮ সালে চুং লিং সুর শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী বলেছি। চুং লিং ফুর মৃত্যু হয় ১৯২৪ সালে চীনদেশের সাংহাই শহরে। রবিনসন চুং লিং সু রূপে যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করে গেছেন, স্বনামে তার কাছাকাছিও যেতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মার্কিন রঙ্গজগতে চীনা যাদুকর চিং লিং ফুর আবির্ভাব মার্কিন যাদুকর উইলিয়াম রবিনসনের জীবনে এসেছিল বিধাতার আশীর্বাদের মতো। নকল চীনা চুং লিং সুর সঙ্গে তাই আসল চীনা চিং লিং ফুও পৃথিবীর যাদু-ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

ডেভিড ডেভাণ্ট

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত যাদুকর ডেভিড ডেভাণ্ট একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি জনবিরল পথ দিয়ে একা বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় একটি জোয়ান চেহারার লোক তাঁকে পাকড়াও করে বললে 'এই যে মশাই। অ্যাদ্দিন বাদে বাগে পেয়েছি আপনাকে। আপনিই না টাকা বানান?'

ডেভাণ্ট একটু ঘাবড়ে গেলেন। লোকটা বলে কি? একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'মাপ করবেন, আপনি বোধহয় ভুল করছেন।'

লোকটি বললে, 'মোটেই ভুল করিনি। আমার এই টুপিটি শিলিং দিয়ে ভরে দিয়ে যাবেন, তার আগে আপনাকে ছাড়ছি নে।' বলে মাথা থেকে টুপিটি নামিয়ে চিৎ করে ধরলে ডেভাণ্টের সামনে।

ডেভাণ্ট বুঝলেন পালাবার চেষ্টা করে লাভ হবে না, দৌড়ে বা কুস্তিতে এ লোকটার সঙ্গে পারবেন না তিনি। কাল সন্ধ্যা, পথ নির্জন, চেঁচিয়ে ডাকলেও সাড়া দেবার লোক নেই কাছাকাছি। সুতরাং লোকটিকে চটানো চলবে না। ঠাণ্ডা মাথায় সামলাতে হবে। ডেভাণ্ট বললেন, 'আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার পকেটখানা তল্লাসি করে যা পাও সব নিয়ে নাও।'

'কত আছে তোমার পকেটে? প্রশ্ন করলে লোকটি।

ডেভাণ্ট বললেন, 'ছয় শিলিং।'

লোকটি বললে, 'ছোঃ! ও তো আমার টুপির তলায় এক কোণে পড়ে থাকবে। টুপিটা ভরে দিতে হবে বলেছি না? আপনি হাওয়া থেকে ঝপাঝপ টাকা ধরেন, নিজের চোখে দেখেছি। আমার কাছে চালাকি?'

এইবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ডেভাণ্টের কাছে। একটি যাদুর খেলা আছে যার নাম 'কৃপণের স্বপ্ন' (Miser's Dream) অথবা 'হাওয়াই টাকশাল' (Aerial Mint) এ খেলায় বারবার হাত খালি দেখিয়ে যাদুকর হাওয়া থেকে টাকা ধরে-ধরে পাত্র ভরে ফেলেন। টাকাগুলো অবশ্য হাওয়া থেকে আসে না, খেলাটি নির্ভর করে প্রধানত পামিং (Palming) বা হাতের তালুতে এক বা একাধিক টাকা লুকিয়ে রাখা এবং গুপ্তস্থান থেকে গোপনে টাকা নেওয়ার কৌশলের ওপর। ডেভাণ্ট বুঝলেন এই লোকটি কোনোদিন

তাঁর এই খেলাটি দেখেছে আর ভেবে নিয়েছে সত্যিই হাওয়া থেকে টাকা ধরবার অলৌকিক যাদু তাঁর করায়ত্ত। ডেভাণ্ট লোকটিকে বোঝাতে গেলেন; লোকটি খেপে উঠে বললে, 'ভারি বেয়াড়া, বেআক্কেল, বেদরদী লোক তো আপনি মশাই। চোখের সামনে দেখছেন অর্থাভাবে শুকিয়ে মরছি, আর আপনি হাত বাড়ালেই আঙুলের ডগায় টাকা এসে পড়ে তবু হাতটুকু বাড়াবার মেহনত করতে চান না। ভালো চান তো চটপট শুরু করুন। আর দেরি নয়।'

ডেভাণ্ট বুঝলেন, লোকটি গুণ্ডা, গোঁয়ার অথবা পাগল; এতক্ষণ শুধু মুখ চালাচ্ছিল, এইবার হাত চালাবে। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করে তিনি কাজে লেগে গেলেন; কিছুক্ষণ যাদুকরসুলভ ভঙ্গিতে হাওয়ায় হাত চালিয়ে হাওয়া থেকে একটি শিলিং ধরে লোকটির টুপির ভেতর ফেলে দিলেন। লোকটি খুশি হয়ে বললে, 'বাঃ এই তো চমৎকার পেরেছেন। এতক্ষণ তাহলে ন্যাকামি করছিলেন কেন? নিন, জলদি হাত চালান। টুপিটা পুরো ভর্তি করে দিতে হবে যে।'

ডেভাণ্ট ছোটো বড়ো অনেক আসরে যাদুর খেলা দেখিয়েছেন, কোনোদিন কল্পনাও করেননি বিজন পথে দাঁড়িয়ে একটি মাত্র দর্শকের সামনে এ হেন অসহায়ভাবে তাঁকে যাদু-প্রদর্শন করতে হবে। সঙ্গে মাত্র ছয়টি শিলিং, হাওয়া থেকে ছয় শিলিং-এর বেশি ধরা তাঁর যাদুবিদ্যায় কুলোবে না। বিপদ শুরু হবে তারপরই, কারণ মাত্র ছয় শিলিং দিয়ে লোকটির টুপি ভরবে না, মনও ভরবে না। শেষটায় কি ঐ গোঁয়ারের হাতে মার খেয়ে মরতে হবে? হাওয়া থেকে টাকা ধরার কাজটিকে তিনি নানা কায়দায় যথাসম্ভব বিলম্বিত করতে লাগলেন, যেন লোকজন এসে পড়ার আগেই সবগুলো শিলিং ফুরিয়ে না যায়।

ডেভাণ্টের ভাগ্য ভালো, তিনি হাওয়া থেকে লোকটিকে চার শিলিং ধরে দিয়ে আরো বিলম্বিত লয়ে পঞ্চম শিলিং ধরবার তোড়জোড় করছেন, বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে উদ্বেগে, এমন সময় যেন ঈশ্বর প্রেরিত হয়েই চার-পাঁচ-জন লোক এসে হাজির। তারা এই লোকটির খোঁজেই বেরিয়েছিল—লোকটির মাথা খারাপ। ডেভাণ্টের বেকায়দায় দুঃখ প্রকাশ করে তারা তাদের হারানিধিকে নিয়ে চলে গেল। ডেভাণ্ট হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন!

বিখ্যাত যাদুকর ডেভাণ্টের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে গিয়ে একজন অখ্যাত যাদুকরের বিচিত্র কাহিনী মনে পড়ে গেল। ১৯২৫ খৃস্টাব্দ। আমি তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ি। চাঁদ মিয়া নামে একজন যাদুকর

স্কুলের বড় হলে আমাদের যাতুর খেলা দেখালেন। বেশি খেলার পুঁজি ছিল না ভদ্রলোকের, ঘণ্টাখানেক খেলা দেখিয়েছিলেন তিনি। এখনকার চোখে তাঁর খেলা কেমন লাগত জানি না, তখন মন্দ লাগেনি। হাওয়া থেকে একটি-একটি করে টাকা ধরে তাঁকে একটি টিনের কৌটো ভরে ফেলতে দেখে আমরা সবাই বেশ বিস্মিত হয়েছিলাম; ভাবছিলাম এভাবে হাওয়া থেকে খুশিমতো টাকা ধরবার বিদ্যেটা জানা থাকলে কি ভালোই না হতো! তাহলে আর টাকার জন্যে কোনো ভাবনা থাকত না।

সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কয়েকজনের মনে একটু খটকাও লেগেছিল। যাতুকরের দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য আমরা ছাত্রেরা এক আনা করে টিকেট কিনেছিলাম এবং প্রধান শিক্ষক মশাই কিছু চাঁদা দিয়েছিলেন। তাতে মোট দশ টাকার বেশী হয়নি, কিন্তু তাই পেয়েই যাতুকর চাঁদ মিয়া এত খুশি হয়েছিলেন যে, বোধহয় পাঁচ টাকা পেলেও তিনি অখুশি হতেন না। এ ব্যাপারটাই কেমন যেন খাপছাড়া লেগেছিল। হাওয়া থেকে খুশিমতো টাকা ধরবার যাতু যাঁর জানা আছে তিনি হাওয়াই টাকায় কোটিপতি না হয়ে দীনহীনের মতো এই সামান্য টাকার জন্য ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ান কেন? এ প্রশ্নের ভারি সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন যাতুকর চাঁদ মিয়া। বলেছিলেন, 'হাওয়াই যাতুর টাকা ভোগে লাগাতে নেই। লাগালেই যাতু আর লাগে না। হাওয়ার টাকা তাই আবার হাওয়াতেই ফিরিয়ে দিতে হয়।'

যাতুকর রাজা বোসের মুখে শুনেছিলাম ডেভিড ডেভান্টের মতো তাঁকেও একবার পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে টাকার ম্যাজিক দেখাতে হয়েছিল। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা ছিল একটু আলাদা। ঘটনাটি এইরকম। শহর কলকাতা, সময় অপরাহ্ণ। যাতুকর রাজা বোস হ্যারিসন রোড (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) দিয়ে চলেছেন বড়বাজারের দিকে। হঠাৎ ফুটপাথের ওপর পঞ্চনদের দেশ থেকে আগত এক লম্বা চওড়া দাড়িওয়ালা ভাগ্য-গণৎকার 'সাধু'র সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল। এ ধরনের 'সাধু' এখনও কলকাতার পথে ঘাটে দেখতে পাওয়া যায়। ছোটোখাটো অথচ চমৎকার যাতুর খেলায় এঁদের হাত বেশ তৈরি থাকে এবং যাতুকরোচিত বচনে এঁরা বেশ সিদ্ধমুখ। বিশেষ করে হাতের তালুতে বা আঙুলের ফাঁকে টাকা, সিগারেট, গুলি, ডিম, চাবি প্রভৃতি ছোটোখাটো জিনিস লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে—ইংরেজিতে যাকে বলে 'পামিং'—এঁদের হাত সাফাই চমৎকার। এঁদের কর্মপদ্ধতি বা কায়দায় একটি

উদাহরণ দিই। মনে করুন আপনি পথ দিয়ে চলেছেন কিছু একটা ভাবতে-ভাবতে। এমন সময় হঠাৎ এমনি এক সাধু আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপনাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন আচমকা। আপনাকে ভাবতে সময় না দিয়ে সাধুজী এমনি হঠাৎ হুকুম করলেন হাত পাততে, যে আপনার ডান হাতটি সঙ্গে সঙ্গে যেন সম্মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে পতিত হলো। সাধুজী আপনার ডান হাতটি তাঁর বাঁ হাতে ধরে আপনার খালি হাতের ওপর তাঁর ডান হাতের চাপড় মেরেই বললেন 'মুঠো করো'। সঙ্গে সঙ্গে সাধুজী নিজেই উদ্যোগী হয়ে আপনার ডান হাতটি বিদ্যুদ্বেগে মুঠো করিয়ে দিলেন। তারপর আপনার বদ্ধমুষ্টির ওপর ফু দিয়ে বললেন মুঠিটি খুলতে। আপনি খুলে দেখলেন—তাজ্জব ব্যাপার! আপনার হাতে একটা নকুলদানা? শূন্য মুষ্টির ভেতর নকুলদানার আবির্ভাব আপনার কাছে অলৌকিক মনে হবে। 'সাধুজী'র এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে আপনার বিশ্বাস জন্মাবে, আপনি ওঁকে দিয়ে আপনার ভাগ্যগণনা করাবেন এবং কিছু অর্থও আপনার পকেট থেকে এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধুর পকেটে যাবে। আসলে ঐ নকুলদানার আবির্ভাব মোটেই অলৌকিক নয়। ওটি সাধুজীর ডানহাতের তালুতেই লুকানো অর্থাৎ 'পাম' করা ছিল এবং আপনার হাতটি মুঠো করিয়ে দেবার অব্যবহিত পূর্বেই নকুলদানাটি ওর হাতের তালু থেকে আপনার হাতের তালুতে চালান হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটি এত দ্রুত বেগে ঘটেছিল যে আপনি স্থির মস্তিষ্কে বুঝবার সুযোগই পান নি কি ঘটেছে।

সাধুজী সামনে পড়ায় রাজা বোস দাঁড়িয়ে পড়লেন। সাধু তখন 'বেটা তুমহারা ভালা হোগা' ইত্যাদি বাঁধা বুলি বলতে-বলতে দাড়িতে হাত বুলিয়ে দাড়ির ডগা থেকে একটা সিগারেট বার করে রাজা বোসের হাতে দিয়ে বললেন 'লে বেটা সিগ্রেট পী লো।'

বলা বাহুল্য, যাদুর খেলায় অভ্যস্ত রাজা বোস ভ্যাবাচ্যাকা খাননি। তবু ন্যাকা সেজে তিনি এমন ভ্যাবাচ্যাকা ভাব দেখালেন যেন দাড়ির ডগা থেকে সিগারেটের অলৌকিক আবির্ভাব দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন। সাধু তো তাঁর সেই হতভম্বতার অভিনয় দেখে ভারি খুশি, ভাবলেন শিকার টোপ গিলেছে। শিকারকে টোপটি আরো ভালো করে গেলাবার জন্যে সাধু আরো বললেন 'বেটা তোমার বরাত খুব ভালো। যেটুকু খারাপ আছে তা এই দেখো আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছি!' বলে সাধু পুরুষটি তাঁর দাড়ির গোছটা মুঠো করে ধরে একটু-একটু করে ঝাড়া দিতেই দাড়ি থেকে ঝরঝর করে খানিকটা দুধ ঝরে পড়ল ফুটপাথের ওপর।

রাজা বোস ভাবলেন লোকটিকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়, তাছাড়া তাঁর নিজেরও কাজের সময় নষ্ট হচ্ছে। তিনি বললেন 'সত্যি আপনি ভয়ানক সিদ্ধ পুরুষ। আপনার দয়াতে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে গেছে। এই দেখুন-না যেখানে হাত দিচ্ছি সেখানেই টাকা পেয়ে যাচ্ছি!' বলে নাক ঝেড়ে, হাওয়া থেকে, কনুই থেকে, জুতোর তলা থেকে, এমন কি সাধুর দাড়ির ডগা থেকেও খুশিমতো টাকা বাড় করতে লাগলেন। একটি টাকাকে দুহাতে চিরে ফেলে দুটাকা বানিয়েও দেখিয়ে দিলেন। এবারে সাধুজীর সত্যি সত্যি ভ্যাবাচ্যাকা খাবার পালা। তিনি বুঝলেন ভূতের কাছে তিনি এতক্ষণ মামদোবাজি দেখাচ্ছিলেন, এই বেলা মানে মানে কেটে পড়া দরকার। কেটে পড়লেনও! রাজা বোস যেমন যাচ্ছিলেন তেমনি চললেন বড়বাজারের দিকে।

ডেভিড ডেভাণ্ট ছিলেন তাঁর সময়ে (১৮৯৩ থেকে ১৯১৪ খৃঃ পযন্ত, তারপর তিনি অবসর গ্রহণ করেন যাদু জগৎ থেকে) ইংল্যাণ্ডের সেরা এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা যাদুকরই নয়, অসামান্য রসিকও ছিলেন তিনি। তাঁর রসিকতা ছিল নির্মল আনন্দময়, প্রত্যেকটি খেলায় – কি ছোটো, কি বড়ো – তিনি প্রচুর হাসির খোরাক যোগাতেন কথাবার্তা, হাবভাব এবং পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। তিনি আর জীবিত নেই, কিন্তু তাঁর রসিকতার পরিচয় রয়ে গেছে তাঁর স্মৃতিকথায়। তাঁর স্মৃতিকথা থেকেই আরেকটি কাহিনী বলি।

লণ্ডনের যাদু-রঙ্গমঞ্চে রাতের পর রাত ডেভাণ্ট একটি চমকপ্রদ খেলা দেখাচ্ছেন, যার নাম 'দি ভ্যানিসিং লেডি ইলিউশন' অর্থাৎ মহিলার বিস্ময়কর অন্তর্ধান। সর্বপ্রথম প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে এই খেলাটি দেখান খেলাটির মূল আবিষ্কর্তা বিখ্যাত ফরাসী যাদুকর বুয়াতিয়ে দ্য কোল্‌তা ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে; দ্য কোল্‌তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তার অল্প পরেই ইংরেজ যাদুকর চার্ল্‌স বারট্রাম (ব্যক্তিগত জীবনে জেম্‌স ব্যাসেট) দেখাতে শুরু করেন লণ্ডনের ইজিপশিয়ান হলে। খেলাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। মঞ্চের ওপর যাদুকর একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে দিলেন। কাগজটির ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন একটি চেয়ার। চেয়ারের ওপর একটি মহিলা বসলেন। মহিলাটিকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি রেশমী চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। যাদুকর হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টানে চাদরটি তুলে নিতেই অবাক কাণ্ড। চোখের পলকে চাদরটি অদৃশ্য, ভদ্রমহিলাও নিরুদ্দেশ, খবরের কাগজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে শূন্য চেয়ার, অন্তর্হিতা সুন্দরীর স্মৃতিচিহ্ন বুকে নিয়ে – সুন্দরীর ফেলে যাওয়া ছোট্ট রুমালটি।

মূল খেলার প্লট বা কাঠামোটুকু এই। পরে এই খেলাটি বিভিন্ন যাদুকরের হাতে তাঁদের যাঁর যাঁর রুচি, প্রতিভা, প্রয়োজন, সুবিধা এবং সাধ্য অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ নিয়ে প্রদর্শিত হয়। এই অন্তর্ধানের খেলাটি ডেভাণ্ট যেভাবে দেখাতেন তাতে তাঁর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। খেলাটি তাঁর হাতে এমন আশ্চর্য রূপ নিত যে অনেক দর্শকেরই বারবার দেখেও আশ মিটত না, তাঁরা রাতের পর রাত এই একই খেলা দেখতে আসতেন।

একদিন এক ভদ্রলোক ডেভাণ্টের সঙ্গে এসে গোপনে দেখা ক'রে চাপা গলায় বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট কথা আছে।'

ডেভাণ্ট বললেন, 'বলুন।'

'কয়েক রাত ধরে আপনার মহিলা ওড়ানোর যাদু দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। অপূর্ব! অতুলনীয়।' বলতে বলতে ভদ্রলোকের কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো।

ডেভাণ্ট বললেন, 'ধন্যবাদ। আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'একটি মহিলাকে উড়িয়ে দেবেন, আর যেন তিনি ফিরে না আসেন। মোটা ফী দেব আপনাকে।'

ডেভাণ্ট বললেন, 'উড়িয়ে দিতে পারি; ফিরে আসা বন্ধ করার যাদু জানা নেই। কিন্তু মহিলাটি কে?'

ভদ্রলোক বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'আমার শাশুড়ি।'

আদালতে যাদুকর

যাদুকরেরা সাধারণত রঙ্গমঞ্চে, ঘরোয়া আসরে, বৈঠকে বা পথে-ঘাটে যাদুর খেলা দেখিয়ে থাকেন। বিখ্যাত যাদুকর কার্ল হার্ট্জকে (Carl Hertz) একবার যাদু-প্রদর্শন করতে হয়েছিল প্রকাশ্য আদালতে—বিচারক এবং জুরীদের সামনে। কিন্তু কেন? সেই কাহিনীই বলছি।

এ কাহিনীর নায়িকা এডিথা সালোমেন খৃষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মার্কিন মুলুকের কেন্টাকি প্রদেশে। তাঁর পিতৃদেব ছিলেন ডানপিটে, বেপরোয়া, ছন্নছাড়া, ভবঘুরে, বুজরুক ইত্যাদি চরিত্রের মানুষ। এডিথা তাঁর পিতৃদেবের চরিত্রের সবগুলো গুণই পেয়েছিলেন পুরো মাত্রায়। তার ওপর তাঁর ছিল কতকগুলো বিশেষ গুণ যাতে তাঁর পিতৃদেব ছিলেন তাঁর তুলনায় ছেলেমানুষ। পিতা-পুত্রীতে ছাড়াছাড়িটা বেশ তাড়াতাড়িই হয়েছিল এবং এডিথা অল্প বয়সেই অ্যাডভেঞ্চার-বহুল বিচিত্র জীবন শুরু করেছিলেন। বিবেক বা নীতিবোধের বালাই এতটুকুও ছিল না তাঁর—সুযোগ পেলেই ছোট, বড়ো, মাঝারি যে-কোনো অপরাধ তিনি বিনা দ্বিধায় করতেন। দুরন্ত দুঃসাহস ছিল এডিথার চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব।

বিশ বছর বয়সে এডিথা এক বিরাট ধাপ্পা অভিযান শুরু করলেন যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোর শহরে। এখানে তিনি বেশ জমকালো ভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন ব্যাভেরিয়ার (জার্মানী) অভিজাত সম্প্রদায়ের কাউন্টেস্ ল্যাণ্ডসফেল্ট পরিচয়ে। বাল্টিমোরের খবরের কাগজে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ বেশ ফলাও করে ছাপা হলো—বলা বোধহয় বাহুল্য এর পেছনে ছিল সুচতুরা এডিথা ওরফে ব্যারনেস রোজেনথেল ওরফে কাউন্টেস ল্যাণ্ডসফেল্টেরই ব্যবস্থাপনা। এই সব সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেকে পরিচিত করলেন লাস্যময়ী স্বনামধন্যা আইরিশ-স্প্যানিশ নর্তকী লোলা মন্টেজ (Lola Montez) এবং ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লুই-র অবৈধ কন্যা বলে। বাল্টিমোর শহরে সাড়া পড়ে গেলো, হুজুগপ্রিয়ের দল মেতে উঠলেন হুজুগে। বহুবল্লভা রূপসী নর্তকী লোলা সম্পর্কে অনেক রকম মুখরোচক কেচ্ছা প্রচলিত ছিল। খ্যাতির চাইতে অপখ্যাতি অনেক বেশি মজাদার, অনেক বেশি জনপ্রিয়। সুতরাং লুই ও লোলার অবৈধ সন্তানের এমন

নাটকীয় আবির্ভাব এবং জমকালো অবস্থিতি সারা শহরের শিহরণপ্রিয় মহলে চাঞ্চল্য জাগাবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কথায়-বার্তায়, হাবভাবে, আদব-কায়দায় পুরোদস্তুর আভিজাত্য বজায় রাখবার মতো চেহারা আর চাতুর্য ছিল এডিথার। ঠাট বজায় রাখবার জন্য তিনি জাঁকজমকে খরচও করেছিলেন প্রচুর। অবশ্য এর পেছনে তাঁর গূঢ় অভিসন্ধি ছিল ; ব্যারনেস রোজেনথল যে অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী, বালটিমোরের অর্থ-কুলীন মহলে এই বিশ্বাসটা ভালোভাবে চালু করবার জন্যেই প্রথম প্রথম বেশ জাঁক করে কিছু টাকার ছিনিমিনি খেলা দরকার—এ তো অর্থের অপব্যয় নয়, আগামী লাভের জন্য বিনিয়োগ—যাকে বলে 'ইনভেস্টমেণ্ট।'

বালটিমোর শহরে মোটা ঐশ্বর্যের মালিক মোটাবুদ্ধি 'কাপ্তান'-এর অভাব ছিল না। এডিথা ওরফে ব্যারনেস রোজেনথেল হলেন মক্ষিরানী, আর তাঁকে ঘিরে মেতে উঠল এই প্রচুর ঐশ্বর্যবান বোকা কাপ্তানের দল। "ব্যারনেস" সু-কৌশলে এঁদের প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা ভাবে আভাসে-ইঙ্গিতে, নীরব ভাষায় বোঝালেন, "ওগো প্রিয়, তোমাকে—শুধু তোমাকে দেখেই আমার মন মজেছে। তুমি আমার নারী জীবনের একমাত্র পরম পুরুষ। তোমার পায়ে সঁপে দেব আমার জীবন-যৌবন-ধন-মান। শুধু একেবারে সঁপে দেবার আগে তোমাকে একটু বাজিয়ে নিচ্ছি মাত্র।" প্রত্যেকেই মনে মনে হাতে চাঁদ পেলেন, ভাবলেন তুটো দিন সবুর করলেই অতুলনীয় মেওয়া ফলবে। "ব্যারনেস" চেহারায় ঠিক রূপসী না হলেও চটকদার, সুরসিকা, সুচতুরা ; তাছাড়া ঠাট-ঠমক আর জাঁকজমক দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এঁর ঐশ্বর্য অগাধ। লোলা-তুহিতার পাণিগ্রহণের জন্যে লালায়িত হয়ে প্রত্যেকেই গোপনে দিন গুনতে লাগলেন। অর্থবান গাধার দল পড়ে গেলেন মোহময়ীর মোহিনী মায়ার খপ্পরে। এডিথা এই প্রেমোন্মাদদের এক-একটিকে ধরে নানা ছলে তাঁকে যথাসাধ্য দোহন করতেন, তারপর যখন দেখতেন একে প্রায় ফোঁপরা করে আনা গেছে, আর বিশেষ কিছু আদায় করা যাবে না, তখন কোনো অজুহাতে ঝগড়া করে তাঁকে জীর্ণ বসনের মতো পরিত্যাগ করতেন। এভাবে প্রেমমূর্খ টাকার কুমীরদের পকেট থেকে কয়েক লক্ষ টাকা খসিয়েও খোলামকুচির মতো উড়িয়ে দিলেন এডিথা। আফিম ইত্যাদি নানারকমের নেশাও ধরলেন। রক্তেই যে তাঁর বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার নেশা। সে নেশা এড়ানো যাবে কি করে ?

এর পরের কিছু-কিছু ঘটনা টপকে বালটিমোর শহর ছেড়ে এসে আমাদের

আসল কাহিনীর বড়ো রাস্তায় পড়া যাক। এডিথার মনে হলো হাতের পাঁচ হিসেবে নিরীহ চরিত্রের একটি বশংবদ স্বামী থাকা মন্দ নয়। বিয়ে করলেন ডাঃ মেসাণ্ট নামে এক নিরীহ চরিত্রের তরুণ ডাক্তারকে। বছর না ঘুরতেই এডিথা হলেন ডাঃ মেসাণ্টের বিধবা। এডিথা নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন মানব-সমাজে দ্বিপদ গর্দভের কোনোদিনই অভাব হয় না, হবে না; এবং বুদ্ধিমান আর বুদ্ধিমতীদের পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে এদের ভেতর যারা শাঁসালো, তাদের দোহন করা, যতরকমে পারা যায় তাঁদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা। সে সময় হিপনোটিজম্ বা সম্মোহন বিদ্যার বেশ প্রতিপত্তি হয়েছিল। ডাক্তার মেসাণ্টের বিধবা এডিথা সেদিকে মনোযোগিনী হলেন। এবার তিনি ভূমিকা নিলেন মহিলা হিপ্‌নোটিস্ট-এর। অভিনয়-চাতুর্য ছিলো তাঁর অসাধারণ, কলাকৌশলেও তাঁর মাথা খেলত, তাছাড়া তাঁর যেমন ছিল কল্পনাশক্তি তেমনি কূটবুদ্ধি। সুতরাং হিপনোটিস্ট হিসেবে পসার জমাতে তাঁর বেশি দেরি হলো না। কিন্তু আয় যা হতে লাগলো তা এককালে হাজার-হাজার টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এডিথাকে খুশি করবার মতো প্রচুর নয়। তিনি পণ করলেন এই হিপনোটিজমের ব্যবসাটাকেই আরো জাঁকিয়ে করতে হবে, নইলে দুহাতে পয়সা লোটা যাবে না। এ সময় এডিথার আলাপ পরিচয় হলো একটি আত্মম্ভর, বাক্‌সর্বস্ব, দুর্বলচিত্ত প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়; কিন্তু তিনি অভিজাত ডিস-ডেবার বংশোদ্ভূত, সেইজন্য অভিজাত সমাজে তাঁর বেশ কৌলীন্য মর্যাদা ছিল। এডিথার মনে হলো বিধবা শ্রীমতী মেসাণ্ট হয়ে থাকার চাইতে সধবা শ্রীমতী ডিস-ডেবার হওয়া অনেক ভাল। তাই হলেন তিনি। নতুন স্বামীর পদবীর আগে নিজের জন্য পছন্দ করে দুটি নাম বসিয়ে পুরোনো এডিথা হয়ে গেলেন নতুন অ্যান ও' ডেলিয়া ডিস-ডেবার। চমৎকার জমকালো হোমরাচোমরা নাম। আর "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য" ফরমুলা অনুযায়ী তিনি এখন আর সাধারণ স্ত্রী-লোক রইলেন না, হয়ে গেলেন পুরোদস্তুর অভিজাত মহিলা, সোসাইটি লেডি।

শ্রীমতী ডিস-ডেবারের (এখন থেকে তাঁকে এই নামেই অভিহিত করব) পরিকল্পনা এবং আশা সফল হলো। তাঁর সম্মোহন মন্দিরে মক্কেলের ভিড় বেড়েই চলল। শ্রীমতীর কাছে এসে সম্মোহিত হওয়াটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেল, আর না-হওয়াটা হয়ে উঠল লজ্জার ব্যাপার। 'আপনি একবারও শ্রীমতী ডিস-ডেবারের হাতে হিপনোটাইজড হন নি? ছি ছি ছি ছি, করেছেন কি? সমাজে মুখ দেখাচ্ছেন কি করে? যান যান, আজই একবার হিপনোটাইজড হয়ে আসুন।'

—এই ধরনের বুলি সমাজের এখানে-সেখানে শোনা যেতে লাগল। প্রত্যেক কিস্তি হিপনোটিজমে মোটা দর্শনী নিতেন শ্রীমতী, সুতরাং আয় যা হতে লাগল তাকে দু হাতে টাকা লোটাই বলা চলে।

কিন্তু জোয়ার যেমন হু হু করে এসেছিল, ভাঁটাও এলো তেমনি করে। কেটে গেল নতুনের হুজুগ, সম্মোহন মন্দিরে প্রায় শূন্যের কাছে এসে পৌঁছল মক্কেলের আনাগোনা। দু হাতে যেমন লুটেছিলেন, তেমনি খরচাও করেছিলেন শ্রীমতী। সুতরাং আবার শুরু হল আর্থিক দুরবস্থা। শ্রীমতী মরিয়া হয়ে উঠলেন। অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার।

বিধাতা সহায় থাকলে কি না হয়? এই সময়ে শ্রীমতীর পরিচয় হল নিউ-ইয়র্ক শহরের এক বিরাট ধনী আইন-ব্যবসায়ীর সঙ্গে। ভদ্রলোকের নাম লুথার মার্শ। আইন-আদালতের জগতে তিনি অসামান্য চতুর চৌকোস এবং বিচক্ষণ বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। অনেকে মনে করেন, এই ধরনের লোককে ধাপ্পা বা বুজরুকি দিয়ে ঠকানো শক্ত, হয়তো বা অসম্ভব। কিন্তু ঠকবাজি ধাপ্পাবাজির ওস্তাদ মহলের অভিজ্ঞ অভিমত হচ্ছে ঠিক উপযুক্ত পদ্ধতিটি অবলম্বন করতে পারলে, অথবা মওকা মতো ঝোপ বুঝে কোপ লাগাতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই মোটাবুদ্ধি বুদ্ধুদের চাইতে সূক্ষ্মবুদ্ধি চালাকদের ঘায়েল করা বেশি সহজ। পুলিশ রেকর্ড থেকেই এ অভিমতের যথার্থতা বোঝা যায়।

লুথার মার্শ তখন বৃদ্ধ। বয়স সত্তরের ওপর। প্রাণাধিক পত্নীর সদ্য বিয়োগে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন। সমাজ সংসার সব কিছু যেন অর্থহীন হয়ে গেছে তাঁর কাছে, নিজেকে নিঃসঙ্গ, অসহায় বোধ করছেন তিনি। আনন্দে নেচে উঠল শ্রীমতী অ্যান ও' ডেলিয়া ডিস-ডেবারের চিত্ত। তারপর এক সন্ধ্যায় সম্মোহন চক্রে বসেছেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার। সদ্য পত্নীবিয়োগ-বেদনায় জর্জর বৃদ্ধ লুথার মার্শও উপস্থিত রয়েছেন। সহসা এ কি হলো? সম্মোহনকারিণী শ্রীমতী ডিস-ডেবার নিজেই সম্মোহিতা হয়ে গেলেন যেন! দেহ নিশ্চল, দুটি চোখের তারায় নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী, বাইরের জগৎ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন শ্রীমতী। শ্রীমতী ডিস-ডেবার যেন আর শ্রীমতী ডিস-ডেবার নন। তাঁর অবস্থা দেখে আধা ভীত আধা চিন্তিত হয়ে উঠলেন লুথার মার্শ। একটু পরেই বৃদ্ধ চমকে উঠলেন। শ্রীমতী ডিস ডেবার মিডিয়ামে পরিণত হয়ে গেছেন, আর তাঁরই মাধ্যমে স্বামীকে সম্বোধন করে কথা বলছেন স্বর্গীয়া শ্রীমতী মার্শ। কণ্ঠ-স্বরটা হুবহু মিলছে না, কিন্তু তেমনি উচ্চারণভঙ্গী, তেমনি বাক্যবিন্যাসের ধরন,

তেমনি মাঝে মাঝে একটু থেমে থাকা, তেমনি কয়েকটি পরিষ্কার মুদ্রাদোষ। তাছাড়া তাঁর কথায় যে কতকগুলো ইঙ্গিত আর প্রসঙ্গ রয়েছে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই পরলোক থেকে শ্রীমতী মার্শের আত্মাই এসে হাজির হয়েছেন, মিডিয়াম শ্রীমতী ডিস-ডেবার-কে ভর ক'রে।

স্বর্গীয় আত্মাকে মর্ত্যে নামাবার মিডিয়ামগিরি শ্রীমতীর এই প্রথম। শ্রীমতী দেখলেন তাঁর প্রথম প্রচেষ্টাই আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছে। শিকার মাছটি শুধু টোপই নয়, বঁড়শি আর সুতোসুদ্ধ গিলে ফেলেছেন। চিরতরে হারানো প্রিয়তমার সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র ভেবে শ্রীমতী ডিস ডেবারের হাতের পুতুলে পরিণত হলেন ধনী আইন-বিশারদ লুথার মার্শ। শ্রীমতী ঠিক করে ফেললেন হিপনোটিজম ছেড়ে এইবার মিডিয়ামগিরির ব্যবসাই করবেন তিনি, এতে অর্থসম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি।

শ্রীমতী ডিস-ডেবার সর্বদাই কাছাকাছি থাকলে তাঁর মাধ্যমে স্বর্গীয়া পত্নীর সঙ্গে যখন খুশি যোগাযোগ করা যাবে, এই ভেবে লুথার মার্শ ঐকান্তিক অনুরোধ করে শ্রীমতীর আলাদা বাড়ি তুলে দিয়ে তাঁকে স্বামী-সন্তানাদিসহ ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে বিরাট মার্শভবনে বসবাস করাবার জন্যে নিয়ে গেলেন। একটি বড়ো হলঘর সুসজ্জিত করে আলাদা রাখা হলো, লোকান্তরিত আত্মা আনবার চক্র বৈঠক বসবে বলে। এই ঘরে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মিডিয়াম শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে কেন্দ্র করে বসতে লাগল বৈঠকের পর বৈঠক। বহু অভিজাত পরিবারের শোকার্ত নরনারী এসে মোটা দক্ষিণা দিয়ে লোকান্তরিত প্রিয়জনের আত্মিক সংস্পর্শ লাভ করে যেতে লাগলেন, ফুলে ফুলে উঠতে লাগল মিডিয়াম শ্রীমতী ডিস-ডেবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট। শ্রীমতী মার্শের অদৃশ্য আত্মাও প্রায়ই এসে শ্রীযুক্ত মার্শের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যেতেন এবং বলা বাহুল্য, প্রতিবারই মিডিয়াম শ্রীমতী ডিস ডেবার তাঁর মেহনতের জন্যে লুথার মার্শের কাছ থেকে বেশ মোটা টাকার দক্ষিণা আদায় করে নিতেন।

কল্পনাময়ী শ্রীমতীর উর্বর মস্তিষ্কে এর পর চমৎকার একটি পরিকল্পনার উদয় হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি প্রস্তাবও পেশ করলেন তাঁর শাঁসালো মক্কেলটির কাছে। প্রস্তাবটি এই যে, পরলোকের সঙ্গে যখন শ্রীমতী ডিস-ডেবারের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে গেছে, লোকান্তরিত আত্মাদের সঙ্গে যখন তাঁর এমন অন্তরঙ্গ মহরম-মহরম, তখন বিগত যুগের সেরা সেরা শিল্পীদের আত্মা আনিয়ে তাঁদের দিয়ে নতুন নতুন ছবি আঁকিয়ে নিলে কেমন হয়? তাঁদের নতুন আঁকা 'মাস্টার-

পিস' ছবিগুলো নিশ্চয়ই অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি করা যাবে। এতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে—শিল্পচর্চাকে শিল্পচর্চা, ব্যবসাকে ব্যবসা।

শ্রীযুত মার্শ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললেন, "অতি উত্তম প্রস্তাব। শুভস্য শীঘ্রম্।" একটি বিশেষ বৈঠকে, হলের ভেতরটা যথারীতি অন্ধকার করে শ্রীমতী ডিস-ডেবার স্বর্গীয় শিল্পীদের আহ্বান জানালেন। কিছুক্ষণ বাদে সেই গভীর অন্ধকারের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে গম্ভীর রহস্যময় কণ্ঠে নিজের আবির্ভাব ঘোষণা করলেন বিগত যুগের বিশ্ববরেণ্য শিল্পী রাফায়েল। পরম বিনীতভাবে তাঁকে একটি ছবি এঁকে দেবার অনুরোধ জানালেন শ্রীমার্শ। দেখা গেল স্বর্গীয় রাফায়েল মোটেই আপনভোলা শিল্পী নন, পাকা ব্যবসাদার লোক। ছবি আঁকতে তিনি রাজি, কিন্তু বেশ মোটা দক্ষিণার বিনিময়ে, এবং সে-টাকা আগাম নগদ চাই। মোটা টাকার অঙ্ক শুনেও তাই দিতে রাজি হয়ে গেলেন শ্রীযুত মার্শ। একটি কালো রঙের আলমারির ভেতরে আগাম দক্ষিণার নগদ টাকা, ঈজেলের ওপর ক্যানভাস, তুলি রঙ ইত্যাদি রেখে আলমারির তালা বন্ধ করে দেওয়া হলো। চাবি রইল শ্রীমতী ডিস-ডেবারের কাছে। শিল্পী রাফায়েলের অদৃশ্য আত্মা ঘোষণা করলেন, দশদিন বাদে ছবি আঁকার কাজ সম্পূর্ণ হবে। এই দশদিন শ্রীমতী তাঁর আপন একান্তে নিরালায় বিশ্রাম নিলেন। দশদিন বাদে আলমারি খোলা হতেই দেখা গেলো ঈজেলের ক্যানভাসের ওপর সত্যিই ছবি আঁকা হয়ে গেছে, তার কোনো কোনো জায়গায় রঙ তখনো ভালো করে শুকোয় নি। কোনো শিল্পীর চোখে সে ছবি পড়লে তিনি হয়তো হাসতেন, কিন্তু লুথার মার্শের মনে হলো এ এক অপূর্ব, অমূল্য ছবি। আর এ ছবি যে স্বয়ং রাফায়েলেরই আঁকা, সে বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল না, কারণ তিনি নিজেই তো রাফায়েলের আত্মার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

শুধু রাফায়েলের নয়, একে একে স্বর্গীয় আরো সেরা সেরা শিল্পীর আত্মা আনিয়ে মোটা দক্ষিণা দিয়ে ছবির পর ছবি আঁকালেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার। মোটা দক্ষিণাগুলো সবই দিলেন লুথার মার্শ, আর তাঁর ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর ঐ প্রাসাদোপম বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে ছবিগুলো শোভা পেতে লাগল মার্শের মনে—হায় মার্শ!—দৃঢ়বিশ্বাস হলো তাঁর মত এমন মহামূল্যবান ছবির সংগ্রহ পৃথিবীতে আর নেই। টাকাগুলো নেপথ্যে চলে গেল শ্রীমতী ডিস-ডেবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

শ্রীমতী ডিস-ডেবার একদিন বললেন, "অনেক শিল্পীকে এনে তো ছবি

আঁকিয়ে নেওয়া গেল। বলেন তো এবার একদিন শেক্সপিয়ারকে নিয়ে আসতে পারি।"

শেক্সপিয়ার! বিশ্বের বিখ্যাততম, শ্রেষ্ঠতম কবি-নাট্যকার উইলিয়ম শেক্সপিয়ার! তাঁর অমর আত্মা কৃপা করে পদার্পণ করবেন এই দীনহীনের ভবনে! এত বড়ো সৌভাগ্য আর সম্মান লুথার মার্শ কোনোদিন স্বপ্নেও আশা করতে পারেন নি। তিনি উৎসাহে অধীর হয়ে উঠলেন। সুতরাং অবিলম্বেই এক সন্ধ্যায় ভৌতিক চক্রে বসলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার, বসলেন শ্রীযুত লুথার মার্শ। সেই অন্ধকারের বুকে সহসা ধ্বনিত হয়ে উঠল মহাকবি মহানাট্যকার শেক্সপিয়ারের কণ্ঠস্বর। অদৃশ্য শেক্সপিয়ারের সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হলেন মার্শ, ধন্য জ্ঞান করলেন নিজেকে। বিনীত আবেদন জানালেন—"হে চিরবরেণ্য মহাকবি! আপনার বচন শ্রবণ করে জীবন ধন্য হলো। একবার, শুধু একবার দর্শন দিন, নয়ন ধন্য করি।" কিন্তু শেক্সপিয়ার দর্শন দিতে রাজী হলেন না। বললেন, "পরলোকে এতদিন থেকে থেকে তিনি পারলৌকিক আবহাওয়ায় এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, যে ইহলৌকিক আবহাওয়া তাঁর সূক্ষ্মদেহে বরদাস্ত হবে না বলেই তিনি এ আবহাওয়ায় সূক্ষ্মদেহে দেখা দিতে ভরসা পাচ্ছেন না। যাই হোক, দেখা না দেওয়ার আংশিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে শেক্সপিয়ার তাঁর প্রকাশিত রচনাবলী থেকে কিছু কিছু আবৃত্তি করে শোনালেন। একটি আনকোরা নতুন কবিতাও শোনালেন; বললেন, "এ কবিতাটি আপনার ভবনে আসবার পথে মনে মনে রচনা করেছি।"

এরপর একে একে বিভিন্ন যুগের আর বিভিন্ন দেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মা শ্রীমতী ডিস-ডেবারের আবাহনে ভৌতিক চক্রে এসে লুথার মার্শের সঙ্গে আলাপ করে গেলেন। কোনো কোনো আত্মা কাগজের পাতায় বা প্যাডে অনেক কথা বা প্রশ্নের জবাব লিখেও রেখে গেলেন এমনকি অষ্টম-নবম শতাব্দীর দিগ্বিজয়ী সম্রাট শালামেনকে পর্যন্ত শ্রীমতী ডিস-ডেবার ভৌতিক চক্রে এনে মার্শের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, প্রতি বৈঠকেই মোটা দক্ষিণা আদায় করে করে শ্রীমতী ডিস-ডেবার প্রচুর টাকা স্থানান্তরিত করলেন মার্শের তহবিল থেকে নিজের তহবিলে। মার্শ-কামধেনুকে কিস্তিতে কিস্তিতে এত অনায়াসে দোহন করে করে সাহস বেড়ে গেল শ্রীমতীর, লোভ হয়ে উঠল প্রচণ্ড। তিনি ঠিক করলেন, এভাবে কিস্তিতে কিস্তিতে আর নয়, খুচরো ছেড়ে এবার পাইকারী মার মারতে হবে। 'মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার।' কিন্তু এই অতিলোভই তাঁর কাল হলো।

এক সন্ধ্যায় ভৌতিক চক্রে আবির্ভাব হলো একটি বালিকা আত্মার। ধন-কুবের আইন-ব্যবসায়ী লুথার মার্শের বহুদিন আগে লোকান্তরিতা কন্যা এই বালিকা ওপার থেকে এপারের বাবার কাছে ঐকান্তিক আবদার জানালো "বাবা তোমার ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ-র সমস্ত সম্পত্তি আমার এই ডিস-ডেবার মাসির নামে লিখে দাও। দাও বাবা। বলো দেবে"?

"নিশ্চয় দেবো মা। নিশ্চয় দেবো।"—বললেন ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে বিরাট সম্পত্তির মালিক লুথার মার্শ। দানপত্রের দলিল তৈরি হয়ে গেল। মার্শের আত্মীয়স্বজন দেখলেন অবস্থা সঙ্গীন, যা করার এই বেলা। তাঁরা আর কালবিলম্ব না করে যা করবার করলেন, ফলে শ্রীমতী ও শ্রীমৎ ডিস-ডেবার প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন। মামলা আদালতে উঠল। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য শ্রীমতী বেছে নিলেন একজন তরুণ এবং সুদর্শন আইনজীবীকে। এ মামলার নাটকীয় দিকটা আকৃষ্ট করল শ্রীমতীকে ; তিনি এতে 'পাবলিসিটি' অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞাপনের একটা চমৎকার সুযোগ দেখতে পেলেন। তিনি রটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন যে, মামলার ব্যাপারে লৌকিক উকিল ছাড়া তিনি অলৌকিক পরামর্শও নিচ্ছেন, বিভিন্ন আইনজ্ঞ আত্মার কাছ থেকে। তারপর 'সিসেরো' (খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর বিখ্যাত রোমান বাগ্মী, দার্শনিক এবং রাজ-নীতিবিশারদ) এবং তাঁর দশজন পরামর্শদাতার নির্দেশে, শ্রীমতী ডিস-ডেবার ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর সম্পত্তির দলিল ফিরিয়ে দিলেন মার্শের হাতে। কিন্তু ফৌজদারী মামলা তাতে বন্ধ হল না।

শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে প্রতারণার অভিযোগে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখা গেল না। তিনি বললেন, "আমি যা করেছি সবই খাঁটি আত্মিক ক্ষমতায়—এর ভেতর কোনো ফাঁকি ছিল না।"

কিন্তু ফাঁকি যে ছিলই এবং ফাঁকিই যে ছিল, সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই সরকারপক্ষ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আদালতে উপস্থিত করলেন তখনকার বিখ্যাত যাতুকর কার্ল হার্টজকে (Carl Hertz)। তিনি মুক্ত আদালতে দিন-তুপুরে সর্বসমক্ষে হাতে কলমে প্রমাণ করে দেখাবেন যে, তথাকথিত ভৌতিক খেলাগুলো মোটেই ভৌতিক বা অলৌকিক নয়, নিছক হাতসাফাই বা ভেল্কির ব্যাপার, স্রেফ চাতুরি, এর সঙ্গে পরলোক বা আত্মার কোনো সম্পর্ক নেই। এই প্রসঙ্গে যাতুকর কার্ল হার্টজ্ তাঁর একটি বন্ধুকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাই থেকে উদ্ধৃত করি :

"শ্রীমতী ডিস ডেবার তখন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। আমি তাঁকে আর জুরিদের একফালি সম্পূর্ণ সাদা চিঠির কাগজ দেখালাম। কাগজটি শ্রীমতীর হাতে দিয়ে বললাম সেটিকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে পর পর চারবার ভাঁজ করতে। চারবার ভাঁজ করা ঠিক ঐরকম আরেক ফালি চিঠির কাগজ—তার ভেতরের দিকে ছোট্ট একটি চিঠি লেখা—গোপনে লুকানো ('পাম' করা) ছিল আমার হাতে। শ্রীমতী তাঁর হাতের কাগজটি চারবার ভাঁজ করে আমার হাতে দিতেই সবার অলক্ষ্যে চোখের নিমেষে আমার আসল কাজটি করা হয়ে গেল—শ্রীমতীর পরীক্ষিত কাগজটি লুকিয়ে পড়ল আমার হাতের তালুতে, আর তার জায়গায় আমার আঙুলের ডগায় ধরা রইল ভেতরে লেখাসুদ্ধ ভাঁজ করা কাগজ। আমি বললাম, 'এবারে এই কাগজটিকে আমার কপালে চেপে ধরে রাখুন।' শ্রীমতী বললেন, 'দাঁড়ান, কাগজে আমি একটা চিহ্ন দিয়ে দিই।' অর্থাৎ আমি যেন কাগজ বদল করে ফেলতে না পারি। কিন্তু তিনি (আমাকে জব্দ করবার জন্য) ঠিক এমনটিই করবেন ধরে নিয়ে আমি কাগজ-বদলটা যে আগেই সেরে রাখব তা তিনি বুঝতে পারেন নি। হাতের ভাঁজকরা কাগজটির ভাঁজ না খুলেই তিনি একটি কোণ ছিঁড়ে ফেলে দিলেন ; ঐ ছেঁড়া কোণ দিয়েই কাগজটিকে চেনা যাবে। তারপর ঐ চিহ্নিত কাগজটির ভাঁজ নিজের হাতে খুলে তার ভেতর লেখা দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন।…"

এর পর শ্রীযুত লুথার মার্শকে সহকারীরূপে নিয়ে যাদুকর হার্টজ শ্রীমতীর আরেকটি ফাঁকির কৌশল ফাঁস করে দিলেন।

"এ খেলাটিতে," যাদুকর হার্টজ্ লিখছেন তাঁর বন্ধুকে, "একটি একশো শাদা পৃষ্ঠার যে প্যাড দেখালাম, তাতে কোনো পৃষ্ঠায় কিছু লেখা নেই। প্যাডটি খবরের কাগজে জড়িয়ে তার একদিক ধরতে দিলাম মার্শকে। অন্যদিক ধরলাম আমি। একটু পরেই খস খস করে লেখার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। তারপর খবরের কাগজের ভেতর থেকে প্যাডটি বার করে দেখা গেল ভেতরের সবগুলো পৃষ্ঠা লেখায় ভরে গেছে।"

এই ভুতুড়ে মার্কা ব্যাপারটি কি করে সম্ভব হলো ? কাল হার্টজ লিখছেন :

"এ খেলার জন্য আমার ছিল দুটি একরকম প্যাড। একটি লুকিয়ে রেখেছিলাম আমার ওয়েস্টকোটের তলায় (এটির কথা আর কেউ জানতো না) ; অন্যটি দিয়েছিলাম মার্শকে পরীক্ষা করতে। বলা বাহুল্য, ওয়েস্টকোটের তলায় লুকানো প্যাডের ভেতরের পৃষ্ঠাগুলো ছিল লেখায় ভর্তি। তারপর পরীক্ষিত

প্যাডটি খবরের কাগজে জড়াবার ছলে ঐ খবরের কাগজের আড়ালেই সবার অলক্ষ্যে প্যাড বদল করে ফেললাম। (অর্থাৎ পরীক্ষিত শাদা প্যাডটি চলে গেলো ওয়েস্টকোটের তলায়, আর ওয়েস্টকোটের তলা থেকে 'লেখায় ভরা' প্যাডটি জড়ানো হতে লাগল ঐ খবরের কাগজে)। শ্রীমতী ডিস-ডেবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'প্যাডে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখুন। বোকা বনবেন না।' প্যাডের ওপরের পাতার একটা কোণ ছিঁড়ে প্যাডটিকে চিহ্নিত করা হলো, কিন্তু তাতে কিছু এল গেল না, কারণ আসল কাজটি আগেই করে ফেলা হয়েছিল।"

সেই খবরের কাগজে জড়ানো প্যাডটির একদিক ধরলেন মার্শ, অন্যদিক যাদুকর হার্টজ্। আদালত ঘরে যেন একটি আলপিন পড়লেও শোনা যাবে। সেই নীরবতার বক্ষে সুড়সুড়ি দিয়ে লেখার খস্‌খস্ আওয়াজ শুরু হলো। তারপর খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে প্যাডটি বার করে শ্রীযুত মার্শ পরম বিস্ময়ে দেখলেন প্যাডটির পাতার পর পাতা লেখায় ভরে গেছে। অথচ একটু আগে নিজেই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন প্যাডের সবগুলো পাতাই শাদা!

কিন্তু লেখার খস্‌খস্ আওয়াজটা কিভাবে হয়েছিল? যাদুকর হার্টজ্ দেখালেন তাঁর তর্জনীর নখটি ছুঁচলো করে কাটা, এবং মাঝামাঝি ফাড়া। এ নখই কাগজের তলায় ঘসে ঘসে তিনি লেখার খস্‌খস্ আওয়াজের নকল করেছিলেন।

এই রকম আরো নানা প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফলে কোনো মনেই কোনো সংশয় রইল না, কিন্তু শ্রীমতী ডিস ডেবারের অসামান্য ব্যক্তিত্বের এমান যাদু যে একজন জুরী শেষ পর্যন্ত তাঁকে অপরাধিনী সাব্যস্ত করতে বাধ্য হলেও অনেকক্ষণ এই মতের বিরোধিতা করেছিলেন। এবং তাঁকে অপরাধিনী সাব্যস্ত করতে রাজী হয়েছিলেন শুধু একটি শর্তে: শ্রীমতীকে অনুকম্পার যোগ্য বিবেচনা করে হাল্কা শাস্তি দিতে হবে। হাল্কা শাস্তিই দেওয়া হয়েছিল—ছয় মাসের সরকারী আতিথ্য।

উত্তর দেশের যাদুকর

শহর—লণ্ডন। সাল···১৮১৫ খৃষ্টাব্দ। ঋতু—গ্রীষ্মের শেষভাগ। ইংলণ্ডের সিংহাসনে সমাসীনা মহারানী ভিক্‌টোরিয়া। লাইসিআম (Lyceum) থিয়েটারে কিছুদিন ধরে চলছে একজন বিখ্যাত যাদুকরের যাদু প্রদর্শন। যাদু প্রদর্শনের বিজ্ঞাপিত মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে, এমনি সময় দুটি মহিলার স্বাক্ষরিত একটি ছাপানো প্রচার-পত্র বহু সংখ্যায় বিতরিত হয়ে সারা শহরে সাড়া জাগালো। প্রচার-পত্রটির যথাসম্ভব হুবহু বাংলা তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায় :

"ইংলণ্ডের মহিলাদের প্রতি···

"লাইসিআম থিয়েটার থেকে সাবধান! প্রফেসর অ্যাণ্ডারসনের অদ্ভুত ব্যবহার! ভগিনীগণ, বড় দুঃখের সহিত আমরা একটি নালিশ জানাচ্ছি, আমরা দুজন দরিদ্র অসহায়া বিধবা, আমাদের এই সাম্প্রতিক বৈধব্যের জন্যে দায়ী অদ্ভুত চরিত্রের মিস্‌টার অ্যাণ্ডারসন, লাইসিআমের শয়তান যাদুকর। আমাদের নাম শ্রীমতী মার্গারেট উইলসন এবং শ্রীমতী ডরোথি জোন্‌স্‌। আমাদের স্বামীর একজন ছিলেন দরজি, তাঁর নাম ছিল মিস্‌টার উইল্‌সন, আরেকজন টিন প্লেটের কাজ করতেন, তাঁর নাম ছিল মিস্‌টার জোন্‌স্‌। যাদুকরের খুব নামডাক শুনে গত সোমবার রাত্তিরে আমরা গেলাম লাইসিআম থিয়েটারে। আমাদের স্বামীরা মাথাপিছু দু শিলিং করে প্রবেশমূল্য দেবার পর আমরা ঢুকতে পেলাম। ভেতরে এত ঠেলাঠেলি ভিড়, যে মাত্র তিন হপ্তা আগে বানানো আমাদের নতুন জামা-কাপড়ের দফা প্রায় রফা হবার যোগাড়। যাইহোক, অনেক হাঙ্গামা হুজ্জুত করে তো জায়গা দখল করে বসা গেল। তারপর খেলা শুরু হলে যে সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে লাগলাম তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না।··· অনেক বিস্ময়কর খেলা দেখিয়ে তারপর মিস্‌টার অ্যাণ্ডারসন (লোকটাকে 'প্রফেসর' অ্যাণ্ডারসন কেন বলা হয় জানি না) এক মস্ত ঝুড়ি এনে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর একটি ফুটফুটে ছোট্টো ছেলেকে টেবিলের ওপর বসিয়ে ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়ে তিনি ঝুড়িটি তুলে নিতেই আমরা দেখলাম—কী সর্বনাশ! ছেলেটি বেমালুম উধাও! এর পরে আর একটি ছেলে আর একটি মেয়েকেও যাদুকর বেমালুম উড়িয়ে দিলেন। ব্যাপার দেখে

আমাদের পতি দেবতারা—এঁরা দুজনেই যেমন গোঁয়ার তেমনি বোকা—জেদ ধরলেন স্টেজে উঠে গিয়ে দেখবেন যাদুকর ওঁদেরও উড়িয়ে দিতে পারেন কিনা! আমরা অনেক বোঝালাম, 'যেও না, গেলেই অনর্থ ঘটবে।' কিন্তু পুরুষ মানুষের গোঁ, অবলা নারীর সাধ্য কি তাতে বাধা দেয়? মিস্টার উইল্‌সন প্রথমে গেলেন, ঢাকা পড়লেন ঝুড়ির তলায়। যাদুকর ঝুড়ি তুললেন—মিস্টার উইল্‌সন হাওয়া! তারপর গেলেন মিস্টার জোন্‌স্। তিনিও হাওয়া হয়ে গেলেন! আমরা দুজন অবলা স্ত্রী প্রতীক্ষা করে রইলাম, কিন্তু স্বামীরা ফিরলেন না। খেলার শেষে হল্ ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল, আমরা সভয়ে লক্ষ্য করলাম আমাদের স্বামীরা তবু ফিরছেন না। ওঁরা বেরিয়ে গেছেন ভেবে বাইরে গিয়ে গোরু খোঁজা খুঁজলাম। ওঁদের টিকিও দেখতে পেলাম না। বাড়ী ফিরে গেলাম, অপেক্ষা করে রইলাম সারারাত জেগে জেগে। বৃথা রাত জাগা। ফিরলেন না আমাদের স্বামীরা।

"পরদিন ভোরবেলা শয়তান যাদুকরের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলাম। অনেক কষ্টে বিকেলবেলা তাঁর দেখা পেলাম। বললাম, 'ফিরিয়ে দাও আমাদের স্বামীদের।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, দেখবোখন কি করা যায়।' দেখবোখন কি করা যায়! ততক্ষণ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আমরা খাই কি? শুনে মনিব্যাগ খুলে উনি আমাদের দুজনের হাতে এক পাউণ্ড করে দিলেন। সারা মঙ্গলবারটা কাটল মহা উদ্বেগে, তারপর বুধবার বিকেলে গেলাম, যাদুকরের সঙ্গে কিছুতেই দেখা করা গেল না। বিষ্যুৎবার অনেক কষ্টে দেখা মিলল বটে, কিন্তু উনি বললেন, 'আমি বড় দুঃখিত, আপনাদের স্বামীরা দুজনেই এত দূরে চলে গেছেন যে ওঁদের খুঁজে আনবার মতো সময় আমার নেই। এই ক্রীসমাসের মরশুমে কোভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারে আমার নতুন যাদুপ্রদর্শন শুরু হবে, তারই তোড়-জোড়ে আমি এখন বড়ো ব্যস্ত। অবশ্য পরে ফুরসৎ পেলেই আপনাদের স্বামীদের খোঁজ করবার চেষ্টা করব। যতদিন তাঁদের ফেরৎ না পান ততদিন চুপচাপ থাকুন, এ নিয়ে সোরগোল করবেন না। এই চুপ করে থাকার জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেককে হপ্তায় এক পাউণ্ড করে দেব।' কি ধৃষ্টতা! স্বামীর বদলে হপ্তায় এক পাউণ্ড!

"ভগিনীগণ! আমরা বিচার চাই, স্বামীদের ফিরে পেতে চাই! গরিব অবলা নারী আমরা, আদালতে মোকদ্দমা করবার পয়সা আমাদের নেই। বিধবা না হয়েও আমরা বিধবার চাইতে বেশি অসহায়া। একজন সহৃদয় ছাপাখানার মালিক দয়াপরবশ হয়ে বিনামূল্যে আমাদের এই আবেদন-পত্র ছেপে দিয়েছেন।

আশা করি অন্তত কয়েকজন সহৃদয় ভগিনী আমাদের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে একজন উকিলের বন্দোবস্ত করে দেবেন, যিনি আদালতে আমাদের হয়ে মোকদ্দমা লড়ে আমাদের সুরাহা করে দিতে পারবেন। আপনাদের কাছে এই আমাদের মর্মান্তিক প্রার্থনা। ইতি।

মার্গারেট উইল্‌সন, ৪৯, ফুলউড্‌স্ বেণ্টস্, হবার্ন।
ডরোথি জোন্‌স, ঐ (দোতলা)।

প্রথমেই বলেছি, বহু সংখ্যায় প্রচারিত এই অ-সাধারণ ইস্তাহারটি সারা শহরে বেশ চমক এবং সাড়া জাগিয়েছিল! যাদু প্রদর্শনের জগতে চমকদার বিজ্ঞাপনের (sensational publicity)এটি একটি চমৎকার উদাহরণ। মজাদার এই আবেদন-পত্রটির খসড়া করেছিলেন স্বয়ং যাদুকর জন হেনরি অ্যাণ্ডারসন, যিনি নিজেকে 'উত্তর দেশের যাদুকর' (Wizard of the North) বলে প্রচার করতে করতে ঐ উপনামেই বিখ্যাত হয়ে যান। প্রচার মাহাত্ম্য তিনি বেশ ভালোই জানতেন, এবং পুরোপুরি তার সদ্ব্যবহার করতে কখনো চেষ্টার ত্রুটি রাখতেন না। সাধারণ মামুলী ধরনের বিজ্ঞপ্তির চাইতে ঐ অভিনব চমক জাগানো আবেদন-পত্রের ছদ্মবেশে বিজ্ঞাপন যে অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। লাইসিআম থিয়েটারে প্রফেসর অ্যাণ্ডারসনের (নামের আগে এ ধরনের 'প্রফেসর' বসানোর রেয়াজটা নতুন নয়) যাদু প্রদর্শন দেখতে যাঁরা তখনো পর্যন্ত যান নি, এই বিচিত্র আবেদন-পত্রটি পড়ে তাঁদের অনেকেই গিয়েছিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে কোভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারে আসন্ন ক্রীসমাসে 'উত্তর দেশের যাদুকর'-এর নতুন যাদু প্রদর্শনের মরশুম শুরু হবে।

'উত্তর দেশের যাদুকর' উপনামে খ্যাত ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ালটার স্কট, যাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "আইভান-হো"-র সঙ্গে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'দুর্গেশ-নন্দিনী'-র আশ্চর্য মিল আছে। স্কটল্যাণ্ড ইংলণ্ডের উত্তরে, এবং ওয়ালটার স্কট কথাসাহিত্যের 'যাদুকর' লেখক, এই জন্যেই সাহিত্যামোদী মহলে তিনি 'উইজার্ড অভ্ দ্য নর্থ' উপনামে খ্যাত হয়েছিলেন। সম্ভবত স্কটের এই উপনামটি শুনেই পছন্দ হয়ে যাওয়ায় এবং নিজেও উত্তর দেশের মানুষ এবং পেশায় যাদুকর হওয়ায় অ্যাণ্ডারসন এটিকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বলতেন এই উপনামটি স্বয়ং স্যার ওয়ালটার স্কট তাঁকে

দিয়েছিলেন। অ্যাবট্‌স্‌ ফোর্ড শহরে যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের যাদুর খেলা দেখে স্কট নাকি বলেছিলেন, "লোকে আমাকে বলে 'উত্তর দেশের যাদুকর', কিন্তু মিস্‌টার অ্যাণ্ডারসন, আমার মনে হয় এই নামটি আপনার পক্ষেই বেশি উপযোগী। সুতরাং আপনি এই নামই গ্রহণ করুন।"

এখানে বলে রাখা দরকার, অ্যাণ্ডারসনের উল্লেখযোগ্য যাদু প্রদর্শন শুরু হয় ১৮৩৭ সালে, কিন্তু ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্‌টার স্কটের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে। তার আগে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই স্কটের শরীর ও মন দুই-ই ভেঙে পড়েছিল। তাই মনে হয়, ঔপন্যাসিক স্কট অ্যাণ্ডারসনকে 'উত্তর দেশের যাদুকর' নাম দিয়েছিলেন একথা হয়তো ঠিক নয়। ঐ উপনামটুকু সম্ভবত নিজেই নিজেকে দিয়েছিলেন যাদুকর অ্যাণ্ডারসন। কিন্তু তাঁর বড় সাধের এই উপনামটির জন্যে তাঁকে কয়েকবার কি রকম বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল তাই বলছি। একবার স্কটল্যাণ্ডের এল্‌গিন শহরে বেশ সাফল্যের সঙ্গে যাদু প্রদর্শন করে তিনি গেলেন তার মাইল-বারো দূরে ফরেস (Forres) নামে একটি ছোটো শহরে যাদু প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করতে। ফরেসের অনতিদূরে ধূ ধূ করা নির্জন প্রান্তর, সেই প্রান্তরের নিরালাতেই ম্যাকবেথ তিনটি রহস্যময়ী যাদুকরী ডাইনীর দেখা পেয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি ছিল। এই তিনটি ডাইনীর অশুভ প্রভাবের ফলেই বীর সেনাপতি ম্যাকবেথ তাঁর গৃহে অতিথি বৃদ্ধ রাজা ডানকানকে হত্যা করে স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, এবং পরে নিয়তির বিধানে এই পাপের শাস্তি হিসেবে তাঁকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল – যে কাহিনী শেক্স-পিয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটকে অমর হয়ে আছে। ঐ ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে সন্ধ্যার পর কেউ যাতায়াত করতে ভরসা পেতো না, এমন কি দিন দুপুরেও ওপথে যেতে অনেক সাহসী মানুষেরও গা ছমছম করতো। ডাইনীদের যাদুর পাল্লায় পড়েই ম্যাকবেথকে অমন শোচনীয় পরিণাম সইতে হয়েছিল, সুতরাং ঐ প্রান্তরের আশেপাশের মানুষের মনে যাদুবিদ্যা এবং যাদুকরের সম্পর্কে একটা ভীতির ভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক।

যাদুকর অ্যাণ্ডারসন প্রথমেই ফরেস শহরের এক ছাপাখানায় গিয়ে তাঁর আসন্ন যাদু প্রদর্শনীর আগাম জানানি দেবার জন্যে হ্যাণ্ডবিল ছাপতে দিলেন। তারপর ছাপাখানার মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কয়েকদিনের জন্যে কোথায় আশ্রয় নেওয়া যায়।" মালিক তাঁকে এক বিধবা ভদ্রমহিলার খোঁজ দিয়ে বললেন, "এঁর বাড়িতে খান দুয়েক ঘর খালি আছে। আপনি ভাড়া নিতে পারেন।"

অ্যাণ্ডারসন গেলেন, ঘর দেখলেন, পছন্দ হলো। বললেন, "সাত দিনের জন্যে ভাড়া নিলুম।"

বিধবা বাড়িওয়ালি বললেন, "কিছু মনে করবেন না, অনেক ঠকে ঠকে এখন আর ঠকবার সাধ নেই। আপনি দেখতে শুনতে খুবই ভদ্রলোক, তবু কথায় বলে সাবধানের মার নেই। অর্ধেক ভাড়া আগাম দিতে হবে।" অ্যাণ্ডারসন সঙ্গে সঙ্গে আগাম টাঁকা দিয়ে দিলেন বাড়িওয়ালিকে। বুড়ি ভারি খুশি।

ঘর ভাড়ার ব্যাপারটা চুকিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। অ্যাণ্ডারসন ভাবলেন একবার ছাপাখানায় গিয়ে দেখে আসা যাক হ্যাণ্ডবিল ছাপার কাজ কতটা এগুলো। বৃষ্টি হবার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল বলে সঙ্গে ছাতা এনেছিলেন, কিন্তু এখন দেখলেন আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে, অতএব অনর্থক ছাতার বোঝা বইবেন কেন? বললেন, "আমার ছাতাটা আপনার কাছেই রাখুন, আমি একটু কাজ সেরে আসছি।" বাড়িওয়ালির কাছে ছাতা রেখে তিনি চলে গেলেন ছাপাখানায়।

নগদ টাকা হাতে পেয়ে নতুন অতিথির ওপর বুড়ির মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অতিথি বেরিয়ে যাবার পর, তাঁর ছাতাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি দেখলেন ছাতার হাতলের ওপর লেখা রয়েছে "Great wizard of the North"—অর্থাৎ "উত্তর দেশের মহা যাদুকর।"

ছাপাখানা থেকে ফিরে এসে যাদুকর দেখলেন বুড়ির হাবভাব একেবারে বদলে গেছে। তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছেন ভদ্রমহিলা, আর নিজে আপাদ-মস্তক কাঁপছেন থরথর করে, দুই চোখে ভীত সন্ত্রস্ত ভাব।

বিষম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ি বললেন, "আপনি কে? কি করা হয় আপনার?"

বুড়ির ভয় দেখে একটু কৌতুক বোধ করে অ্যাণ্ডারসন হেসে বললেন, "আমি একজন ভয়ানক চরিত্রের লোক। আমাকে হয়তো আগে দেখেন নি কখনো, কিন্তু আমার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমার নাম অ্যাণ্ডারসন, 'উত্তর দেশের যাদুকর' বলে আমায় একডাকে সবাই চেনে।"

বিধবা বাড়িওয়ালি ভীষণ ভয় পেয়ে ছাতাটা যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "দয়া করে তাহলে শিগগির বেরিয়ে যান। আমার বাড়ীতে যাদুকরকে ঠাঁই দিতে পারব না। এই নিন আপনার টাকা। আর কখনো এ মুখো হবেন না।" বলে যাদুকরের দেওয়া টাকাগুলো মেঝের ওপর ছুঁড়ে

ফেলে দিয়েই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে গেলেন। পড়বার সময় একটা টুলে তাঁর মাথা ঠুকে গেল, গায়ের ছাল উঠে গেল খানিকটা। বুড়ির চিৎকার শুনে পাড়াপড়শিরা ছুটে এসে দেখেন বুড়ি অজ্ঞান হয়ে মরার মতো পড়ে আছেন। ফাটা মাথা থেকে রক্ত পড়ছে। দেখে মেয়েরা চিৎকার করে উঠলেন, "লোকটা খুন করেছে বুড়িকে।" আর পুরুষরা পাকড়াও করলেন 'খুনী' যাদুকরকে।

এমনি সময় এল্‌গিন শহরে যাবার ঘোড়ার গাড়ি এসে হাজির। গাড়োয়ান চিনত যাদুকর অ্যাণ্ডারসনকে, অনেকবার তাঁর যাদুর খেলা দেখে দেখে তাঁর বেশ ভক্তও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কথা কে তখন শোনে? 'খুনী' লোকটাকে ছেড়ে দিতে কেউ রাজী নয় তাঁরা।

অ্যাণ্ডারসন দেখলেন গতিক সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না; বুড়ি কি মরেই গেল নাকি? বললেন, "আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে চলো।" মনে ভাবলেন ব্যাপারটা ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝিয়ে বলাই নিরাপদ।

কিন্তু মাইল-সাতেকের মধ্যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন না। এই সন্ধ্যায় কে আবার হাঙ্গামা করে অত মাইল দূরে যায়? সুতরাং দুজন পুলিশ কনস্টেবল ডেকে যাদুকর অ্যাণ্ডারসনকে সে রাতটা বন্দী থাকবার জন্যে জেলখানার হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান অগত্যা উত্তর দেশের যাদু-করকে না নিয়েই চলে গেল এল্‌গিন শহরে সেই থিয়েটারে, যেখানে সেই সন্ধ্যাবেলায় যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের যাদু প্রদর্শন হবার কথা। যাদু দর্শনার্থীরা হল্ ভর্তি করে ফেলেছে, আর সময় হয়ে গেছে অথচ যাদুকরের টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না বলে অনেকে ক্ষেপে উঠেছেন। এমনি সময় সেই গাড়োয়ান গিয়ে খবর দিল যাদুকর এক বুড়িকে খুন করে ফরেস-এর জেল হাজতে বন্দী রয়েছেন, যাদুর জোরে সেখান থেকে বেরোতে পারেন নি।

বুড়িকে খুন করেছেন যাদুকর অ্যাণ্ডারসন! শুনে সারা হলময় একটা শিহরণের সাড়া জাগল যেন। তারপর সবাই হৈ হৈ শুরু করে বললেন, "টিকিটের দাম ফেরৎ চাই।" নিশ্চয়, নিশ্চয়। এ তো খুবই ন্যায্য কথা। দাম ফেরৎ দেওয়া হলো সবাইকে। এল্‌গিন শহরে সে রাতে সবার মুখে এক কথা, "যাদুকর অ্যাণ্ডারসন এক বুড়িকে খুন করে ফেলেছেন! কি আশ্চর্য! কি সর্বনাশ!"

খবর পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট এসে পড়লেন পরদিন ভোরবেলা। ততক্ষণে বুড়ি সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। তাঁর মুখে সমস্ত ঘটনাটা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট

তাড়াতাড়ি হাজত থেকে যাদুকরকে মুক্তি দিয়ে এই অসুবিধার জন্ত তাঁর কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এ খবরটা যথারীতি পৌঁছে গেল এল্‌গিন শহরে, আর এ-দ্বারা চমৎকার প্রচার বা 'পাবলিসিটি'র কাজ হলো যাদুকরের। অ্যাণ্ডারসন আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক এসে তাঁর যাদু প্রদর্শনীতে ভিড় করতে লাগল। ফলে যে কয়দিন তাঁর এল্‌গিন শহরে যাদু প্রদর্শন করার কথা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি দিন তাঁকে থাকতে হলো। সুতরাং বলা চলে এক রাত জেলখানার হাজত-বাস আপাতদুঃখকর হলেও যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের পক্ষে শাপে বর হয়েছিল।

উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৪২ সালে। এর এগারো বছর বাদে যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের যে আরেকটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটিও অনেকটা ঐ ধরনের। বলা যায় ট্র্যাজি-কমিক (tragi-comic), অর্থাৎ ব্যাপারটা প্রায় ট্র্যাজেডি হতে হতে শেষ পর্যন্ত কমেডিতে পরিণত হলো। সেই কাহিনীটি বলি।

মহারানী ভিক্‌টোরিয়া তখন স্কটল্যাণ্ডে বালমোরাল-এর (Balmoral) প্রাসাদে অবস্থান করছেন। যাদুকর অ্যাণ্ডারসন পেলেন মহারানীর আমন্ত্রণ—প্রাসাদে একদিন যাদু প্রদর্শন করবার। অ্যাণ্ডারসন উঠলেন এসে মহারানীর প্রাসাদের কাছাকাছি ক্রেইথি (Craithie) নামক জায়গায় একটি সরাইখানায়। সেখানে সে সময় অতিথিদের ভেতর ছিলেন একজন রসিক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যিনি অ্যাণ্ডারসনকে ছোটবেলা থেকেই চিনতেন। সরাইখানার মালিক যে অত্যন্ত ভীতু, কুসংস্কারগ্রস্ত চরিত্রের লোক, তাও তাঁর জানা ছিল। তিনি ভাবলেন সরাইওয়ালাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে একটু রগড় দেখা যাক।

"ওহে বাপু, নতুন অতিথিকে যে বড়ো আদর-আপ্যায়ন করে ঠাঁই দিলে, জানো লোকটা কে?" দূর থেকে যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের দিকে ইঙ্গিত করে রসিক বৃদ্ধ বললেন সরাইওয়ালাকে কানে কানে ফিস ফিস করে, অত্যন্ত রহস্যময় ভঙ্গিতে।

সরাইওয়ালা বললে, "আজ্ঞে না, কর্তা। কোনো বড়োলোক-টড়োলোক হবেন, এদিকে বেড়াতে এসেছেন; ওঁর চেহারা আর সাজপোশাক দেখেই বুঝে নিয়েছি।"

বৃদ্ধ বললেন, "ছাই বুঝেছ। ইনি একজন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন যাদুকর। উত্তর দেশের যাদুকরের নাম শোনো নি? ইনি সেই।"

শুনে পরম উদ্বিগ্ন হয়ে সরাইওয়ালা বললে, "যা—দু—ক—র! সত্যি সত্যি যাদু জানেন?"

রসিক বৃদ্ধ আরো গম্ভীর, আরো রহস্যময় ভঙ্গিতে বললেন, "ভয়ানক সত্যি সত্যি। যাদুর জোরে তোমার পকেটের সব টাকা উনি নিজের পকেটে নিয়ে নিতে পারেন। তোমার সোনা-রুপোর টাকা বা অন্য যা-কিছু আছে, যাদুর ছোঁয়ায় সীসে বানিয়ে দিতে পারেন। তোমার রুমাল পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে তোমার চোখের সামনে সেই ছাইকে আবার আস্ত রুমাল বানিয়ে দিতে পারেন। আরো যে কতো রকম অদ্ভুত কাণ্ড করতে পারেন, তা তোমায় আর কি বলবো? তালা-চাবি বন্ধ করে একে আটকে রাখা যায় না। বন্দুকের গুলি চালিয়ে এঁকে ঘায়েল করা যায় না, দাঁত দিয়ে কামড়ে ইনি গুলি ধরে ফেলেন।"

সর্বনাশ! তাহলে এখন উপায়? না জেনে এমন সাংঘাতিক লোককে আশ্রয় দিয়ে ফেলে তো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে! ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল সরাইওয়ালা। কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে সে বহু কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে যাদুকরকে পরম বিনীতভাবে অনুরোধ করল তার সরাইখানা ছেড়ে যেতে। কিন্তু আশ্রয় নেবার মত জায়গা কাছাকাছি আর কোথাও ছিল না, তাই অ্যাণ্ডারসন রাজী হলেন না সরাইখানা ছাড়তে। অথচ তাঁকে জোর করে তাড়াবার মত সাহস বা ক্ষমতাও নেই সরাইওয়ালার। সে বেচারা এ ব্যবসায় যা-কিছু পয়সা কামিয়েছিল সব ধাতুর মুদ্রায় জমিয়ে রেখেছিল তার ঘরেই। তার মনে হলো এই যাদুকরটির সঙ্গে একই ছাতের তলায় যখন থাকতে হচ্ছে, তখন ঘরে ধাতুর মুদ্রা রাখা নিরাপদ নয়। তার সব টাকাগুলো থলিতে পুরে নিয়ে এক ফাঁকে ব্যাংকে চলে গিয়ে মুদ্রার বদলে কাগজের নোট নিয়ে এসে তার নিজের বিছানায় একটি বালিশের ভেতর সবগুলো নোট লুকিয়ে রেখে দিল।

তারপর ঘটল মজার ব্যাপার। সরাইখানায় অতিথির আধিক্য ঘটল। সরাইখানার পরিচারিকা একজন নতুন অতিথিকে দেবার জন্য সরাইওয়ালার বিছানা থেকে একটি বালিশ নিয়ে গেল সরাইওয়ালার অজানিতেই। বিধাতার ছিল রগড়ের মতলব, তাই পরিচারিকার হাতে ঠিক সেই বালিশটিই গেল যার ভেতরে ছিল সরাইওয়ালার জীবনের সঞ্চয়—সব নোটের টাকায়। রাতে শুতে এসে বিছানার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল সরাইওয়ালা। একটা বালিশ নেই, আর সেই বালিশেই লুকানো তার সমস্ত টাকা! এ নিশ্চয় সেই সর্বনেশে যাদুকরের কাজ। নিশ্চয় সেই লোকটাই যাদুর জোরে টাকাওয়ালা বালিশটি সরিয়েছে।

এতগুলো টাকার শোক সোজা নয়। সেই শোকে ভয় ভুলে গিয়ে শাসাতে লাগল যাদুকরকে—"শিগগির আমার বালিশ বার করুন মশাই, নইলে আমি

পুলিশ ডাকব।" খবর পেয়ে ছুটে এল পরিচারিকা, সেই বালিশটি নিয়ে। বলা বোধ হয় বাহুল্য, সব টাকাই পাওয়া গেল বালিশের ভেতর। তখন শুরু হলো সরাইওয়ালার ক্ষমা চাওয়ার পালা। হাসিমুখে তাকে ক্ষমা করেও দিলে যাদুকর অ্যাণ্ডারসন।

এবারে শোনাই 'উত্তর দেশের যাদুকর'-এর মার্কিন অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি যখন তাঁর যাদু প্রদর্শনী নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম গেলেন, তখন সেখানে ক্রীতদাস প্রথা নিয়ে উত্তরের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর প্রচণ্ড মতভেদ এবং সংঘর্ষ চলছে। উত্তুরেরা দাবি করছে, "ক্রীতদাস প্রথার অবসান হোক"; আর দক্ষিণেরা তার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছে, জোর গলায় বলছে; "ক্রীতদাস প্রথা আলবৎ চালু থাকবে। ক্রীতদাস প্রথা যদি কেন্দ্রীয় আইনসভায় আইন করে লোপ করে দেওয়া হয় তা হলে আমরা উত্তরীদের সঙ্গে এক রাষ্ট্রে থাকব না, আমরা দক্ষিণীরা দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোকে একত্র করে আলাদা যুক্তরাষ্ট্র করব।" রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন বলিষ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, দেশকে দ্বিখণ্ডিত করবার এই সর্বনেশে দক্ষিণী সংকল্পে তিনি সর্ব শক্তি দিয়ে বাধা দেবেন। এর ফলে যদি গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়, তবুও গৃহযুদ্ধের আশু অকল্যাণ এড়াবার জন্যে তিনি দেশ বিভাগের চরম অকল্যাণ কিছুতেই মেনে নেবেন না। স্বদেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আদর্শ রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের এই অনমনীয় দৃঢ়তার ফলে দাস-প্রথা-অবসান-বিরোধী দক্ষিণেরা আরো ক্ষেপে উঠল। সংঘর্ষ বাধল উত্তরে দক্ষিণে।

এই অস্বস্তিকর আবহাওয়ার ভেতরেই—কি ছিল বিধাতার মনে!—যাদু প্রদর্শনের মতলবে যাদুকর অ্যাণ্ডারসন প্রথম দর্শন দিলেন মার্কিন দেশে। অ্যাণ্ডারসনের ম্যানেজার সাটিন চলে গেলেন ভার্জিনিয়ায়, আগাম প্রচারের ব্যবস্থা করবার জন্য। (ভার্জিনিয়া দক্ষিণেদের এলাকা, এ কথাটা মনে রাখা দরব বিরাট বিরাট পোস্টার তৈরি করিয়েছিলেন সাটিন। পোস্টারের বুকে বড়ো হরফে লেখা : "**Wizard of the North**" (উত্তর দেশের যাদুকর) তার ওপর যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের মুখের মস্ত ছবি। পোস্টারে ঘোষণা "উত্তর দেশের যাদুকর" শিগগিরই ভার্জিনিয়ায় আসছেন তাঁর অসাধারণ, অতুলনীয় অনমুকরণীয় যাদুর খেলা দেখাতে। ভালো জায়গা বেছে সাটনের ভাড়া করা লোকেরা এই পোস্টার লাগাতে লাগল। দক্ষিণেদের মেজাজ তো এমনিতেই মহা খাপ্পা হয়ে ছিল। এই পোস্টার দেখে সে মেজাজ আরও খাপ্পা হয়ে উঠল। "উত্তুরে" যাদুকরের এত বড়ো আস্পর্ধা, দক্ষিণ এলাকায় এসে 'অতুলনীয়' ভেলকি

দেখাবে বলে দক্ষিণের দেয়ালে দেয়ালে নিজের ঢাক পিটছে! দক্ষিণেরা বিষম উঠে সবগুলো পোস্টার ছিঁড়ে ফেলল, পোস্টার লাগানেওয়ালা লোক-জু উত্তম-মধ্যম লাগিয়ে তাড়িয়ে দিল, আর উত্তর দেশের যাতুকরের ছিঁড়ে নিয়ে (পোস্টার থেকে অবশ্য) তাই নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় যে-ভাবে লো তা থেকে আন্দাজ করা শক্ত ছিল না যাতুকরকে হাতের সামনে পেলে কি করতো। যাতুকরের ম্যানেজার সাটন অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন।...

যাতুকর অ্যাণ্ডারসনের ঘটনাবহুল জীবনের অনেক বিচিত্র কাহিনী আছে। তাই থেকে বেছে কয়েকটি কাহিনী বললাম।

যাদু জগতের আষাঢ়ে গল্প

হল ভর্তি লোক ক্ষেপে আগুন। সাড়ে সাতটা বাজতে চলল, এখনো পর্দা উঠছে না। অথচ ঠিক সন্ধ্যা ছটায় ম্যাজিক শুরু হবার কথা।

ম্যাজিক যিনি দেখাবেন, চারদিকে তাঁর ম্যাজিকের খ্যাতি। অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা দেখিয়ে তিনি অনেককে তাক লাগিয়েছেন। তার ওপর আজ তিনি নাকি কয়েকটি সম্পূর্ণ নতুন 'যুগান্তকারী' খেলা দেখাবেন, যার জুড়ি নেই। এই 'যুগান্ত-কারী' খেলা দেখে অবাক হবার লোভে লোভেই ভিড় হয়েছে অসম্ভব। হলের ভেতর আর তিল ধারণের জায়গা নেই, টিকিট না পেয়ে অনেকে হায়-হায় করতে করতে ফিরে গেছেন।

সমবেত জনতার উত্তেজনা যখন চরমে পৌছবার উপক্রম, এমন সময় ঘণ্টা পড়ল ঢং করে। ওপরে উঠে গেল স্টেজের পর্দা, দেখা গেল হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন 'ম্যাজিশিয়ান'। আশ্চর্য তাঁর বেহায়াপনা! বিজ্ঞাপিত সময়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে এসে হাজির হয়েছেন, এতে এক ফোঁটা লজ্জা হওয়া দূরের কথা, তিনি নমস্কার জানিয়ে অম্লান বদনে ঘোষণা করলেন, এইবার খেলা আরম্ভ হচ্ছে।

একদল ক্রুদ্ধ দর্শক দাবি করলেন, তিনি যে এতগুলো লোককে ঘণ্টা দেড়েক বসিয়ে রেখেছেন তার কৈফিয়ত চাই। ছটায় খেলা শুরু হবার কথা, তিনি সাড়ে সাতটায় এসে হাজির হলেন কোন্ আক্কেলে?

ম্যাজিশিয়ান তাঁর নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "মাপ করবেন। আপনারা বোধ হয় একটু ভুল করছেন। দয়া করে যাঁর যাঁর হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাবেন কি

যাঁদের যাঁদের হাতঘড়ি ছিল—অনেকেরই ছিল—তাঁরা তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা হল জুড়ে বিস্ময়ের একটা বিপুল স্রোত বয়ে গেল। প্রত্যেকেরই ঘড়িতে তখন ছটা।

এতক্ষণ পর্যন্ত যাঁরা ম্যাজিশিয়ানের ওপর ক্ষেপে আগুন হয়েছিলেন, এইবারে তাঁরা তাঁর এই অদ্ভুত যাদু দেখে বিস্ময়ে গলে জল হয়ে গেলেন। ম্যাজিশিয়ান আবার অমায়িক হাসি হাসলেন। বললেন, "এই হলো আমার প্রথম খেলা।"

ম্যাজিক সম্বন্ধে যেখানে আলোচনা হবে সেখানে এ গল্পটি কোনো-না-কোনো

রকমে শোনা যাবেই, এ প্রায় অবধারিত। এ গল্প আমি যে কতবার কত মুখে শুনেছি তার হিসেব নেই। গল্পটির মূল কাঠামোটুকুকে বিভিন্ন বক্তা নিজের খেয়ালখুশি এবং সাধ্যমতো শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত করবার চেষ্টা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বক্তাকে চেপে ধরলে দেখা যায় খেলাটি তিনি ঠিক নিজে দেখেন নি, দেখেছিলেন তাঁর পিসেমশায়ের জ্যাঠামশায়, মেজোকাকার মামাশ্বশুর, অথবা এমনি অপর কেউ, যাকে বলা চলে 'বিশ্বস্ত সূত্র'। দু-চারজন অবশ্য বলেন, "হ্যাঁ মশাই, এ আমার নিজের চোখে দেখা।" কিন্তু যেভাবে বলেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় কথাটা নিজেকেও বিশ্বাস করাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তিনি।

আমি বাল্যকাল থেকেই ম্যাজিকের ভক্ত। দেশী বিদেশী অনেক যাদুকরের যাদুর খেলা দেখেছি, কিন্তু এই আশ্চর্য খেলাটি দেখবার সৌভাগ্য আমার আজও হয় নি। সত্যি সত্যি কারও কখনও হয়েছে বা হবে কিনা সে বিষয়ে আমার মনে প্রচুর সন্দেহ রয়েছে।

বক্তাভেদে এ গল্পটির স্থান, কাল ও পাত্র ভেদ হয়ে থাকে! এদেশে এই গুজবটি শুরু হয়েছিল মার্কিন যাদুকর হাউয়ার্ড থার্সটন (Howard Thurston) সম্বন্ধে। থার্সটন তাঁর বিরাট যাদু-প্রদর্শনী নিয়ে ভারতে এসেছিলেন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। কলকাতায় এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখিয়ে তিনি যে অসামান্য খ্যাতি, জনপ্রিয়তা এবং অর্থলাভ করেছিলেন তা-ই তাঁর ভবিষ্যৎ অসামান্য সাফল্যের ভিত্তিস্বরূপ হয়েছিল। পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকররূপে খ্যাত হয়ে যাদু-জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি তাঁর যাদুজীবন সম্বন্ধে যে বইখানা লিখে গেছেন তাতে তাঁর ভারত বিজয়ের বিচিত্র বিবরণ বেশ রং চড়িয়েই লিখেছেন কিন্তু এই ঘড়ির খেলাটির কোনো উল্লেখই তাতে নেই। এমন একটি আশ্চর্য খেলা সত্যিই তিনি দেখিয়ে গিয়ে থাকলে সে সম্বন্ধে নীরব থাকবার মতো বিনয়ী আত্মজীবনী-লেখক তিনি ছিলেন না।

থার্সটনের পরে এ কাহিনী আরো যে-সব যাদুকরের সম্বন্ধে শুনেছি, তাদের মধ্যে আছেন গণপতি, রাজা বোস, 'রয় দি মিস্টিক' এবং পি. সি. সরকার।

এই অদ্ভুত ব্যাপারটি কি করে সম্ভব হয়ে থাকে, তাই নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা শোনা যায়। কেউ বলেন ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, গণ-সম্মোহন যাকে ইংরেজীতে বলা যায় 'মাস হিপনোটিজম্' (mass hypnotism)।

হলশুদ্ধ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইকে এমনভাবে সম্মোহিত অর্থাৎ হিপনো

টাইজ' করা হয় যে সবাই হাতঘড়ির সাড়ে সাতটাকেই ভুল করে ছটা দেখেন, অথবা মোটেই দেরি না হলেও ভুল করে ভাবেন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ব্যাপারটার আরেক রকম ব্যাখ্যা একদিন শুনেছিলাম এক ভদ্রলোকের মুখে। তিনি বলেছিলেন, "এ হলো আসলে ভয়ানক শক্তিশালী চুম্বকের ব্যাপার, ভেরি পাওয়ারফুল ম্যাগনেট, বুঝলেন না? ঐ জোরালো এক চুম্বকের হুকুমের চাকর হলের ভেতরকার সবগুলো ঘড়ির কাঁটা; চুম্বকটি যেমন ঘোরাবেন, হলের ভেতরকার সবগুলো ঘড়ির কাঁটা ঠিক তেমনি ঘুরবে, একচুল এদিক-ওদিক নেই। একজন ড্রিল মাস্টার মাঠ-ভরা ডজন ডজন লোককে একসঙ্গে ড্রিল করায় দেখেন নি? তেমনি ঐ চুম্বক কায়দা মাফিক ঘুরিয়ে হলের সবগুলো ঘড়িতে ছটা বাজিয়ে দেওয়া ম্যাজিশিয়ানের কাছে ছেলেখেলা, যাকে বলে চাইল্ডস্ প্লে।"

এর চাইতে বিস্তারিত ব্যাখ্যার আসরে ভদ্রলোককে নামাতে পারি নি। তিনি বলেছিলেন, "রহস্যটা হচ্ছে চুম্বক, এই আন্দাজটুকুই আপনাকে বলে দিলাম। কি সাইজের চুম্বক, কোথায় পাওয়া যাবে, কোথায় রেখে কিভাবে ঘোরাতে হবে, সারা হলময় চুম্বকী আকর্ষণের তরঙ্গ কিভাবে প্রবাহিত করে দিতে হবে, অত জানলে তো নিজেই ম্যাজিশিয়ান হয়ে বসতুম।"

ম্যাজিকের গল্পসাহিত্যে এই আশ্চর্য খেলার গল্পটি প্রায় স্থায়ী-সম্পদে অর্থাৎ 'ক্লাসিক'-এ দাঁড়িয়ে গেছে। এর কারণ তলিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে আমরা নিজেরা যেমন বিস্মিত হতে ভালোবাসি, তেমনি ভালোবাসি অপরকে বিস্মিত করতে। ম্যাজিক দেখিয়ে তাক লাগানো, সাধনা-সাপেক্ষ, প্রতিভা-সাপেক্ষ। জলের মত তা সহজ নয়। তার চাইতে সহজতর পন্থা হচ্ছে ম্যাজিকের গল্প বলে তাক লাগানো। এই তাক লাগানোর উদ্দাম আগ্রহ থেকেই আসে পরের মুখে শোনা কাহিনীকে নিজের চোখে দেখা সত্য ঘটনা বলে চালাবার দুরন্ত লোভ; আর লোভ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই আসে অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি।

এই যে তাক লাগাবার লোভ, এর আরেকটি উদাহরণ রূপে আরেকটি গল্প বলি, গল্পটি যাঁর মুখে শুনেছিলাম যথাসম্ভব তাঁরই জবানীতে।

"রেল স্টেশনের ধারে ছোট্ট এক রেস্তোরাঁয় বসে আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলে চা খাচ্ছিলাম। আর এমনি আশ্চর্য যোগাযোগ, দেখি আমাদের ওপাশের টেবিলে দুজন বন্ধু নিয়ে বসে আছেন যাদুকর পি. সি. সরকার। আমাদের ভেতর একজনের যাদুকরের সঙ্গে অল্প আলাপ ছিল। আমরা তাকে দিয়েই যাদুকর

সরকারকে ধরলাম—যাদুর খেলা দেখাবার জন্য। ঠিক তখন—এও আরেক আশ্চর্য যোগাযোগ বলতে পারেন!—রেস্তোরাঁর পাশের রাস্তা দিয়ে চলেছে দুজন দুধওয়ালা, মাথায় দুধের ড্রাম নিয়ে! ড্রামের ভেতর দুধে ডোবানো রয়েছে খড়, যাতে তাদের চলার তালে তালে ড্রামের দুধ ছলকে উঠে বাইরে না পড়ে। যাদুকর তাদের ডেকে বললেন, কিছু দুধ দিয়ে যেতে। ওরা বললে, 'কর্তা মাপ করবেন। এ দুধ বায়না করা। এ থেকে এক ফোঁটা দেবার উপায় নেই।' বলে চলে যেতে লাগল। যাদুকরের দিকে তাকিয়ে আমাদের সেই বন্ধুটি একটু হাসলেন, যাদুকরের যাদু হুকুমকে এতটুকু পরোয়া না করে দুধ-ওয়ালা অনায়াসে চলে যেতে পারল দেখে যাদুকরও হাসলেন। ভাবটা যেন 'দেখুন না মজাটা! ওরা ফিরে এল বলে।'··· একটু পরেই লোক দুটো ব্যস্ত হয়ে ফিরে এসে যাদুকরের কাছে কেঁদে বললে, 'এ আপনি কি করলেন কর্তা? অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা চাইছি, আমাদের দুধ আপনি ফিরিয়ে দিন। আপনার কতটা লাগবে বলুন দিয়ে যাচ্ছি।' চেয়ে দেখি দুটি ড্রামই যাদুকরের মন্ত্রবলে একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে; এক ফোঁটা দুধ নেই, পড়ে আছে শুধু খড়! আশ্চর্য কাণ্ড! কোথায় হাওয়া গেল এতটা দুধ? ···"

গল্পটি এই পর্যন্ত শুনে আমি বললাম, "তারপর?"

তিনি বললেন, "যাদুকরের আদেশে দুজন দুধওয়ালা দুটো ড্রাম মাথায় নিয়ে রওনা হল। যাদুকর কি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন জানি না, ওরা একটু দূরে যেতে-না-যেতেই দেখা গেল দুটি ড্রামই আবার প্রায় কাণায় কাণায় দুধে ভরে উঠেছে।"

আমি বললাম, "এ তো রীতিমত অলৌকিক ব্যাপার—মিরাক্‌ল্। এ ঘটনা কি সত্যি? আপনি কি নিজে—"

ভদ্রলোক বললেন, "তা না হলে আর বলছি কি আপনাকে? এ আমার পরের মুখে ঝাল খাওয়া নয়, নিজের চোখে দেখা।"

আমি যতই তাঁর এই কাহিনীকে অলীক, অবাস্তব বলে বাতিল করে দিতে চাইলাম, ততই তিনি জোর গলায় বলতে লাগলেন, "আরে রাম রাম, এ যে একেবারে আমার নিজের চোখে দেখা।"

এ কাহিনী যাঁর মুখ থেকে শুনেছিলাম, বর্তমান আলোচনার সুবিধার জন্য ধরে নেওয়া যাক তাঁর নাম পবিত্রবাবু। তিনি প্রবীণ এবং ধীরস্থির দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রলোক; তিনি রীতিমতো গুরুত্ব দিয়েই এ কাহিনী আমাকে শুনিয়ে-ছিলেন। [illegible] ঢাক বা রাখা [illegible] দিয়ে [illegible] বলা [illegible], ভদ্রলোকের এ কাহিনী

আমি অবিশ্বাস্য বলে মনে করে আষাঢ়ে গল্পের পর্যায়েই ফেলি। তবে কি তিনি মিথ্যাবাদী? না, অত সহজে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা চলে না। অন্যভাবে কি করে ব্যাখ্যা করা যায় ভেবে দেখা যাক। যাদুকর সরকার যে-সব যাদুর খেলা দেখিয়ে থাকেন তাদের মধ্যে একটি ছোট্ট অথচ চমৎকার খেলা হচ্ছে পুরো দুধ ভর্তি বেশ বড় একটি কাঁচের 'জাগ' (jug) থেকে সবটা দুধ যাদুমন্ত্রে উড়িয়ে দেওয়া। ঐ খেলায় যাদুকর সকলের চোখের সামনে চৌকো একটুকরো কাগজ দেখিয়ে তাই দিয়ে একটা ঠোঙার মতো (cone) তৈরি করেন, তারপর কাঁচের জাগ থেকে সবার চোখের সামনে প্রায় সমস্তটা দুধ— কমপক্ষে সেরখানেক তো হবেই—ঐ ঠোঙার মধ্যে ঢেলে দেন। জাগটা সবার চোখের সামনে খালি হয়ে প্রায় সবটা দুধ নিঃসন্দেহে আশ্রয় পায় ঐ কাগজের ঠোঙার ভেতর। ঠোঙার কোণ ধরে ভেতরের দুধটা দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গি করেন যাদুকর। চমকে ওঠেন দর্শকবৃন্দ, এই বুঝি দুধটা তাঁদের গায়ে এসে পড়ল। কিন্তু কোথায় দুধ? ঠোঙা খুলে গিয়ে দেখা গেল যাদুকরের হাতে রয়েছে সেই চৌকো একটুকরো কাগজমাত্র, সম্পূর্ণ শুকনো, এক ফোঁটা দুধের চিহ্ন নেই তাতে। একি আশ্চর্য ভুতুড়ে কাণ্ড! এমন অসম্ভব কি করে সম্ভব হলো?

যাদুকর সরকারের এই চমৎকার খেলাটি অনেকেই দেখে থাকবেন। তাঁদের ভেতর একজন হয়তো কোথাও কথা-প্রসঙ্গে খেলাটি বর্ণনা করেছিলেন। খেলাটি তাঁর ভালো লেগেছিল, সুতরাং বর্ণনায় একটু অতিরঞ্জন অর্থাৎ রং-চড়ানো স্বাভাবিক। তাঁর কাছে যিনি খেলাটির রং-চড়ানো বর্ণনা শুনেছিলেন তিনি অপরকে শোনাবার সময় আরেকটু রং চড়িয়েছিলেন, হয়তো প্রমাণ সাইজের দুধের 'জাগ'টি তাঁর বর্ণনায় 'ইয়া পেল্লায়' এক জাগে পরিণত হয়েছিল। এভাবে এ খেলার গল্প এক কান থেকে অন্য কানে ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত যখন পবিত্রবাবুর কানে এসে পৌছে-ছিল তখন মূল গল্পের জাগটা হয়তো বড় হতে হতে ড্রামে পরিণত হয়েছে এবং মূল গল্পের ঘরোয়া আসর বা থিয়েটার হল পরিণত হয়েছে রেল স্টেশনের ধারে একটি রেস্তোরাঁয়। অথবা ঐ ড্রাম এবং রেল স্টেশনের ধারে রেস্তোরাঁর পরিবেশ পবিত্রবাবুর নিজস্ব সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন যে-যাদুকর জাগ থেকে দুধ ওড়াতে পারেন, তিনি ড্রাম থেকেই বা পারবেন না কেন? এবং বাড়ীতে বা থিয়েটার হলে যা করতে পেরেছেন, স্টেশনের ধারে রেস্তোরাঁতেও নিশ্চয়ই তা করতে পারবেন। সুতরাং সত্যের মূল কাঠামোটি ঠিক রেখে বাইরের বাহার একটু বাড়ালে ক্ষতি কি? পবিত্রবাবু হয়তো এও

ভেবেছিলেন যে ব্যাপারটা তিনি ঠিক নিজের চোখে না দেখলেও এমন 'পরম বিশ্বস্তসূত্রে' যা শুনেছেন তা নিশ্চয় সত্যি, সুতরাং এ তো একরকম নিজের চোখে দেখারই সামিল। বিবেককে বুঝ দেবার জন্যে বলেছিলেন, 'ওহে, নিজের চোখে দেখার সামিল আর নিজের চোখে দেখা একই জিনিস। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।' আর আমি সন্দেহ প্রকাশ করাতে আমাকে বলেছিলেন "আরে রাম রাম, এ যে আমার নিজের চোখে দেখা।"

ইংরাজিতে একটা কথা আছে "The will to believe ultimately becomes belief itself" অর্থাৎ "কোনো কিছু বিশ্বাস করবার প্রবল ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত প্রকৃত বিশ্বাসে পরিণত হয়।" পবিত্রবাবুর ক্ষেত্রে সম্ভবত তাই হয়েছিল, যেমন অনেকেরই ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

যাদুকর পি. সি. সরকার সম্বন্ধে এই ধরনের একাধিক অতিরঞ্জিত কাহিনী বা আষাঢ়ে গল্প প্রচলিত আছে। জীবিতাবস্থাতেই এই ধরনের কিম্বদন্তীর বিষয় হওয়া (যাকে আমাদের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রভাষায় বলে "a legend in one's life time") অসামান্য জনপ্রিয়তারই পরিচয়।

এই ধরনের অতিরঞ্জন প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল বিখ্যাত ইংরেজ যাদুকর চার্লস বারট্রাম (Charles Bertram)—ব্যক্তিগত জীবনে জেম্‌স্ ব্যাসেট (James Bassett)—তাঁর স্মৃতিকথায় তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি মজার গল্প বলেছেন। যথাসম্ভব বারট্রামের নিজের জবানীতেই বলি :

"মাঝে মাঝে দর্শকদের ভেতর এমন বদ লোকও দেখা যায়, যিনি যাদুকরকে জব্দ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তেমনি আবার এমন সহৃদয় দর্শকও অনেক দেখা যায় যাঁরা তাঁদের প্রিয় যাদুকরের বাহাদুরি বাড়াবার জন্য তাঁর যাদুর খেলার অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেন। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু এই অতি ভক্তদের সহৃদয়তা মাঝে মাঝে যাদুকরকে কি বিপদে ফেলে তার একটি উদাহরণ দিই। আমার একটি খেলায় দর্শকরা দেখেন আমি আমার সরু যাদুদণ্ড (magic wand) থেকে একটি বল বার করি; সেই একটি বল দুটিতে, এবং দুটি বল তিনটিতে পরিণত হয়। তারপর তিনটি বল কমতে কমতে একটি হয়; সেই একটির রং বদলে যায়, তারপর বলটি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এ খেলায় প্রথম বলটি আমার হাতের তালুতে লুকানো থাকে, সেটাকেই যাদুলাঠির ডগা থেকে বার করবার ভান করি। বাকি দুটি বল সুযোগমতো দর্শকদের অলক্ষ্যে পকেট থেকে নিয়ে নিই।

"একদিন সান্ধ্য প্রদর্শনীতে এ খেলাটি দেখিয়ে সে রাতের জন্য হোটেলে

ফিরলাম। কফি-ঘরে ঢুকে দেখি আমার দিকে পেছন ফিরে দুজন ভদ্রলোক গল্প করছেন আমারই সম্বন্ধে। একজন আমার এই খেলাটি স্বচক্ষে দেখার বিবরণ গদগদ কণ্ঠে অন্যজনকে শোনাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন 'এমন আশ্চর্য ব্যাপার আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি। বারট্রাম সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, জামার দুটো হাতাই একেবারে কনুইর ওপরে গুটানো। এইভাবে সামনের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। পরিষ্কার দেখা গেল দুহাতই সম্পূর্ণ খালি। এক হাতে যাদু-লাঠিটা নিয়ে তার ডগা দিয়ে অন্য হাতের তালুতে এইভাবে কিছুক্ষণ সুড়সুড়ি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যেন তাঁর হাতের তালুর ভেতর থেকেই একটা সাদা বল বেরিয়ে এল। সেটা টেবিলের ওপর রেখে হাতের তালুতে আবার সুড়সুড়ি দিতেই একটি লাল বল বেরিয়ে এল। এইভাবে ঐ এক হাতের তালু থেকে একটির পর একটি বল বার করে তিনি টেবিল ভরে ফেললেন।' শুনে আমি আর সেখানে থাকা নিরাপদ মনে করলাম না, পাছে আমায় চিনতে পেরে ভদ্রলোক আমাকে বলে বসেন, 'এই যে মিঃ বারট্রাম। আপনার বলের খেলাটা এঁর সামনে একবার দেখিয়ে প্রমাণ করে দিন তো আমি মিছে কথা বলি নি।' "

এ ব্যাপারটি ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির কাছাকাছি। তার কয়েক বছর পরে ১৯০৭ সালে চার্লস বারট্রামের মৃত্যু হয়।

যাদুকর গণপতির প্রিয় শিষ্য স্বনামধন্য যাদুকর "দেবকুমার" (দেবকুমার ঘোষাল) জালন্ধরে নাজ সিনেমা হলে তিন সপ্তাহব্যাপী যাদু প্রদর্শন করেছিলেন ১৯৫৭ সালে। বলা বোধ হয় বাহুল্য, দেবকুমারের যাদু বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পথে ঘাটে তাঁর যাদু-ক্ষমতা সম্পর্কে যে-সব আজগুবি গল্প চলতো তার একটি নমুনা শুনেছি দেবকুমারেরই মুখে। শেষ প্রদর্শনীর পর জালন্ধর থেকে ট্রেনে ফিরে আসছেন যাদুকর দেবকুমার এবং তাঁর 'ইম্প্রেসারিও' (Impresario) অর্থাৎ প্রদর্শনী-উদ্যোক্তা। তাঁদের মুখোমুখি বসে নিজেদের ভেতর আলোচনা করছিলেন দুজন হিন্দী-ভাষী ভদ্রলোক। দেবকুমার তখন সাধারণ বেশে, তাঁকে যাদুকর দেবকুমার বলে ওঁরা কেউ চিনতে পারেন নি। তাঁদের ভেতর যে কথোপকথন চলছিল তার বাংলা অনুবাদ এই রকম দাঁড়ায়—

"আরে ভাই, বাংলা মুলুক থেকে যে দেবকুমার যাদুকর এসেছেন, ওঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। জিন, ব্রহ্মদত্যি—এসব নিশ্চয় ওঁর হাতের মুঠোয়। কাল রাতে যা কাণ্ড হলো, বড় তাজ্জব।"

"কি কাণ্ড হলো কাল রাতে?"

"আমি আর আমার বিবি পাশাপাশি বসে দেখছি দেবকুমারের যাদুর খেলা নাজ সিনেমায়। বিবির কোলে আমাদের পাঁচ বছরের ছোট্ট বাচ্চা। দেবকুমারজি করলেন কি, আমার বিবির কোল থেকে বাচ্চাটাকে বেমালুম উড়িয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে দিলেন।"

"কি তাজ্জব! এত বড়ো ভয়ানক কথা। মায়ের কোল থেকে বাচ্চা গায়েব হয়ে গেল?"

"বিলকুল গায়েব হয়ে গেল।"

"আর পাত্তা মিলল না?"

"মিলল বই কি? সেও আরেক তাজ্জব। দেবকুমারজির এক ফুস্‌মন্তর, ব্যাস মা'র ছেলে ফের মায়ের কোলে।"

এই কথোপকথন শুনে যাদুকর দেবকুমারের মনের অবস্থাটা হলো অনেকটা পূর্ববর্তী কাহিনীর যাদুকর বারট্রামের মতো। তিনি ভাবলেন, ভাগ্যিস জালন্ধরের খেলা শেষ হয়ে গেছে, নইলে উক্ত কথোপকথনের দু নম্বর ভদ্রলোক যদি তাঁর বিবি আর বাচ্চা নিয়ে যেতেন যাদুকরের যাদু-ক্ষমতা নিজে বাজিয়ে দেখতে, তাহলেই হয়েছিল আর কি!

আসল ব্যাপারটা যা ঘটেছিলো (অথবা যাদুকর দেবকুমার ঘটিয়েছিলেন) তা দেবকুমারের নিজের কথাতেই বলি। তিনি বলেছেন:

"স্টেজে দেখাচ্ছিলাম ব্ল্যাক আর্টের খেলা। প্রেক্ষাগৃহের সামনের দিকের এক সারিতে এক মহিলা, তাঁর কোলে বসে তাঁর ছোট্ট ছেলেটি। ছেলেটিকে আমি স্টেজের ওপর এনে ব্ল্যাক আর্টের কৌশলে অদৃশ্য করে পরে আবার দৃশ্য করে ভদ্রমহিলার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। খেলাটি দেখে অন্যান্য অনেকের মতো — ব্ল্যাক আর্টের কৌশল যাঁদের জানা ছিল না — ছেলেটির বাবা ভদ্রলোক খুবই অবাক হয়েছিলেন। বন্ধুকে গল্প শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দেবার আগ্রহাতিশয্যে তিনি — হয়তো অবচেতন মনে ইচ্ছে করেই — খেয়াল করেন নি যে মার কোল থেকে উড়িয়ে দেওয়া আর সেই ছেলেকে স্টেজে তুলে এনে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই এক কথা নয়; ঐ একটুখানি তফাতেই অনেকখানি তফাৎ, অসম্ভব আর সম্ভবের তফাৎ।"

এই প্রসঙ্গে আবার মনে পড়ছে সেই মহাবিখ্যাত এবং মহা-অসম্ভব ঘড়ির খেলা, যার কথা প্রথমেই বলেছি। এই খেলাটি সম্বন্ধে যাদুকর দেবকুমার তাঁর যাদুগুরু গণপতিকে প্রশ্ন করে জেনেছিলেন, অমন খেলা গণপতি কখনো দেখান

নি, এবং হলসুদ্ধ সবাই নিজ নিজ আসেন বসেই দেখবেন তাঁদের সবার হাত-ঘড়ির (বা পকেট ঘড়ির) সময় বদলে গেছে, অমন যাদুর খেলা দেখানো কোনো যাদুকরের পক্ষে সম্ভব বলেও তিনি মনে করতেন না। যাদুকর কর্তৃক হলসুদ্ধ সকলের ঘড়ির সময় একসঙ্গে বদলে দেওয়ার গুজবটা যে মূল খেলা থেকে মুখে মুখে অতিরঞ্জনের সূত্রে চালু হয়েছে, সে খেলায় হয়তো যাদুকর দর্শকদের ভেতর থেকে কাউকে 'স্টেজের ওপর ডেকে এনে' সম্মোহন, চুম্বক বা অন্য কোনো বস্তু বা কৌশলের সাহায্যে তাঁর ঘড়ির সময় বদলে দিয়েছিলেন (অথবা তাঁকে চোখে ভুল দেখিয়েছিলেন)। বিভিন্ন দর্শক (১) আলাদা আলাদা ভাবে এবং (২) স্টেজের ওপরে উঠে, নিজের ঘড়ির সময় পরিবর্তিত দেখা এবং প্রেক্ষাগৃহে স্টেজ থেকে দূরে যে যার নিজের আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় একই সঙ্গে বিভিন্ন দর্শকের ঘড়িতে সময় বদলে যাওয়া যে এক কথা নয়, গুজব বিলাসীদের এই সোজা কথাটা খেয়াল থাকে না।

যাদুকরদের যাদু সম্বন্ধে গুজব রটবেই, নানা রকমের আষাঢ়ে গল্পও চালু হবে, চালু থাকবে। এর একটি কারণ আমাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই (বিশেষ করে যাদুখেলার বেলায়) ভুল দেখি, যা দেখি তাও ঠিক মতো মনে রাখতে এবং নির্ভুলভাবে বর্ণনা করতে পারি না; পারম্পর্য ভুল করি, উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাই। এর ওপর আছে আমাদের স্বাভাবিক অতিরঞ্জন-প্রিয়তা। আমরা সবাই অল্পবিস্তর সৃষ্টিধর্মী, তাই যেমনটি শুনেছি ঠিক তেমনটি না বলে তার ওপর—অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতসারেই—রং চড়িয়ে বসি।

এবারে একজন পশ্চিম ভারতীয় যাদুকরের মুখ থেকে শোনা একটি 'সত্য কাহিনী' বলে এখনকার মতো আষাঢ়ে গল্পের প্রসঙ্গ শেষ করি।

ব্রিটিশ আমল। যুক্তপ্রদেশের একটি রাজ্য, অর্থাৎ 'রাজা' উপাধিধারী একজন বড় জমিদারের এলাকা। এলাকার পাশ দিয়ে একটি ছোটো নদী বয়ে চলেছে। (কেন বয়ে চলেছে সেটা একটু পরেই বোঝা যাবে।) রাজার হাঁক-ডাক-দাপট খুব; প্রজারা তাঁকে তাদের 'মা-বাপ' বলে মানে, এতে তিনি মহা খুশী। তাঁর রাজ্যে বারো মাসে তেরো পার্বণের তিনি পক্ষপাতী, আর গুণগ্রাহী বলে নাম কিনবার লোভ ছিল তাঁর প্রচণ্ড।

তাই 'উজীর সাহেব' অর্থাৎ মন্ত্রীমশাই যাকে তাকে সহজে রাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে দিতেন না।

একবার পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে একজন যাদুকর এসে রাজা সাহেবের দর্শন ভিক্ষা করলেন। বললেন, "আমি ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ। আমরা সাত পুরুষ ধরে যাদুকর। শুনেছি রাজা সাহেব বড়ো সমঝদার, আমার যাদুখেলার কদর বুঝবেন। ওঁকে খেলা দেখিয়ে খুশী করে কিছু বখ্‌শিস্‌ নিয়ে যাবো।"

উজীর সাহেব ভাবলেন, এই ভেল্‌কিবাজের পাল্লায় রাজা সাহেবকে পড়তে দেওয়াটা ঠিক হবে না। রাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না বলে ভেল্‌কি-ওয়ালাকে তিনি ভাগিয়ে দিলেন।

একদিন রাজা সাহেব তাঁর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে হাওয়াগাড়িতে উঠেছেন; সঙ্গে যথারীতি উজীর সাহেব। দুজনে মিলে হাওয়া খেতে রওনা হবেন, এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল গাড়িতে স্টার্ট দিতে পারছে না হাওয়াগাড়ির ড্রাইভার। কেন? গাড়ির ঠিক সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে একটি পাতলা ছোটোখাটো মানুষ, দুটি চোখের তারায় অদ্ভুত উজ্জ্বলতা আর অদম্য আত্মপ্রত্যয়ের ভাব, আর গোঁফজোড়ার ডগা দুটি সরু করে পাকানো।

রাজা সাহেব চটে উঠবেন ভাবছেন, এমন সময় লোকটির চোখের দিকে একবার তাকাতেই চটে উঠবার কথা ভুলে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কি চাই?"

জবাব শুনলেন, "খুদাবন্দ! গরিবের নাম নিয়াজ মহম্মদ, যাদুকর।"

ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদের আশ্চর্য যাদুর কাহিনী পৌঁছেছিল রাজা সাহেবের কানেও। তিনি বললেন, "হাঁ হাঁ, তোমার নাম শুনেছি ওস্তাদ।"

"সে আপনার বহুৎ মেহেরবানি, খুদাবন্দ!"— বললেন ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ। "কিন্তু আপনাকে খেলা দেখাবার সৌভাগ্য আমার কখনো হয় নি। এবার আপনাকে খেলা দেখাবো বলে এসেছি।"

উজীর সাহেব বললেন, "বাজে খেলা দেখে নষ্ট করবার মতো সময় হুজুরের নেই। এমন কিছু খেলা দেখাতে পারো যা অন্য কোনো যাদুর ওস্তাদ দেখাতে পারবে না?"

অল্প দূরে পড়ে ছিল একটি পাথরের খণ্ড। অনেক মণ তার ওজন। আর দূরে দেখা যাচ্ছে নদীর স্রোত। তামাশা করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল রাজা সাহেবের মনে; তিনি হেসে বললেন, "এই আস্ত পাথরের খণ্ডটিকে ঐ নদীর জলে ভাসাতে পারবে?"

ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ অম্লান বদনে বললেন, "পারবো।"

বলে কি লোকটা? মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো? না, মোটেই পাগল

নয়, বরং রীতিমতো সেয়ানা বলেই তো মনে হচ্ছে লোকটিকে ! — ভাবলেন উজীর সাহেব। কোনো রকম কথার মার-প্যাচে জব্দ করে বোকা বানাবে না তো ? লোকটি যে রকম ফন্দীবাজ তাতে একটু হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। কোথাও কোনো ফাঁকি দেবার ফাঁক থেকে না যায়।

"সোজা জলের ওপর ঐ পাথরটাকে ভাসাতে হবে, যেমন করে বরফের টুকরো জলে ভাসে।" বললেন উজীর সাহেব। — "পারবে ?"

"জী হাঁ।" বললেন যাদুকর নিয়াজ মহম্মদ। "যাদুর জোরে ঐ অত বড়ো পাথরকে বরফের টুকরোর চাইতেও পাতলা বানিয়ে দেবো।"

তখন রাজা সাহেব আর উজীর সাহেবের মধ্যে কি গোপন কথাবার্তা হয়ে গেল। তার পর উজীর সাহেব ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদকে বললেন : "তোমার আর্জি রাজা সাহেব মঞ্জুর করেছেন ওস্তাদ। আগামী রবিবার নদীর ধারে তোমার এই খেলা দেখবার জন্য ছোটোবড়ো অনেককে নিমন্ত্রণ করা হবে। তার আগের এই ক'টা দিন তুমি তোমার দলবল নিয়ে রাজা সাহেবের অতিথিশালায় থাকবে।"

যাদুকর নিয়াজ মহম্মদ বললেন, "এ তো রাজা সাহেবের বহুৎ মেহেরবানি। কন্তু একটা শর্ত আছে।"

"কি শর্ত ?"

"এই পাথরটাকে আপনারা মেহেরবানি করে ঐ নদীর ধারে পৌঁছে দেবেন। সেখান থেকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবো আমি।"

এইবার হেসে উঠলেন রাজা সাহেব। বললেন, "যাদুর জোরে এটাকে নদীর জলে ভাসাতে পারবে, আর এখান থেকে নদীর ধারে নিয়ে যেতে পারবে না ?"

ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ বললেন, "খুদাবন্দ, এত বড়ো ওজনের পাথর জলে ভাসাতেই অনেকখানি যাদু খরচা হবে। তার ওপর আবার একে এতটা রাস্তা বয়ে নিয়ে যাদুর খরচটা আর বাড়াতে চাই না খুদাবন্দ। যাদুর বাজে লোকসান করতে আমার ওস্তাদের মানা আছে।"

রাজা সাহেব বললেন, "বেশ। নদীর কিনারায় আমরাই পাথরটাকে পৌঁছে দেবো, আর নদীর জলে তাকে ভাসাবে তুমি। কিন্তু যদি ভাসাতে না পারো ?"

"এ বান্দাকে ধাপ্পাবাজ বলে কতল্ করে ঐ নদীর জলেই ভাসিয়ে দেবেন খুদাবন্দ !" — বলেলন ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ।

রাজা সাহেবের বিরাট অতিথিশালার একটি চমৎকার অংশে পরম আদরে

থাকতে লাগলেন যাদুকর নিয়াজ মহম্মদ, তাঁর দলবল নিয়ে। আদরে বটে, কিন্তু নজরবন্দী হয়ে। লোকটা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সে জন্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করে কড়া পাহারা রেখেছিলেন উজীর সাহেব।

বিরাট পাথর। যেমনি বিরাট, তেমনি তার ওজন। অনেক লোক, অনেক মেহনত, অনেক সময়, অনেক খরচ লাগল তাকে নদীর ধারে নিয়ে দাঁড় করাতে।

রবিবার। নদীর ধারে লোকে লোকারণ্য। যেখানে নদীর কিনারায় বিরাট পাথরের খণ্ডটি দাঁড়িয়ে আছে, তার অনতিদূরে একটি ছোট্ট তাঁবু। এই তাঁবুর পাশ দিয়েই একটি পায়ে-চলার পথ নদীর ঘাট থেকে বরাবর চলে গিয়ে মিশেছে রাজপথে। রাজপথে পাহারা দিচ্ছে একঝাঁক ঘোড়সওয়ার। পাহারাওয়ালা আর ঐ যে পায়ে-চলার পথ, তার দুধারে বেশ কিছু জায়গা জুড়ে সাজানো সোফা, গদিওয়ালা চেয়ার ইত্যাদি। তাতে বসে আছেন নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য অতিথিরা। সেরা জায়গায় বসে আছেন রাজা সাহেব, উজীর সাহেব এবং রাজা সাহেবের বিশিষ্টতম নিমন্ত্রিত অতিথি কয়েকজন। জলে ভাসাবার বিরাট পাথরটা এবং সেই ছোট্ট তাঁবুটা তাঁদের চোখ থেকে বেশি দূরে নয়। উর্দি-পরা চাপরাশি বেয়ারারা নানা রঙের পানীয় এবং ভোজ্য পরিবেশন করছে, আর রাজপথের ওধারে কৌতূহলী জনতা।

হঠাৎ উঠল গুঞ্জন। দেখা গেল আসছে রাজা সাহেবের অতিথিশালার গাড়ি। সেই গাড়িতে পাইক বরকন্দাজ পাহারায় এলেন যাদুকর ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ আর তাঁর দুজন সাগরেদ। ওস্তাদের পরনে জমকালো সোনালি জরির কাজ করা লাল মখমলের পোশাক, বুকে ঝুলছে একঝাঁক পদক, আর মাথায় ঝিক্‌ঝিক্ করছে জমকালো উষ্ণীষ। তাঁর দুটি সাগরেদের পরনেও মখমলের পোশাক ; শুধু ওস্তাদের পোশাকের তুলনায় তাদের পোশাক একটু কম জমকালো, আর তাদের বুকে নেই পদকের ঝাঁক, মাথায় নেই উষ্ণীষ।

নদীর ঘাট থেকে পায়ে চলার পথটি যেখানে এসে মিশেছিল রাজপথে, সেই-খানে নির্মিত হয়েছিল একটি সুদৃশ্য তোরণ। গাড়ী থামল এসে এই তোরণের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে তোরণ-দ্বারের দুধারে দাঁড়িয়ে পড়ল ওস্তাদের দুজন সাগরেদ, দুজন দেহরক্ষী যেন! তার পর গাড়ি থেকে নামলেন—যাদুকর নিয়াজ মহম্মদ!

উল্লাসধ্বনি উঠল বহু কণ্ঠ থেকে। ব্যাণ্ডপার্টি তৈরি ছিল আগে থেকেই। যাদুকর গাড়ি থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজনা শুরু হলো আকাশ-পাতাল·

কাঁপিয়ে। সবাই দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সবাই একসঙ্গে দেখতে চাইছে যাদু-করকে—বিরাট প্রস্তরখণ্ড যিনি যাদুবলে জলে ভাসাবেন।

বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত যাঁরা চেয়ারে বসেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজা সাহেবের বিশেষ প্রিয় ব্যক্তি—তাঁর গৃহচিকিৎসক, ডাক্তার সাহেব। তাঁর সঙ্গে এসেছিল তাঁর বারো বছরের ছেলে শঙ্করপ্রসাদ। ভেল্কি-ভোজ-বাজির শখ তার প্রচণ্ড, ক্লাসের পড়ার চাইতে নানারকমের যাদুর খেলা শেখবার দিকে তার ঝোঁক বেশি। ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদের অদ্ভুত যাদু-ক্ষমতার কাহিনী শুনে শুনে মনে মনে সে তাঁকে দেবতা বানিয়ে রেখেছে।

দুধারে আগ্রহাকুল চোখের সারি। পায়ে-চলা পথ বেয়ে বীর-বিক্রমে অগ্র-সর হয়ে এলেন ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ, তাঁর দুপাশে দুজন সাগরেদ। ছোট্ট যে তাঁবুটি দাঁড়িয়ে ছিল পাথরটি থেকে একটু দূরে, ওস্তাদ আর তাঁর দুই সাগরেদ তার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন আবার নতুন করে জল্পনা শুরু হলো দর্শক মহলে। এত বড়ো পাথর জলে ভাসবে, এটা বিশ্বাস করা শক্ত। ওস্তাদ কি সবাইকে এপ্রিল-ফুল বানিয়ে পালাবে? কিন্তু পালাবে কি করে—এই দিন-দুপুরে এতগুলো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে আর কড়া পাহারা এড়িয়ে? অথবা কি শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে লোকটা বদ্ধ পাগল, আর এই বদ্ধ পাগলের কথা বিশ্বাস করেই রাজা সাহেব আর উজীর সাহেব এমন বিরাট এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন? ভেলকি-ভোজবাজি-বুজরুকি দেখাতে দেখাতে শেষটায় ওস্তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে আর সেই মাথাখারাপটা টের পান নি রাজা সাহেব আর উজীর সাহেব? অথবা সমস্ত ব্যাপারটাই কৌতূহলপ্রিয় রাজা সাহেবের (হয়তো বা সেই সঙ্গে উজীর সাহেবেরও) এক প্রচণ্ড কৌতুক, বিরাট তামাশা? সমবেত সবাইকে বোকা বানাবার খেলায় ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ ওঁদের হুকুমের তাঁবেদার—একজন সহায়ক খেলোয়াড় মাত্র? ওদিকে তাঁবুর ভেতর যাদুকর আর তাঁর দুই সাগরেদ অদৃশ্য, আর এদিকে এই রকম নানা রকমের গবেষণা চলছে, তার কিছু কিছু ভেসে আসছে সেই বারো বছরের ছেলেটির কানে, যার নাম শঙ্করপ্রসাদ। শঙ্করপ্রসাদ ভাবছে, তাঁবু থেকে বেরোচ্ছে না কেন ওস্তাদ? তবে কি ঐ তাঁবুর তলায় লুকোনো আছে সুড়ঙ্গ, সেই সুড়ঙ্গ-পথে নদীর ভেতর চলে গিয়ে ডুব-সাঁতার কেটে পালিয়ে যাবে যাদুকর ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ?

কিন্তু না, ঐ তো তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন ওস্তাদ, পেছনে পেছনে দুই

সাগরেদ। তিন জনেরই বেশ গেছে বদলে। তিন জনেই খালি গা, খালি পা, খোলা মাথা, আর তিনজনেরই পরনে কুস্তিগীরদের পরবার জাঙিয়া। চেহারা কিন্তু একজনেরও কুস্তিগীরের মতো নয়। ওস্তাদ ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন মস্ত পাথরের সামনে। তার পর পাথরটির গোড়া ঘেঁষে বসে পড়লেন এক পা সামনে আর এক পা খানিকটা পেছনে দিয়ে। ওস্তাদের পা দুটি যেন মাটির ওপর পিছলে সরে যেতে না পারে সেজন্য দুই সাগরেদ ওস্তাদের দুই পা চেপে ধরে বসে পড়ল।

ওস্তাদ সেই বিরাট পাথরটাকে "হেঁইও" বলে একটু ঠেলতেই এক আশ্চর্য ব্যাপার! যাকে সরিয়ে এখানে নিয়ে আসতে অনেক জোয়ানের অনেক পরিশ্রম আর অনেক সময় লেগেছিল, সেই বিরাট পাথরটি যাদুকরের দুটি পাতলা হাতের ঠেলায় নদীর দিকে অনেকখানি সরে গেল। সমবেত দর্শক-মহলে বিস্ময়ের শিহরণ। পাথরটির দিকে আবার এগিয়ে গেলেন যাদুকর, আবার বসলেন তেমনি করে, তেমনি করে "হেঁইও" বলে আবার ঠেললেন পাথরটাকে, পাথরও আবার তেমনি করে আরো এগিয়ে গেল নদীর দিকে। বার কয়েক এই রকম হেঁইও-র ফলে পাথরটি যখন জলের একেবারে কিনারায় পৌঁছে গেল, তখন ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ একাই পাথরটিকে ঠেলতে ঠেলতে নদীর জলে নেমে গেলেন। যেতে যেতে তাঁর গলা পর্যন্ত জলে ডুবে গেল, কিন্তু সবাই প্রচণ্ড বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে দেখলো বিরাট পাথরটি তার নিজের ওজন বেমালুম ভুলে গিয়ে ফাঁপা বয়ার মতো জলের ওপর ভাসছে!

সেই গলা-জলে দাঁড়িয়ে তখন অলৌকিক যাদুকর রাজা সাহেবকে সেলাম জানিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "খুদাবন্দ, বান্দা যে যাদুর খেলা দেখাবে বলে জবান দিয়েছিল, সে খেলা দেখাতে পেরেছে কিনা?" রাজা সাহেব বিস্ময় আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘোষণা করলেন—ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদ যাদু-জগতের বাদশাহ। তখনও পাথরটি ভাসছে নদীর জলে। পারে উঠে আসতে আসতে ওস্তাদ অনুমতি দিলেন, "আচ্ছা বেটা, আভি তুম ডুব যাও।" পাথরটা যেন ওস্তাদের যাদু-হুকুমে এতক্ষণ অনেক মেহনৎ করে জলের ওপর ভেসে ছিল, এইবার ডুববার অনুমতি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, ভুস করে ডুবে গেল জলের তলায়। সমবেত লোকারণ্যে ধন্য ধন্য রব উঠল।

এ গল্প পড়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগবে, এই অলৌকিক ঘটনাটি কি সত্যিই ঘটেছিল? গল্পটি আমাকে শুনিয়েছিলেন পশ্চিম ভারতের একজন যাদুকর;

তখন তার বয়স কম-বেশি পঞ্চাশ বছর। এই যাদুকরই ছিলেন উক্ত গল্পের বারো বছরের বালক শঙ্করপ্রসাদ (নামটা আমারই দেওয়া, আসল নামটা প্রকাশ করবো না বলে) ; সুতরাং ঘটনাটি তিনি সত্যিই দেখে থাকলে দেখেছিলেন বারো বছরের চোখে। দেখে সেই ওস্তাদের অলৌকিক যাদু-ক্ষমতায় অভিভূত হযেই নাকি তিনি অনেক সাধ্য-সাধনা করে তাঁর যাদু-শিষ্য হয়েছিলেন।

"জানেন কি করে আপনার ওস্তাদ জলে পাথর ভাসিয়েছিলেন ? পারেন ঐ রকম পাথর জলে ভাসাতে ?" প্রশ্ন করেছিলাম যাদুকরকে।

যাদুকর বলেছিলেন, "জানি না। পারিও না। কিন্তু ওস্তাদের সেই অলৌকিক যাদু দিনের আলোয় চোখের সামনে স্পষ্ট দেখেছিলাম। এতে কোনো ভুল নেই।" এ কথা তিনি বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন !

যাদু-জগতে অনেক আষাঢ়ে গল্প চালু আছে, এ কাহিনীটিকেও আমার সেই শ্রেণীভুক্ত বলেই মনে হয়। গল্পটি হয়তো যাদুকরের আগাগোড়া বানানো ; উদ্দেশ্য — তাঁর ওস্তাদের মহিমা বাড়ানো। অথবা হয়তো তাঁর মনে সত্যি বিশ্বাস তিনি ঐ রকম দেখেছিলেন, কিন্তু আসলে বালকসুলভ কল্পনা-প্রবণ চোখে কি দেখতে কি দেখেছিলেন তার ঠিক নেই। তা ছাড়া আটত্রিশ বছর আগে দেখা ঘটনা যথাযথ মনে রাখাও শক্ত।

কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায় গল্পটি ওঁর বানানো ধাপ্পা নয়, এবং সত্যিই তিনি ওস্তাদ নিয়াজ মহম্মদের নদীর জলে বিরাট প্রস্তরখণ্ড ভাসাবার ঘটনা দেখেছিলেন. তাহলে কি ভাবে সেই অদ্ভুত ঘটনাটির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ?

আমার মনে যে ব্যাখ্যাটির উদয় হয়েছে সেইটে বলি। এই উদয় সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পড়ে (কবিতাটির নাম "নকল গড়") এবং কলকাতার হুগলী খালের বুকে একটি জিনিস ভাসতে দেখে — বিরাট পাথরখণ্ডের মতো বড়ো একটি বয়া।

কবিগুরুর উক্ত কবিতায় আছে :

"জলস্পর্শ করব না আর —
চিতোর-রাণার পণ,
বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে
থাকবে যতক্ষণ।"

তখন "মন্ত্রী কহে যুক্তি করি
আজকে সারা রাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মতো
নকল কেল্লা পাতি।"

আসল কেল্লা যখন ভাঙা সম্ভব নয়, তখন রাজামশাইকে দিয়ে নকল কেল্লা ভাংগানো ছাড়া আর উপায় কি? সুতরাং

"মন্ত্রী দিল চিতোর মাঝে
নকল কেল্লা পাতি।"

ঠিক তেমনি, আসল পাথরের খণ্ড জলে ভাসানো যখন মানুষের অসাধ্য, তখন অগত্যা চাই ঐ মস্ত পাথরের খণ্ডের মতোই আয়তন এবং চেহারার 'নকল' পাথরখণ্ড, যা বিরাটকায় বয়ার মতোই ফাঁপা, এবং জলে ভাসবে। রাজা সাহেবের প্রাসাদের অনতিদূরে যে বড়ো ওজনদার পাথরখণ্ডটি ছিল, সেটাকে অনেক লোক এবং মেহনত লাগিয়ে 'হেঁইও 'হেঁইও' করে চারিদিকে বেশ সোরগোল জাগিয়ে নদীর ধারে নেওয়া হলো। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেলো এক বিশাল ওজনদার পাথরটিকেই অসামান্য যাদুকর নদীর জলে ভাসাবেন। আসন্ন যাদু-প্রদর্শনীর তুর্দান্ত বিজ্ঞাপন হয়ে গেল।

বাইরে কেউ জানে না যে রাজা সাহেবের সঙ্গে যাদুকর নিয়াজ মহম্মদের গোপন বোঝাপড়া রয়েছে। তামাশা আর হুজুগের ভক্ত রাজা সাহেব চাইছিলেন জাঁকালো রকম নতুন ধরনের কিছু একটা ব্যাপার তাঁর রাজ্যে হোক, যাতে চারিদিকে 'ধন্যি ধন্যি' পড়ে যায়। যাদুকর নিয়াজ মহম্মদ যদি এই অলৌকিক কাণ্ডটি করে দেখাতে পারেন তবে, তখন, তাঁর সভা-যাদুকর পরিচয় দিয়ে নিজে অমন বিরাট গুণীর পৃষ্ঠপোষক হবার সম্মান লাভ করবেন, সেটা কি কম কথা? গোপনে বুদ্ধি দিলেন যাদুকর নিয়াজ মহম্মদ; সেই বুদ্ধির প্রচুর প্রশংসা করে ঠিক সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করে দিলেন রাজা সাহেব। তাঁর অখণ্ড প্রতাপ, দাপটে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেতো। টাকা ছিল প্রচুর আর তা হুজুগে বা ফুর্তিতে ওড়াতে তাঁর আলস্য ছিল না। বিরাট পাথরটির হুবহু নকল তৈরি হয়ে গেল, যা জলে ভাসবে, আর কিছুক্ষণ পরেই তলাটা জলে গলে গিয়ে ধীরে ধীরে গোটা জিনিসটা জলে ডুবে যাবে। রাতের গোপনে রাজা সাহেবের কিছু বিশ্বস্ত লোক বা যাদুকরের লোকের মিলিত প্রচেষ্টায় আসল পাথরটিকে নদীর

জলে ডুবিয়ে দিয়ে তার জায়গায় রাতারাতি ঐ নকল পাথরখণ্ডটি রেখে দেওয়া হলো। বাইরের কেউ এই বদলের কথাটা জানতে পারল না। যাদুকর নিয়াজ মহম্মদ যেটিকে জলে ভাসালেন এবং কিছুক্ষণ বাদে জলে ডুবিয়ে দিলেন, সেটা বিশেষ জিনিস দিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরি এই নকল পাথরখণ্ড।…

এই ব্যাখ্যাটি আমার কল্পিত, এবং হয়তো এটিকে কারো কারো খুবই উৎকট রকমের উদ্ভট বলে মনে হবে। কিন্তু যাদু-প্রদর্শনের বাস্তব জগতে এই ধরনের অনেক অদ্ভুত উপায় অবলম্বিত হয়েছে; সেইজন্যেই এ কাহিনীটি বলা একেবারে অবান্তর বলে মনে করি নি।

আসল ও মেকি

তখন যাদুকর পি. সি. সরকারের যাদু প্রদর্শন চলছে কয়েকদিন ধরে নিউ এম্পায়ার হলে। এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন, "এবার সরকারের ম্যাজিক দেখেছেন? একটি খেলা দেখলুম, সে তো রীতিমত অলৌকিক ব্যাপার। চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। এমন কি চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা শক্ত।"

বললাম, "বলেন কি? বলুন তো খেলাটা কি।"

ভদ্রলোক বললেন, "সরকার এসে স্টেজের ওপর দাঁড়ালেন, হাতে একখানা বড়ো শাদা চাদর। আমাদের চোখের সামনে ঐ চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলে ঐ চাদরের তলায় ঘুরে ঘুরে হেলে দুলে কি তাঁর নাচ! দেখে আমরা তো হেসে বাঁচি নে।"

"কিন্তু এর ভেতর অলৌকিকটা কোথায়?" বললাম আমি।

"বলছি! চাদর-ঢাকা সরকার আমাদের চোখের সামনে নাচছেন, নাচছেন, নাচছেন, হঠাৎ চাদরখানা একেবারে ফাঁকা—লুটিয়ে পড়ল স্টেজের ওপর। সরকার বেমালুম হাওয়া। হলসুদ্ধ আমরা সবাই অবাক। কোথায় সরকার? সকলের মনে এই এক প্রশ্ন। সঙ্গে সঙ্গে হলের একেবারে পেছন দিকে দোতলার গ্যালারির পেছনে—স্টেজ থেকে কত দূরে ভেবে দেখুন একবার—শোনা গেল 'এই যে আমি।' সবাই ঐ দিকে চেয়ে দেখি সত্যিই দাঁড়িয়ে হাসছেন যাদুকর সরকার। স্টেজ থেকে উধাও হওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে সশরীরে অদ্দূর চলে যাওয়া —সিকি সেকেণ্ডও বোধ হয় লাগে নি—ব্যাপারটা অলৌকিক নয়? সরকার মুখে যতই বলুন-না কেন ম্যাজিক মানেই চালাকি, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ওঁর আসলে কিছু কিছু অলৌকিক, ভুতুড়ে ক্ষমতা আছে, যা উনি স্বীকার করেন না।"

যে খেলাটির কথা উনি বললেন, সেটি যে আধুনিক যাদুবিদ্যার একটি অতি সহজ ফাঁকির খেলা মাত্র, ওর ভেতরে অলৌকিক ব্যাপার কিছুই নেই, সেটা তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারা গেল না। ফাঁকিটা কোথায় সেইটে ওঁকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে না দিলে উনি কিছুতেই খেলাটিকে ফাঁকির খেলা বলে মানতে রাজী নন।

কিন্তু যাদুমঞ্চের এই খেলাটি মোটেই 'আসল' অলৌকিক ব্যাপার নয়, 'মেকি' অলৌকিক ; এর মূলে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম ফাঁকি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মেকির আসল থাকা সম্ভব কিনা। অর্থাৎ চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে মুহূর্তের ভেতর সশরীরে বহু দূরে চলে যাওয়ার অলৌকিক ক্ষমতা কোনো মানুষের থাকতে পারে কিনা। আমার একজন অধ্যাপক বন্ধুর বিশ্বাস তা পারে। এবং তাঁর এই বিশ্বাসের ভিত্তি স্বরূপ একটি কাহিনী তিনি আমাকে বলেছেন।

ফেনি শহরে থাকতেন এক ফকির। শহরের সবাই তাঁর ভাগনে বা ভাগনি, তিনি সবার মামা। ছোটো বড়ো সবাই তাঁকে ডাকতো 'ফকির মামু' বলে। (বলা বাহুল্য 'মামু' ডাকটি 'মামা' ডাকের আদুরে সংস্করণ)। ঐ ডাক থেকেই তাঁর নাম হয়ে গেল মামু ফকির।

এবার আমার অধ্যাপক বন্ধুটির জবানিতে বলি :

আমার জ্যাঠামশাই তখন ফেনির একজন প্রবল প্রতাপশালী রাজকর্মচারী। আর ইংরেজ শাসনের তখন পুরো দাপট। জ্যাঠামশাই লোক খারাপ ছিলেন না, জনপ্রিয়ও ছিলেন, কিন্তু সব সময় তিনি ঠাট বজায় রেখে চলতেন, তাই লোকে তাঁকে মানুষ হিসেবে যেমন পছন্দ করতো, জাঁদরেল রাজকর্মচারী হিসেবে তেমনি ভয়ও করতো। একদিন সন্ধ্যাবেলা জ্যাঠামশাই যাবেন সার্কাস দেখতে। ফেনি শহরের বড়ো মাঠের ওপর পড়েছে সার্কাস দলের তাঁবু, ওদের খেলা নাকি চমৎকার, দেখবার মতো। মামু ফকির যেমন খামখেয়ালি আর পাগলাটে, তেমনি শিশুর মতো সরল, তাই মামু ফকিরকে ভারি পছন্দ করতেন জ্যাঠা-মশাই। বললেন, 'মামু, চলো আমার সঙ্গে সার্কাস দেখতে যাবে। মামু ফকির রাজি নন। বললেন, 'তুই যা। সার্কাস ফার্কাস আমার ভালো লাগে না।' সবাই ওঁর ভাগনে, তাই সবাইকেই 'তুই' সম্বোধন ; ছোটো বড়ো ভেদ নেই, কাউকে পরোয়া নেই।

জ্যাঠামশাই নাছোড়বান্দা। বললেন, 'মামু, সবাই বলছে এমন সার্কাস আর কখনো এদিকে আসে নি। খেলা দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে।'

'ও তাক তোরই লাগুক। আমার লাগার দরকার নেই।' বললেন মামু ফকির।

মামু ফকির অনেক চেষ্টা করলেন জ্যাঠামশাইয়ের আবদার এড়াতে, কিন্তু পারলেন না। জ্যাঠামশাই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চললেন সন্ধ্যাবেলা সার্কাস দেখতে। দুপাশে দুই আরদালি, মাঝখানে জ্যাঠামশাই আর মামু ফকির। জ্যাঠামশায়ের

বেশভূষা ভয়ানক রকম জাঁকালো নয় বটে, কিন্তু দস্তুরমতো কেতাদুরস্ত। আর মামু ফকির? তাঁর মাথার চুল রুক্ষ আর এলোমেলো, খালি পা, পরনের ময়লা ধুতি হাঁটুর ওপর উঠে আছে। যাকে বলে পাগলের মতো চেহারা, ঠিক তাই।

জ্যাঠামশায়ের ইচ্ছে মামু ফকিরকে আজ তিনি সার্কাস দেখাবেনই, আর মামু ফকিরের পাশে বসে সার্কাস দেখবেন। তারপর সার্কাসের আশ্চর্য খেল দেখে মামু ফকিরের যখন তাক লেগে যাবে, তখন বলবেন, 'দেখলে তো কি চমৎকার? এখন বোঝো, না এলে কি হারাতে।' তাছাড়া মামু ফকির পাগলাটে মানুষ, পাছে হঠাৎ ছুটে পালান, এই ভয়েই দুধারে আর পেছনে পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন জ্যাঠামশাই।

আগে সামনের আরদালিরা 'সাহেবের' জন্য লোক সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে রেখেছে, জ্যাঠামশাই সার্কাসের বড়ো গেটটি দিয়ে মামু ফকিরকে নিয়ে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় আশ্চর্য ব্যাপার। জ্যাঠামশাই হঠাৎ দেখলেন মামু ফকির পাশে নেই। এক মুহূর্ত আগেও যাঁকে দেখেছিলেন তিনি চোখের পলকে কোথা দিয়ে পালালেন এমন কড়া পাহারার ব্যূহ ভেদ করে? ফকিরকে সবাই চেনে, দুপাশে আর পেছনের কেউ তাকে চলে যেতে দেখে নি। জ্যাঠামশাইকে সবাই একবাক্যে বললে, 'আপনার পাশে পাশেই তো ওঁকে দেখছিলাম। এখন দেখছি উনি নেই। কিন্তু ঠিক কখন থেকে উনি নেই, আর কোথা দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন, কিছুই ঠাওর করতে পারছি না।

তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, পাত্তা মিলল না মামু ফকিরের। মামুর উদ্ভট পাগলামি খামখেয়ালের সঙ্গে ফেনি শহরের সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত। কিন্তু এতগুলো লোকের মাঝখান থেকে এমন বেমালুম হাওয়া হয়ে যাওয়া, এ যে রীতিমতো ভূতুড়ে ব্যাপার। এ রহস্য নিয়ে অনেকে মাথা ঘামাতে লাগল, কিন্তু সন্তোষজনক কোনো সমাধান পাওয়া গেল না।

পরদিন। জ্যাঠামশায়ের এক বন্ধু কুমিল্লা থেকে এসেছেন। তিনি জ্যাঠা-মশাইকে বললেন, 'ওহেঁ, কাল সন্ধ্যাবেলা মামু ফকিরকে কুমিল্লায় দেখলুম।'

শুনে জ্যাঠামশাই চমকে উঠে বললেন, 'কাল? সন্ধ্যাবেলা?'

বন্ধু বললেন, 'হ্যাঁ। দেখলুম কুমিল্লা স্টেশনের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। মনে হলো অনেকখানি রাস্তা একটানা দৌড়ে এসেছে যেন। আমি বললুম, 'একি মামু, অমন হাঁফাচ্ছো কেন?' মামু ফকির বললে, 'বললাম, সার্কাস দেখবো না, দেখবো না, তবু ধরে নিয়ে গেল। তাই এক ফাঁকে ছুটে পালিয়ে এলাম।

জ্যাঠামশাই বললেন, 'নিজের চোখে দেখেছ ? ভুল হয় নি তো ?'

বন্ধু বললেন, 'না হে না। মামুর হাত ধরলুম, মামু ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে কোথায় উধাও হয়ে গেল। অদ্ভুত পাগলাটে মানুষ।'

জ্যাঠামশাই শুধালেন, 'ঠিক কোন্ সময়ে কাল মামুকে কুমিল্লায় দেখেছিলে মনে আছে ?"

বন্ধু বললেন, 'সন্ধ্যা ছটা সওয়া ছটা।'

জ্যাঠামশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'বলো কি ? ঠিক অমনি সময় মামু ফকির এখানে সার্কাসি তাঁবুর গেটের সামনে থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল।'

ফেনি থেকে কুমিল্লা প্রায় চল্লিশ মাইল দূর। তাহলে যে সময় মামু ফকির ফেনিতে অদৃশ্য হলেন, প্রায় সেই সময়েই তাঁকে কুমিল্লায় দেখা গেলো কি করে? অসামান্য দ্রুতগতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সশরীরে চলে যাওয়ার সত্যি সত্যি অলৌকিক ক্ষমতা মামু ফকিরের ছিল, আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে যে অসাধারণ ক্ষমতার ব্যাখ্যা চলে না—আমার উক্ত অধ্যাপক বন্ধুটির এই বিশ্বাস। অর্থাৎ ঐ অদ্ভুত ব্যাপারটি কি করে সম্ভব হলো, এ প্রশ্নের একমাত্র জবাব হচ্ছে: মামু ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল।

উক্ত কাহিনীটি যদি হুবহু যথার্থ বলে মেনে নেওয়া যায় তাহলে অবশ্য এই জবাব মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু এই 'যদি'-র ফ্যাঁকড়াটাই একটা বড়ো রকমের ফ্যাঁকড়া। প্রবাদেই বলে "To err is human" অর্থাৎ ভুল করাটা মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। চোখের ভুল আর মনের ভুল আমরা যে কত করি তার ঠিক নেই, আর সে ভুল অনেক ক্ষেত্রেই আমরা টের পাই না। এমন কি ভুল করেছি, এই সন্দেহ কেউ প্রকাশ করলেই চটে উঠি। পরের মুখে শোনা কাহিনীর কথা না-হয় বাদই দিলাম, কারণ কাহিনী এক মুখ থেকে অন্য মুখে ঘুরতে ঘুরতে অনেক সময় এমন বদলে যায় যে শেষ পর্যন্ত মূল কাহিনীর সঙ্গে মিল থাকে না। প্রত্যক্ষদর্শীও যখন তাঁর 'নিজের চোখে দেখা' ঘটনার কাহিনী বলেন তখন অনেক সময় তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারেও কাহিনীতে আসল ঘটনার সঙ্গে এখানে-সেখানে গরমিল হয়ে যায়। হয়তো ঘটনাটির এমন কয়েকটি অংশ তিনি খেয়াল করেন নি অথবা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবেন নি যে—অংশগুলিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলো লক্ষ্য করলে ব্যাপারটার রঙই বদলে যেত।

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বহু আলোচিত বিষয় হচ্ছে টেলিপ্যাথি (Telepathy) বা থট-ট্রানস্‌ফারেনস্‌ (Thought transference)—অর্থাৎ এক মন থেকে অন্য মনে অন্য কোনো মাধ্যমের সহায়তা না নিয়ে চিন্তা বা ভাব সঞ্চারিত করে দেওয়া। অনেকে বিশ্বাস করেন যোগী বা সাধু মহাপুরুষেরা আত্মিক ক্ষমতার সাহায্যে এ জিনিস করতে পারেন। বেতার স্টেশন থেকে ব্রডকাস্ট করা গান, বক্তৃতা ইত্যাদি আমরা আমাদের রেডিও সেটে ধরে বেতার প্রোগ্রাম শুনি। বিলেতে বক্তৃতা হচ্ছে, সে বক্তৃতা রেডিও সেটে ধরে ভারতে বসে শুনছি। বিজ্ঞানের এও তো একটি পরম বিস্ময়, শুধু এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলে এখন আর বিস্ময় বোধ করি না। টেলিপ্যাথিতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা বলেন এক মন থেকে আরেক মনে চিন্তা পরিচালনার ব্যাপারটা বেতারেরই অনুরূপ। একটি মগজ হচ্ছে বেতার প্রেরক-যন্ত্র, আরেকটি মগজ হচ্ছে বেতার 'রিসিভার' বা গ্রাহক-যন্ত্র। যে ভাবে বেতার প্রেরক-যন্ত্র থেকে কোনো বাণী প্রেরিত হয়ে দূরের রিসিভার যন্ত্রে ধরা পড়ে, তেমনি একটি মনের চিন্তাধারা তার মগজ-যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরিত হয়ে দূরের কোনো মগজে ধরা পড়তে পারে—এ কথা অবিশ্বাস করব কেন? অবশ্য এজন্য প্রেরক এবং গ্রাহক দুজনেরই অসাধারণ ক্ষমতা থাকা চাই। এই কারণেই এ ধরনের শক্তিকে আমরা বলি অলৌকিক শক্তি।

টেলিপ্যাথির একটি কাহিনী বলি। একজন বড়োলোকের বাড়িতে ছোটো একটি চায়ের বৈঠক বসেছে। বৈঠকে একজন যাদুকরও হাজির। তিনি ম্যাজিক দেখাবার জন্যে আসেন নি, এসেছেন গৃহস্বামীর একজন বন্ধুর বন্ধু হিসেবে নিমন্ত্রিত হয়ে।

কথাপ্রসঙ্গে টেলিপ্যাথির কথা উঠল। সে সময় এই বিষয়টি নিয়ে অনেক আসরে, বৈঠকে আর সাময়িক পত্রে আলোচনা চলেছিলো। গৃহস্বামী বললেন, তিনি টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাসী নন; একজন লোক এখানে বসে বসে দূরের কোনো লোকের মনের ভেতরে তাঁর নিজের মনের কথা শুধু মানসিক শক্তিতেই পাঠিয়ে দিতে পারবেন, এ তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নন।

এক ভদ্রলোক বললেন, "ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে। আপনি মনে করুন এইখানে বসে বসে একটা কথা ভাবছেন। সেই কথাটা আপনার মগজের যন্ত্রে যে সুরের তরঙ্গ জাগালো, সেই তরঙ্গ হাওয়ায় বলুন, অথবা ইথারে বলুন, ভাসতে ভাসতে গিয়ে আরেক জনের মগজের যন্ত্রে আঘাত করে তাতে সেই সুরের তরঙ্গটিই জাগিয়ে দিল। ঐ ভাবেই আপনার মনের কথাটি তাঁর মনে পৌঁছে গেলো।

মানে, তিনি আপনার মনের কথাটি ধরে ফেললেন, বেতার টেলিগ্রাফের মতো।"

গৃহস্বামী বললেন, "কথাটা শুনতে বেশ ভালো, এর ভেতর বেশ একটু কবিত্ব রয়েছে। কিন্তু এ কি বাস্তবে সম্ভব ?"

চায়ের কাপে চুমুক শেষ করে একজন বলে উঠলেন, "এই তো একজন যাদুকর রয়েছেন আমাদের ভেতর। অদ্ভুত আর রহস্যময় নিয়েই তো এঁর কারবার। এ বিষয়ে এঁর মতটা জানা যাক-না কেন ?"

গৃহস্বামী তখন যাদুকরকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি মনে করেন এ ধরনের ব্যাপার সত্যি সত্যি সম্ভব ?"

যাদুকর ছিলেন বেশ রসিক, তামাশাপ্রিয় ভদ্রলোক। তিনি বলেন, "এ বিষয়ে তত্ত্ব-আলোচনা না করে বরং হাতে কলমে পরীক্ষা করেই দেখা যাক-না কেন। তাতে আমারও খানিকটা অভিজ্ঞতা বাড়বে। কি বলেন আপনি ?" প্রশ্নটা গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করে।

গৃহস্বামী উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, "তাহলে তো বেশ ভালোই হয়।"

চা-চক্রের সবাই খুশী হয়ে উঠলেন। যাদুকরের নানারকম আশ্চর্য যাদুর খেলা দেখে তাঁরা অনেকে মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁর দেখানো খেলাগুলো যেমন মজাদার, তেমনি বিস্ময়কর। এই চায়ের আসরে 'টেলিপ্যাথি' সম্বন্ধে তিনি কি বলবেন আর কি দেখাবেন তাই নিয়ে সবারই মনে কৌতূহল জাগলো।

যাদুকর তখন গৃহস্বামীকে বললেন, "এ বিষয়ে কিছু দিন ধরে একটি বন্ধুর সঙ্গে আমি গবেষণা আর পরীক্ষা চালাচ্ছি। কিন্তু বন্ধুটি এখন এখানে উপস্থিত নেই, সুতরাং তার জায়গায় আপনাকেই নেওয়া যাক। লাল, নীল, হলদে, বেগুনি, কালো, সবুজ, শাদা--এই সাতটির ভেতর একটি রঙের নাম আমি খুব গভীর ভাবে চিন্তা করবো, অর্থাৎ কল্পনার চোখে দেখবো। আপনি খুব নিবিড়ভাবে মনঃসংযোগ করে চেষ্টা করে দেখুন আমার মনের চিন্তাটাকে আপনার মনে ধরে ফেলতে পারেন কিনা।"

গৃহস্বামী বললেন, "তার মানে, আপনি কি রঙের নাম ভাবছেন সেইটে আমি বলে দেবো ?"

"ঠিক তাই।"

গৃহস্বামী বললেন, "এও কি কখনো সম্ভব ?"

যাদুকর বললেন, "সম্ভব কিনা সেটাই তো আমারও প্রশ্ন। সেটাই এখন

আমাদের পরীক্ষা। আমাদের দুজনের মন যদি এক সুরে মেলে তাহলেই এটা সম্ভব হবে, নতুবা নয়। এক শীট শাদা কাগজ দিতে পারেন?"

এক শীট শাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজ ভাঁজ করে তাই থেকে ছোট্টো চৌকো এক-টুকরো কাগজ সযত্নে ছিঁড়ে নিয়ে গৃহস্বামী থেকে দূরে চলে গেলেন যাদুকর। তারপর ঐ কাগজের টুকরোর ওপর কি যেন লিখে পকেটে রেখে দিয়ে গৃহ-স্বামীকে বললেন, "এবারে আমাদের পরীক্ষা শুরু করা যাক।"

পরীক্ষা চললো কিছুক্ষণ ধরে। যাদুকর চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন একটি রঙের নাম; গৃহস্বামী চোখ বুজে মনে মনে সেই নামটি ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যাদুকর বলে দিলেন, "যখন মনে হবে একটি রঙ বেশি করে চোখে ভাসছে, তখন বলবেন সেই রঙের নামটি।"

কিছুক্ষণ বাদে গৃহস্বামী বললেন, "সবুজ।"

যাদুকর বললেন, "চমৎকার ধরেছেন। সবুজই আমি মনে করেছিলাম আর এই কাগজে লিখে রেখেছিলাম। দেখুন।" বলে পকেট থেকে সেই টুকরো কাগজটি খুলে দেখিয়ে দিলেন! সবাই বিস্ময়ে দেখলেন কাগজে লেখা রয়েছে "সবুজ"।

গৃহস্বামী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, "আশ্চর্য! আপনার চিন্তা আমি কি করে ধরে ফেললাম?"

যাদুকর হেসে বললেন, "তবে যে বলেছিলেন টেলিপ্যাথি সত্যি বলে আপনি বিশ্বাস করেন না? অথচ টেলিপ্যাথির ক্ষমতা আপনার নিজের ভেতরই রয়েছে।"

গৃহস্বামী বললেন, "এখন দেখছি টেলিপ্যাথি সত্যিই সম্ভব।"

যাদুকর বললেন, "অতো চট করে বিশ্বাস করে ফেলবেন না। বরং আরেকটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। আপনারা যে কোনো একটি তাসের নাম আমাকে বলুন। আমি এইখানে বসে মনে মনে সেই তাসের ছবিটি ভাবতে থাকলে আমার সেই বন্ধুটি—যার সঙ্গে কিছুদিন ধরে আমি টেলিপ্যাথি অভ্যাস করছি বলেছি—দূর থেকে সে ছবি মনে মনে ধরে নিতে পারে কিনা দেখা যাক।"

চা-চক্র থেকে অনেক ভেবে চিন্তে পছন্দ করা হলো ইস্কাপনের নওলা। যাদুকর বললেন, "আমি চোখ বুজে চুপচাপ একমনে এই তাসটির কথা ভাবতে থাকি। আপনারা ফোন করে দেখুন বন্ধুটিকে বাড়িতে পান কিনা। যদি পান তো আমাদের এই পরীক্ষার ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করুন ওর মনে কোনো তাসের ছবি ধরা পড়ছে কি না।"

"কতো নম্বর ফোন? আর কাকে ডাকব? নাম কি আপনার বন্ধুর?"

"অনিলবাবুকে ডাকুন। ফোন নম্বর ৭৮-১৩২৫।"

অনিলবাবুকে ফোনে ডেকে পাওয়া গেলো। তিনি বললেন, "আমি এখ্খুনি বেরিয়ে যাচ্ছি। ব্যাপার কি বলুন তো?"

ব্যাপারটা বোঝানো হলো তাঁকে। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "চোখ বুজেছি। মনে হচ্ছে ঝাপসা ছবি দেখছি একখানা তাসের। এইবার যেন আরেকটু স্পষ্ট হয়েছে। তাসটি—ইস্কাপনের নওলা।"

ইস্কাপনের নওলা! যাদুকর এবং সেই বন্ধুর মাঝামাঝি প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইলের ব্যবধান। যাদুকরের মন থেকে ইস্কাপনের নওলার ছবি অনিলবাবুর মনে চলে গেলো কি করে? চা-চক্রের সবাই বিস্মিত হয়ে বিশ্বাস করলেন খাঁটি টেলিপ্যাথি সত্যই যে আছে তার দুটি প্রমাণ তাঁর এইমাত্র পেলেন।

গৃহস্বামী বললেন, "এখন মনে হচ্ছে হ্যামলেট সত্যি কথাই বলেছিলো হোরেশিওকে: 'দেয়ার আর মোর থিঙ্স্ ইন হেভেন্ অ্যাণ্ড আর্থ দ্যান আর ড্রেম্ট্ অভ্ ইন্ ইওর ফিলজফি।' দুনিয়ার এমন অনেক আশ্চর্য সত্য আছে যা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।"

যাদুকর বললেন, "সে বিষয়ে হ্যামলেট এবং আপনার সঙ্গে আমিও একমত। আসল টেলিপ্যাথি সম্ভব হতে পারে এ আমি অবিশ্বাস করি না। কিন্তু এইমাত্র আপনারা টেলিপ্যাথির যে নমুনা দেখলেন সে দুটিই মেকি। অর্থাৎ ফাঁকির খেলা।"

"কিন্তু ফাঁকির ফাঁক কোথায়?" গৃহস্বামী বললেন বিস্মিত হয়ে।

যাদুকর টেলিপ্যাথির ঐ দুটি মেকি নমুনার যে ফাঁকিগুলো সেদিন ঐ চায়ের বৈঠকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন নি, সেগুলো এখানে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি।

প্রথমে এক নম্বর খেলার কথা বলি। চা-চক্রের অতিথিরা জানতেন না, আগে থেকেই যাদুকরের পকেটে লাল, নীল, হলদে, বেগুনি, কালো আর সবুজ লেখা ছয়টুকরো কাগজ ছিল। চা-চক্রে খেলা দেখাবার সময় সকলের সামনে যাদুকর শাদা কাগজের ফালি থেকে ঠিক পকেটের কাগজের টুকরোগুলির মতো সাইজ করে একটা টুকরো কেটে নিয়ে (যেন সাতটা টুকরোই এক সাইজের হয়) তাতে কাউকে না দেখিয়ে 'শাদা' লিখে পকেটে রেখে দিলেন। টুকরোগুলো পর পর এমনভাবে সাজানো, যেন যাদুকর সহজেই যে কোন রঙের নাম লেখা কাগজের টুকরো চট করে বার করে আনতে পারেন। গৃহস্বামী বললেন 'সবুজ', সঙ্গে সঙ্গেই পকেট থেকে 'সবুজ' লেখা কাগজের টুকরোটি বার করে দেখালেন

যাদুকর। গৃহস্বামী অন্য কোনো রঙের নাম বললে যাদুকরও সেই রঙের নাম-লেখা কাগজের টুকরো বার করে দেখাতেন।

এইবার বলি দু নম্বর খেলার ফাঁকির কথা। যাদুকরের বন্ধুটির সঙ্গে চা-চক্রের কেউ পরিচিত ছিলেন না, কেউ জানতেন না বন্ধুর নাম কি। যাদুকর চা-চক্রে যাবার আগে বন্ধুকে বলে গিয়েছিলেন বাড়ি থাকতে। বন্ধুর কাছে একটি ফর্দ ছিল, তাতে বাহান্নটি মানুষের নাম লেখা, আর প্রত্যেকটি মানুষের নামের পাশে একটি বিভিন্ন তাসের নাম। বন্ধুটি যেইমাত্র শুনলেন ফোনে খোঁজ হচ্ছে 'অনিল' বাবুর, অমনি তাঁর ফর্দ মিলিয়ে দেখলেন 'অনিল' নামের পাশে লেখা রয়েছে 'ইস্কাপনের নওলা।' বুঝে নিলেন তাসের এই নামটিই বলতে হবে। কিন্তু চট্ করে বলে ফেললে ব্যাপারটার রহস্য দানা বাঁধবে না। তাই তিনি যেন কিছুই জানেন না এমনি ভান করে বললেন, হ্যাঁ, আমিই অনিলবাবু।··· কি ব্যাপার বলুন তো?' ইত্যাদি। তারপর ও পক্ষকে কিছুক্ষণ খেলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ইস্কাপনের নওলা।' এদিকে নামের ফর্দটি যাদুকরের মুখস্থ। সুতরাং 'ইস্কাপনের নওলা' যেইমাত্র পছন্দ করা হয়েছিলো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিলো 'অনিল'; তাই তিনি ফোনে 'অনিল' বাবুকে ডাকতে বলেছিলেন।

খেলার কৌশলটি অতি সরল, সহজ। (বেশির ভাগ আশ্চর্য খেলারই কৌশল তাই)। কিন্তু খেলাটি বেশ সুষ্ঠুভাবে দেখাতে পারলে কৌশলটুকু যাঁরা জানেন না তাঁদের মনে হবে এ বুঝি সত্যি সত্যি অতীন্দ্রিয় ব্যাপার, আসল টেলিপ্যাথি। আরেকটা কথা বলি। সেদিন চা-চক্রের অধিকাংশ অতিথিই ভেবেছিলেন টেলিপ্যাথির প্রসঙ্গটা বুঝি দৈবাৎ উঠে পড়লো। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। যাদুকরই এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যেন টেলিপ্যাথির আলোচনা ওঠে, আর সেই সূত্রে তিনি এই খেলা দুটো দেখাতে পারেন। আগে বলেছি, আবারও বলি চাতুর্যপূর্ণ কৌশলে মেকি টেলিপ্যাথিকে আসল টেলিপ্যাথি বলে চালানো যায় বলেই এটা প্রমাণিত হয় না যে সত্যিকারের টেলিপ্যাথি অসম্ভব।

ফরাসী যাদুসম্রাট উদ্যাঁ

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। শহর পারী (Paris), ফরাসী দেশের রাজধানী। রঙ্গালয়ে যাদুর খেলা দেখে সারা প্রেক্ষাগৃহ মন্ত্রমুগ্ধ, স্তম্ভিত। যাদুকর তাঁর ছ' বছরের ছেলেটিকে মঞ্চের সমান্তরালভাবে শূন্যে ভাসিয়ে রেখে দিয়েছেন। ছেলেটির ডানহাতের কনুইটুকুই শুধু ভর করে রয়েছে একটি খাড়া লাঠির ডগায়। মাধ্যাকর্ষণকে হারিয়ে দিয়েছে যাদুকরের যাদু। কি করে? দর্শকের চোখের সামনে এক বোতল 'ইথার' ঐ ছোট্ট ছেলেটির নাকের সামনে ধরে তাকে জোর করে সেই 'ইথার' শুঁকিয়েছেন যাদুকর। (অস্ত্রচিকিৎসা বা সার্জারির জগতে তখন রোগীদের অজ্ঞান করবার জন্য ইথারের ঐরকম ব্যবহার সুরু হয়েছে।) ইথার শুঁকে শুঁকে ছেলেটি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, সেই অবস্থায় রহস্যময়ভাবে তার দেহ ভাসছে হাওয়ায়! মাধ্যাকর্ষণ তাকে টানছে না নীচের দিকে।

অদ্ভুত! অভাবনীয়! কিন্তু নিষ্ঠুর ঐ মারাত্মক ইথার শুঁকিয়ে শুঁকিয়ে ঐ দুধের শিশুর ওপর অমন অত্যাচার করেছেন যাদুকর! ছেলেটা যে শেষে একদিন হার্টফেল করে মারা যাবে। আইনের চাপ দিয়ে এ খেলা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যাদু প্রদর্শনের নামে শিশুর ওপর রাতের পর রাত এ অত্যাচার চলতে দেওয়া কখনোই উচিত নয়। প্রেক্ষাগৃহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেমন বিপুল বিস্ময়ের শিহরণ, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ঐ বেচারা ছোট ছেলেটির প্রতি দরদ এবং হৃদয়হীন যাদুকরা পিতার বিরুদ্ধে নালিশের গুঞ্জন।

যাদুকর আর কেউ নন, ফরাসী দেশের ভাবী 'যাদুসম্রাট', আধুনিক যাদু-বিদ্যার জনক রবেয়ার উদ্যাঁ (Robert Houdin)। ছেলেটি তাঁর ছয় বছর বয়সের ছেলে ইউজেন। উক্ত খেলাটি সম্পর্কে যাদুসম্রাট উদ্যাঁ তাঁর স্মৃতি কথায় এইভাবে লিখেছেন :

"১৮৪৭ সালে সুরু হয়েছিলো অস্ত্রচিকিৎসার ক্ষেত্রে ইথার শুঁকিয়ে রোগীদের অজ্ঞান করার পদ্ধতি। ব্যথাবোধের শক্তি লুপ্ত করে দিতে ইথারের যাদুমন্ত্রের মতো ক্ষমতা সারা দুনিয়ায় বিস্মিত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিলো। সাধারণ মানুষের চোখে এ ব্যাপারটাও যাদুরই সামিল। ভাবলাম সার্জনরা যখন এভাবে যাদুর এলাকায় হস্তক্ষেপ করছেন, তখন যাদুকর হিসেবে আমারও এর একটা

পাল্টা জবাব দেওয়া উচিত। এই ভেবেই ইথারের সাহায্যে ছেলেকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখার এই খেলাটি আমি আবিষ্কার করলাম, সার্জনদের হারিয়ে দেবার জন্যে। ইথারের প্রয়োগ করে সার্জনরা যা কিছু করেছেন, তার চাইতে আমার এ আবিষ্কারটি নিশ্চয়ই অনেক বেশী বিস্ময়কর।..."

আসলে কিন্তু খেলাটার কৌশল ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। এ খেলায় 'ইথার' আদৌ ব্যবহার করা হতো না, ইথারের বোতল বলে যেটি নাকের কাছে ধরা হতো, তার বাইরে "ইথার" লেবেল আঁটা থাকলেও ভেতরে এক ফোঁটা ইথারও ছিলো না। ইউজেনকে ইথার শোঁকানোর অভিনয়ের উদ্দেশ্য ছিলো দর্শকের কল্পনাকে ভুল পথে চালিত করা, এবং রহস্যটির একটা ভুয়ো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে রহস্যটিকে আরো ঘনিয়ে তোলা। এইখানেই উদ্যাঁর সৃজনী কল্পনার পরিচয় মেলে। এইখানেই তিনি শিল্পী, 'আর্টিস্ট'।

এই খেলাটির নীতিগত দিকটা নিয়ে কাগজে কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছিলো। অসহায় শিশুর ওপর এই ইথারীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কড়া কড়া মন্তব্য করে বহু পত্রলেখক যাদুকরকে তুলো ধুনেছিলেন, জাতির বিবেকের কাছে নানা-ভাবে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন: জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য একটি শিশুর স্বাস্থ্য, এমন কি জীবন, রাতের পর রাত এভাবে বিপন্ন করা উচিত কি?

কাগজে কাগজে এই তুমুল প্রতিবাদের ফলে খেলাটির প্রচার হয়েছিলো অসামান্য! এই প্রচারের অন্যতম ফল স্বরূপ উদ্যাঁ পেয়েছিলেন বেলজিয়ামের রাজপ্রাসাদে যাদু প্রদর্শনের সাদর আমন্ত্রণ। খবরের কাগজে যাদুকর উদ্যাঁকে তুলো ধুনে যে চিঠির পর চিঠি ছাপা হয়েছিলো, সেগুলো স্বয়ং যাদুকর উদ্যাঁই বিভিন্ন লোককে দিয়ে লিখিয়েছিলেন, এ সন্দেহ (অথবা নিঃসংশয় ধারণা) করলে বোধ হয় খুব ভুল হবে না। প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা-পাবলিসিটির মূল্যবোধের ব্যাপারে উদ্যাঁ তাঁর সময়ের চাইতে অনেক এগিয়ে ছিলেন।...

"লাইফ বিগিনস অ্যাট ফরটি" (জীবন সুরু হয় চল্লিশ বছর বয়সে) এই ইংরেজী বচনটি কে উচ্চারণ করেছিলেন মনে নেই, কিন্তু এটি আশ্চর্যরকম সত্য হয়েছিলো ফরাসী যাদুসম্রাট রবেয়ার উদ্যাঁর জীবনে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর সত্যিকারের পেশাদারী যাদু জীবন শুরু হলো প্যারী শহরে। এর চল্লিশ বছর আগে ফ্রান্সের ব্লোয়া (Blois) শহরে তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৮০৫ খৃস্টাব্দে। পিতৃদত্ত নাম ছিলো জাঁ ইউজেন রবেয়ার (Jean Eugene Robert)।

রবেয়ারের বাবা চেয়েছিলেন তাঁকে উকিল বা ডাক্তার বানাতে। কোনোটাই

রবেয়ারের মনঃপূত হলো না, কিছুদিন বাদে তিনি ঘড়ি তৈরির পৈতৃক কাজেই লেগে গেলেন। কলকব্জার কাজে তিনি অসাধারণ দক্ষও হয়েছিলেন। প্যারী শহরের একজন প্রতিষ্ঠাবান ঘড়ি-নির্মাতার কন্যা কুমারী উদ্যাঁকে বিয়ে করে রবেয়ার প্যারী শহরে শ্বশুরের প্রতিষ্ঠানেই কাজে লেগে গেলেন এবং ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য নিজের নামের সঙ্গে শ্বশুরের পদবী যোগ দিয়ে হয়ে গেলেন রবেয়ার উদ্যাঁ, যে নামে তিনি যাদুবিদ্যার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

বলেছি রবেয়ার উদ্যাঁ স্বাধীনভাবে যাদুকররূপে রঙ্গমঞ্চে প্রথম দাঁড়িয়েছিলেন চল্লিশ বছর বয়সে, কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতির সূত্রপাত হয়েছিলো অনেকদিন আগেই। জন্মস্থান ব্লোয়া শহরে তিনি তখন ঘড়ির কাজ করেছেন, বয়স আঠারো বছর। বইয়ের দোকানে ঘড়ি নির্মাণ সম্বন্ধে একটি বই খুঁজতে গিয়ে তাঁর হাতে পড়লো কয়েক খণ্ড পুরাতন এন্‌সাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থ, যার এক খণ্ডের একটি অধ্যায় ছিলো বৈজ্ঞানিক আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে। সে অধ্যায়ে কতগুলো যাদুক্রীড়ার কৌশল চিত্রসহ ব্যাখ্যা করা ছিলো। তাই পড়ে তিনি যাদুবিদ্যায় উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ঐ গ্রন্থটি ঐভাবে তাঁর হাতে না পড়লে যাদুজগৎ হয়তো পেতো না যাদুসম্রাট রবেয়ার উদ্যাঁকে। কিন্তু বিধাতা যে ঘড়ি-বিশারদকে ঘড়ি ছাড়িয়ে যাদুকর বানাবেন, তাঁর জীবনে ঐরকম একটা যোগাযোগ হতেই হবে।

একটাই বা বলি কেন, আরেকটি আশ্চর্য যোগাযোগও ঘটলো রবেয়ারের জীবনে তেইশ বছর বয়সে। তুর (Tours) শহরে এক ঘড়ির কারখানায় কাজ করছেন তিনি তখন। একদিন ফুড পয়জনিং অর্থাৎ খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে রবেয়ার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন; প্রায় প্রলাপের অবস্থা শুরু হলো। সন্দেহটা খুব সম্ভব অমূলক, তবু রবেয়ারের মনে সন্দেহ জাগলো তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা হয়েছে। তিনি অসুস্থ অবস্থায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে রওনা হলেন ব্লোয়া শহর অভিমুখে। দেহত্যাগ যদি করতেই হয়তো নিজের ঘরেই করবেন, বিদেশে বিভুঁয়ে নয়। অমন অসুস্থ অবস্থায় একা পথে বেরিয়ে পড়ে তিনি বুদ্ধির কাজ করেননি, কিন্তু এই নিতান্ত দুর্বুদ্ধির কাজটি না করলে এর পরের অমূল্য যোগাযোগটি ঘটতো না। অসুস্থ দেহে কিছুদূর গিয়ে রবেয়ার মূর্ছিত হয়ে নিরালা পথের ধারে পড়ে রইলেন। বিধাতার বিধানে ঠিক সেই সময় সেই পথ দিয়ে অ্যাঙ্গার্স-এর মেলায় চলেছিলেন তাঁর যাদুর পসরা নিয়ে তখনকার প্রতিষ্ঠাবান যাদুকর টরিনি। টরিনি রবেয়ারকে তুলে নিলেন এবং কয়েকদিনের ভেতরেই তাঁর যত্নে ভালো হয়ে উঠলেন রবেয়ার। রবেয়ার ভালো হয়ে ওঠার পর এক

দুর্ঘটনায় টরিনি এমন আহত হলেন যে কিছুদিনের জন্য তাঁর পক্ষে যাদু প্রদর্শন করা চলবে না, অথচ যাদু দেখিয়েই তাঁর রুটির জোগাড় হতো, যাদু বন্ধ হলে রুটিও যে বন্ধ হবে। এখন উপায় ?

রবেয়ার টরিনির কাছে ঋণী, কৃতজ্ঞতায় ভরে আছে তাঁর মন। তিনি এ অবস্থায় টরিনিকে ফেলে চলে গেলেন না, টরিনির যে যে জায়গায় খেলা দেখাবার কথা ছিলো সেখানে সেখানে তিনি টরিনির প্রতিনিধিরূপে খেলা দেখাতে লাগলেন, অবশ্য টরিনির সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে। টরিনি খুশী হয়ে যাদুবিদ্যার বেশ ভালো তালিম দিয়েছিলেন রবেয়ারকে, হাতে কলমে শিখিয়ে দিয়েছিলেন তখনকার অনেকগুলো সেরা যাদুর খেলা। বলা বাহুল্য, এই দামী তালিমের ফলে রবেয়ার প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন।

অ্যাঙ্গার্স-এর মেলায় রবেয়ার একটি মজার কাণ্ড দেখেছিলেন, এক ফাঁকে তার বর্ণনা করে রাখি সংক্ষেপে। ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি এলাকার কাস্টেলি নামে একজন যাদুকর খেলা দেখাচ্ছিলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন এবার তিনি একটি অসাধারণ খেলা দেখাবেন :

"জীবন্ত মানুষ ভক্ষণ।"

"আপনাদের চোখের সামনে এইখানে একটি জ্যান্ত মানুষকে আমি চিবিয়ে খেয়ে ফেলব।" বললেন কাস্টেলি। "বলুন কাকে খাব।"

একটা আস্ত মানুষ চিবিয়ে খাবে লোকটা ? এও কি কখনো সম্ভব ? কাস্টেলিকে কোণঠাসা করে জব্দ করবার জন্য দর্শকের মধ্য থেকে দুই ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। ভাবটা যেন "এই যে এসেছি। আমাদের দুজনের যাকে খুশি খাও।"

যাদুকর তখন আগন্তুকদ্বয়ের একজনকে বেছে নিয়ে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভদ্রমহোদয়া এবং ভদ্রমহোদয়গণ, এইবার তাহলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি খাওয়া শুরু করি।" বলে ভদ্রলোকটির ঘাড়ে এক কামড়। কামড় খেয়েই ভদ্রলোক যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে ছুটে পালালেন। কাস্টেলি মুখ বেজার করে বললেন, "খাওয়া শুরু করতে না করতেই এভাবে ছুটে পালালে খাবো কি করে ? ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা অপর কাউকে পাঠান আমার কাছে।"

বলা বাহুল্য, রাক্ষুসে যাদুকরের জীবন্ত খাদ্য হতে আর কোনো ভদ্রমহোদয় এগিয়ে আসেন নি। যাদুকরেরও কথার খেলাপ ধরতে পারেন নি কেউ। যাদু-

কর তো জ্যান্ত মানুষ খেতে রাজী—খাদ্য হতে কেউ রাজি না হলে তিনি খাবেন কি করে ?…

টরিনি যখন সুস্থ হয়ে উঠে আবার যাদু প্রদর্শন শুরু করবার লায়েক হলেন, রবেয়ার তখন টরিনির দল ছেড়ে ফিরে গেলেন নিজের বাড়িতে, ব্লোয়া (Blois) শহরে। এই সময়ে ব্লোয়া-তে বেড়াতে এলেন প্যারী শহরের এক বিখ্যাত ঘড়ি নির্মাতার কন্যা কুমারী উদ্যাঁ (Houdin)। রবেয়ারের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হলো, তারপর বিবাহ প্রস্তাব, তারপর বিবাহ, তারপর রবেয়ার হয়ে গেলেন রবেয়ার উদ্যাঁ—একথা আগেই বলা হয়েছে।

সাল ১৮৪৩। প্যারী শহরে একটি ঘড়ির দোকান আর কারখানা। বাইরে ছোট্ট সাইনবোর্ডে লেখা মালিকের নাম : রবেয়ার উদ্যাঁ। তার তলায় লেখা : "এখানকার ঘড়ি নিখুঁত সময় দেয়।" শুধু ঘড়িই নয়, নানারকম আশ্চর্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি তৈরিতেও উদ্যাঁর দক্ষতা অসাধারণ। সম্প্রতি উদ্যাঁ একটি আশ্চর্য দেয়াল ঘড়ি তৈরি করে বিক্রি করেছেন ধনকুবের কাউন্ট দ্য লেস্কালোপিয়ের কাছে আশ্চর্য সময় দেয় ঘড়িটা, অথচ কি করে চলে, কোথায় এর কলকব্জা, কিছুই বোঝা যায় না, দেখা যায় না। এ যেন এক যাদু ঘড়ি। কাউন্ট এই ধরনের কৌতুক আর রহস্যভরা আর্ট বা কারুশিল্প খুব পছন্দ করেন, উদ্যাঁর এই ধরনের চাতুর্যে ভরা কারিগরির তিনি পরম ভক্ত। প্রায়ই তিনি এসে বসেন উদ্যাঁর কারখানায়, দেখেন উদ্যাঁকে কাজ করতে, নানারকম আলোচনাও চলে। কথায় কথায় উদ্যাঁর মনের বাসনা টের পেলেন কাউন্ট। উদ্যাঁর বড় সাধ সব কিছু ছেড়ে পুরোপুরি যাদুকর হয়ে যান। কিন্তু বিবাহ করেছেন, সন্তানাদি হয়েছে, দায়িত্ব বেড়েছে। কাজেই ঘড়ির কাজের নিশ্চিত বাঁধা আয় ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ যাদুকর-জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়াটাও বিপজ্জনক, বিশেষ করে পুরোপুরি পেশা হিসেবে যাদু বিদ্যায় সাফল্য লাভের মতো যথেষ্ট যোগ্যতা তাঁর আছে কি না সেটাও ভাববার কথা। সংসারী মানুষের কি যা তা একটা ঝুঁকি নিলে চলে ?

কাউন্ট তাঁর ভবনে বহু বিশিষ্ট অতিথিদের নিমন্ত্রণ করে এনে প্রায়ই তাঁদের সামনে ঘরোয়া পরিবেশে রবেয়ার উদ্যাঁকে যাদু প্রদর্শনের সুযোগ দিতে লাগলেন। ফলে উদ্যাঁ যাদু-দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে লাগলেন দ্রুতবেগে। মন থেকে দূর হয়ে গেলো শঙ্কা, সন্দেহ ; যাদু-জীবনের সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন তিনি। এর আগে যাদু অভিযানে কাউন্টের অর্থ গ্রহণ

করতে রাজী হন নি উদ্যাঁ ; এইবার রাজী হলেন, অবশ্য ঋণ হিসেবে। পনেরো হাজার ফ্রাঁ (ফরাসী মুদ্রা) দিলেন কাউণ্ট।

প্যারী শহরের বিশিষ্ট অঞ্চলে একটি ছোট্ট অন্তরঙ্গ রঙ্গালয় নির্মাণ করালেন উদ্যাঁ, তাঁর নিজস্ব "যাদু-মন্দির"। প্রেক্ষাগৃহে দুশো জন দর্শকের বসবার জায়গা। এই যাদু-মন্দিরে ১৮৪৫ সালের ৩রা জুলাই তারিখে চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথম তাঁর নিজস্ব যাদু প্রদর্শনী মঞ্চস্থ করলেন রবেয়ার উদ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে অসামান্য সাফল্য, অপূর্ব জনপ্রিয়তা। এক বছরের ভেতর কাউণ্টের পনেরো হাজার ফ্রাঁ সুদে আসলে শোধ করে দিলেন যাদুকর উদ্যাঁ।

যাদু জগতে তিনি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিলেন জবড়জং মঞ্চসজ্জা, আসবাব এবং পোশাক বাতিল করে দিয়ে মঞ্চ যথাসম্ভব ফাঁকা এবং সাদাসিধে করে, আসবাবপত্র সরল করে এবং যাদুকরের পোশাক এবং সাধারণ ভদ্রলোকের দৈনন্দিন পোশাকে কোনো তফাৎ না রেখে। যাদুকরোচিত (?) ঢোলা হাতার আগুলফ লম্বিত আলখাল্লা নয়, সাধারণ সান্ধ্য পোশাক পরে যাদু দেখাতেন উদ্যাঁ। মঞ্চ সাজানো থাকতো যে কোনো সাধারণ ভদ্রলোকের বাড়ির ড্রইংরুম বা বৈঠকখানার মতো। সেকেলে স্থূল এবং জবড়জং মঞ্চসজ্জা থেকে আধুনিক সূক্ষ্ম এবং সারল্যের দিকে এই যে যাদু প্রদর্শনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে নানাভাবে যাদুর সেবায় নিয়োজিত করা শুরু করেছিলেন, এই জন্যেই তাঁকে বলা হয় "আধুনিক যাদুবিদ্যার জনক"।

উদ্যাঁর "যাদু-মন্দির"-এর উদ্বোধনী প্রদর্শন হলো ১৮৪৫-এর জুলাই মাসে। পরের বছর ১২ই ফেব্রুয়ারী তিনি একটি নতুন খেলা মঞ্চস্থ করেন। খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁর প্রোগ্রামে এইভাবে লেখা ছিলো :

"এই খেলায় রবেয়ার উদ্যাঁর পুত্র—যাহার দ্বিতীয় দৃষ্টির (অথবা দিব্যদৃষ্টির) অলৌকিক ক্ষমতা বিস্ময়কর—চোখের উপর পুরু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দর্শকদের পছন্দ করা যে কোনো জিনিস বর্ণনা করিবে।"

এই পুত্রটি উদ্যাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র এমিল, বয়স চৌদ্দ পনেরো বছর ; পিতার সহযোগে স্মৃতির চর্চা করে করে এমিলের স্মৃতিশক্তি হয়ে উঠেছিলো অসাধারণ। চোখ বাঁধা এমিল বসে থাকতো মঞ্চে, উদ্যাঁ ঘুরে বেড়াতেন প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের ভেতর। দর্শকদের যাঁর যা খুশি তুলে দিতেন উদ্যাঁর হাতে, উদ্যাঁ প্রশ্ন করতেই এমিল সেগুলোর নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে যেতো। দর্শকেরা বিস্মিত হতেন কারণ তাঁরা জানতেন না উদ্যাঁ নানা সংকেত আর ইঙ্গিতে এমিলকে যা জানিয়ে দিচ্ছেন

এমিল শুধু তাই বলে যাচ্ছে মাত্র। তার চোখে দেখার কিছু দরকার নেই, দরকার শুধু বিভিন্ন দ্রব্য, সংখ্যা, রং, ওজন, টাকা প্রভৃতির গোপন সংকেতের ফর্দ নির্ভুল-ভাবে মনে রাখা। পিতাপুত্র দুজনের স্মরণশক্তি ছিলো অসাধারণ তৈরী—বহু বিভিন্ন রকম জিনিসের বিবরণ একে অন্যকে গোপন সংকেতে জানিয়ে দিতে পারতেন তাঁরা।

অন্যান্য আরো খেলার সঙ্গে এই খেলাটির খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বেলজিয়ামের রাজপ্রাসাদে খেলা দেখাবার জন্য উদ্যাঁ রওনা হলেন রাজধানী ব্রুসেল্‌স্ অভিমুখে। সীমান্তে এক মজার ব্যাপার হলো। বেলজিয়ান শুল্ক বিভাগের কর্মচারী উদ্যাঁর যাদু সরঞ্জামের জন্য শুল্ক দাবী করলেন। উদ্যাঁ বললেন, "এগুলো বিক্রী করবার মাল নয়, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জিনিস।

কর্মচারী বললেন, "কি করে তা বিশ্বাস করব? এসব কি ধরণের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জিনিষপত্র?"

পুত্র এমিল তখন পথের ধারে দাঁড়িয়ে দূরের দৃশ্য দেখছিলো। তাকে ডেকে রবেয়ার উদ্যাঁ বললেন, "এমিল, ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দাও তো আমরা যাদুকর। বলে দাও ওর পকেটে কি কি আছে।"

কর্মচারীর অজ্ঞাতসারে বহুদিনের অভ্যস্ত দ্রুত পযবেক্ষণের সাহায্যে উদ্যাঁ লক্ষ্য করে নিয়েছিলেন ভদ্রলোকের পকেটের জিনিষগুলি। "দ্বিতীয় দৃষ্টি'র খেলায় ব্যবহৃত ইঙ্গিতের সাহায্যে তিনি তাদের বিবরণ গোপনে টেলিগ্রাফ করে দিলেন এমিলের মগজে। তখন এমিল এদিকে না তাকিয়েই অনায়াসে বলে দিলো, "একটা রুমাল, তাতে নীল নীল ডোরা। একটি চশমার খাপ। আর এক চাক চিনি।"

শুল্ক বিভাগের কর্মচারী জীবনে কখনো এতো বিস্মিত হন নি। তিনি বললেন, "সত্যিই আপনারা যাদুকর। আমার আর সন্দেহ নেই।" বিনা শুল্কেই ছাড়া পেলেন রবেয়ার উদ্যাঁ।

বেলজিয়মের পর ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে যাদু প্রদর্শন করেছেন যাদুকর উদ্যাঁ। ইংল্যাণ্ডে মহারাণী ভিকটোরিয়ার ঘরোয়া আসরে তিনি বার-বার তিনবার যাদু প্রদর্শনের সৌভাগ্য এবং সম্মান লাভ করেছিলেন। ১৮৫২ সালে জার্মাণীর বিভিন্ন স্থানে যাদু প্রদর্শন করে তিনি যাদুমঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন, এবং তাঁর 'যাদু মন্দিরে'র ভার দিলেন হ্যামিণ্টন নামে এক ইংরেজ যুবককে। হ্যামিণ্টন রবেয়ার উদ্যাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করলেন এবং উদ্যাঁর যাদু-

প্রদর্শনীর উত্তরাধিকারী হলেন। ভগ্নীপতি হ্যামিন্টনকে রবেয়ার হাতে কলমে কতকগুলো অদ্ভুত খেলার কৌশলাদি শিখিয়ে দিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ। আপন গৃহে অবসর ভোগ করেছিলেন উদ্যাঁ। এলো ফরাসী সরকার থেকে আমন্ত্রণ। সেই আমন্ত্রণে—অর্থাৎ পরোক্ষ আদেশে—তিনি আল-জিরিয়াতে (উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী উপনিবেশ) গিয়ে সেখানকার আরবদের কাছে তাদের নিজস্ব যাদুকরের যাদুর চাইতে ফরাসী যাদুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ফরাসী জাতির, তথা ফরাসী সরকারের মান মর্যাদা বাড়িয়ে এলেন। ফিরে এসে জীবনের বাকি দিনগুলি তিনি ব্যাপৃত রইলেন নিজের বিভিন্ন আবিষ্কার গুলোর উন্নতি সাধনে এবং গ্রন্থ রচনায়। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর ভেতর সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর "আত্মস্মৃতি"। অনেকের বিশ্বাস সে গ্রন্থ তিনি নিজে লেখেন নি। লিখিয়ে নিয়েছিলেন কোনো পেশাদার পাকা লেখককে দিয়ে। তাই যদি হয় তাহলেই বা আমাদের দুঃখ বা আপত্তি হবে কেন? যাদুবিদ্যায় দক্ষ হাত যে গ্রন্থরচনাতেও তেমনি দক্ষ হবে, এমন কোনো কথা নেই। নিজে ভালো লিখতে পারেন না বলে তিনি যদি সেই পাকা পেশাদার লেখকের সাহায্য না নিতেন, তাহলে পৃথিবীর যাদুসাহিত্য একটি মূল্যবান গ্রন্থ থেকে চিরতরে বঞ্চিত থাকতো।

উদাহরণ স্বরূপ একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি উদ্যাঁর "আত্মস্মৃতি" গ্রন্থ থেকে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। রাজা লুই ফিলিপ আমন্ত্রণ (অর্থাৎ আদেশ) পাঠালেন উদ্যাঁকে অমুক তারিখে রাজপ্রাসাদে যাদুর খেলা দেখাতে হবে।

অমুক তারিখের তখন ছয় দিন বাকি। এই সময়ের ভেতর উদ্যাঁ গোপনে একটি ব্যবস্থা করে রাখলেন।

এলো যাদু প্রদর্শনের দিন। শুরু হলো যাদুর খেলা। সর্বশেষে এলো সেই চরম বিস্ময়ের খেলাটি। উদ্যাঁর উক্তিই সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া যাক :

"দর্শকদের কাছ থেকে কয়েকখানা রুমাল চেয়ে নিয়ে একটা ছোট্ট পুঁটুলি করে রেখে দিলাম টেবিলের ওপর। তারপর সেই রুমাল যাঁরা ধার দিয়েছিলেন তাঁরা এক একটি কার্ডে তাঁদের খুশিমতো এক একটি জায়গার নাম লিখলেন। আমি রাজা মশাইকে বললাম এই কার্ডগুলোর লেখা থেকে বেছে যে কোনো একটি জায়গার নাম আমাকে বলুন; আমি সেইখানেই যাদুমন্ত্রে রুমালগুলোকে পাঠিয়ে দেবো। তিনি কার্ডের লেখাগুলো দেখে দেখে একটি লেখা পছন্দ করে

বললেন, 'বাগানের ওধারে ঐ যে কমলালেবুর গাছটি দেখা যাচ্ছে, ঐ গাছের গুঁড়ির তলায় পাঠাতে পারেন?' আমি বললাম, খুবই সহজে। সঙ্গে সঙ্গে রাজাদেশে কয়েকজন প্রহরী ছুটে গিয়ে সেই কমলাগাছটি ঘিরে পাহারা দিতে লাগলো, যেন আমার দিক থেকে সেখানে কোনো রকম কারসাজি করা সম্ভব হতে না পারে। দেখে আমি মনে মনে হাসলাম, কারণ ঐ গাছের তলায় যা করবার আমি করে রেখেছি, এখন আর ঐ পাহারায় আমার কি আসে যায়?...

"আমি একটা ঢাকনা দিয়ে টেবিলের ওপরকার রুমালগুলোকে ঢেকে দিলাম। তারপর ঢাকনা তুলে নিতেই দেখা গেলো রুমালগুলো উধাও, তার বদলে সেখানে রয়েছে একটা ছোটো পাখী, তার গলায় ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা চাবি।

"পাহারাধীন কমলালেবুর গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেলো তালা বন্ধ মরচেধরা পুরোনো লোহার বাক্স একটা। এটা প্রাসাদে নিয়ে এলো ভৃত্যদল। পাখীটির গলায় বাঁধা ফিতা থেকে চাবি নিয়ে লোহার বাক্সটি খুলে দেখা গেলো বাক্সের ভেতর রয়েছে একটা পার্চমেণ্ট, তার ওপর লেখা: 'আজ ৬ই জুন ১৭৮৬, আমি কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো, এ লোহার বাক্সের ভেতর এ রুমালগুলি পুরে এই কমলালেবু গাছের তলায় পুঁতে রাখছি। এগুলো কাজে লাগবে আজ থেকে ষাট বছর পরে, রাজা লুই ফিলিপ এবং তাঁর পরিবারবর্গকে একটি যাদুর খেলা দেখাবার ব্যাপারে।' তলায় ক্যালিওস্ট্রোর স্বাক্ষর এবং তাঁর শীলমোহরের ছাপ। দেখে রাজা লুই ফিলিপ এবং অন্যান্য সবাই বিস্ময়ে স্তম্ভিত। পার্চমেণ্টটি তুলে ফেলতেই দেখা গেলো তার তলায় একটা ছোট পুঁটুলির মুখ শীল করা, তাতেও বিগত শতাব্দীর কুখ্যাত যাদুকর ক্যালিওস্ট্রোর নামাঙ্কিত শীলমোহরের ছাপ! শীল ভেঙে পুঁটুলিটি খুলতেই বেরিয়ে পড়ল সেই রুমালগুলো, যেগুলো একটু আগেই টেবিলের ওপর থেকে রহস্যজনকভাবে উড়ে গেছে!..."

রাজা লুই ফিলিপ এবং অন্যান্য দর্শকেরা এই 'অলৌকিক' ব্যাপার দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু উদ্যার আত্মস্মৃতিতে যে ইঙ্গিত রয়েছে তা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি ব্যাপারটা মোটেই অলৌকিক নয়, অনায়াসেই ধরে নিতে পারি ঐ বাক্স পুঁতিয়ে রেখেছিলেন ক্যালিওস্ট্রো নয়, উদ্যা, এবং যাদু দেখাবার আমন্ত্রণ পাবার পরে। রাজা যাতে ঠিক এই গাছের তলাটাই পছন্দ করেন সে ব্যবস্থা করা চতুর যাদুকরের পক্ষে কঠিন হয় নি। আর রুমালগুলি? কি রকম রুমাল ধার পাওয়া যাবে তা আগে জেনে নিয়ে ঠিক ঐ রকম রুমালই বাক্সের ভেতর রেখে দিয়েছিলেন উদ্যা।

বিশেষ করে বিগত (অষ্টাদশ) শতাব্দীর অলৌকিক রহস্যসম্রাট ক্যালিওস্ট্রোকে এই খেলার সঙ্গে জড়িয়ে উদ্যাঁ খেলাটিকে আরো রোমাঞ্চকর করে তুলেছিলেন। ক্যালিওস্ট্রোর শীল তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ক্যালিওস্ট্রোর বন্ধু যাদুকর টরিনির কাছ থেকে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যাদুসম্রাট উদ্যাঁ পরলোকে রওনা হয়ে যান। তাঁর ছেলেরা কিন্তু তাঁর যাদুকর জীবনের উত্তরাধিকারী হন নি।

* * * *

ফরাসী সরকারের অনুরোধে যাদুকর রূপে উদ্যাঁর আলজিরিয়া অভিযানের উল্লেখ করেছি সংক্ষেপে। কিন্তু তার জীবনের এই অসাধারণ অধ্যায়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবী করতে পারে। ফরাসী সরকার কেন বাধ্য হয়েছিলেন উদ্যাঁকে আলজিরিয়ায় পাঠাতে? কি উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন উদ্যাঁ, এবং কি কি কৌশলে? সেই কাহিনীই বলছি। আলজিরিয়ার অধিবাসীরা দুর্ধর্ষ আরব বংশোদ্ভূত। যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনি অশিক্ষিত, সরল বিশ্বাসী, কুসংস্কারগ্রস্ত। তাদের সরল বিশ্বাস আর কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে একদল আরব মোল্লা বা পুরোহিত জাতীয় চতুর ব্যক্তি বিভিন্ন রকমের ভেল্‌কি ভোজবাজি দেখিয়ে নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে প্রতিপন্ন করে তাদের উপর বেশ গভীর এবং ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। আলজিরিয়ার অশিক্ষিত অন্ধবিশ্বাসী দুর্ধর্ষ আরবদের কাছে এদের কথা ছিলো বেদবাক্যের মতো, সেই সুযোগে এই মোল্লারা তাদের নানাভাবে উস্‌কানি দিয়ে ফরাসী সরকারের প্রতি বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন করে তুলতো। ক্রমে ক্রমে আলজিরিয়ার অধিবাসীদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগলো যে, ফরাসীরা কিছুতেই আর আলজিরিয়ায় তাদের আধিপত্য রক্ষা করতে পারবে না, ফুরিয়ে এসেছে তাদের ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির দিন। ফরাসী সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভীতির ভাব দ্রুতবেগে মুছে যেতে লাগলো তাদের মন থেকে। তারা ভাবলো তাদের এই মোল্লাদের যাদুবিদ্যার ক্ষমতা অদ্ভুত, অলৌকিক, অসম্ভবকে সম্ভব করা যে এদের কাছে ছেলেখেলা, তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেছে ভোজবাজির অনেক খেলায়; সুতরাং এরা যখন ফরাসী আধিপত্যের পতন আসন্ন বলে ঘোষণা করছে তখন সত্যিই তা আসন্ন। তা ছাড়া আর কিছু না হোক, এদের অলৌকিক যাদুর জোরেই ফরাসী সরকার হটে যাবে, বাপ বাপ বলে পালাতে পথ পাবে না।

আলজিরিয়ার ফরাসী শাসন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারের ভেতর আগামী মহা-

বিপদের নিশ্চিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেলেন। শঙ্কিত হলেন। শঙ্কা জানিয়ে খবর পাঠালেন খোদ ফরাসী সরকারের কাছে। ফরাসী সরকার গভীরভাবে ব্যাপারটি ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত করলেন পুলিশ, মিলিটারী বা গোলাগুলি দিয়ে এ জিনিসের মূল ওপড়ানো যাবে না, মূল ওপড়াবার সেরা এবং একমাত্র উপায় হচ্ছে ঐ চতুর ভেল্‌কিবাজ মোল্লাদের প্রভাব সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই ফরাসী সরকার আমন্ত্রণ জানালেন ফরাসী যাদু-গৌরব রবেয়ার উদ্যাকে। ইউরোপময় তখন তাঁর অসামান্য 'অলৌকিক' যাদুর অসাধারণ খ্যাতি।

এতদিন শুধু জনমনোরঞ্জনের জন্যই তিনি যাদুর খেলা দেখিয়ে এসেছেন। এবার যাদু দিয়ে রাজনৈতিক জগতে দেশকে সেবা করবার সুযোগ পেয়ে তিনি সানন্দে এ দায়িত্ব শিরোধার্য করে নিলেন। যাদু প্রদর্শনের সরঞ্জামাদি নিয়ে আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স শহরে উপস্থিত হলেন যাদুকর রবেয়ার উদ্যা ও সম্প্রদায়। সেখানকার সেরা থিয়েটার হলে শুরু হলো তাঁর যাদু প্রদর্শন। তামাশা দেখবার সুযোগ পেয়ে পুলকিত হলো সেখানকার আরব জনসাধারণ, কিন্তু তাদের নিজেদের মোল্লা-যাদুকরদের যাদুর তুলনায় এই সাদা যাদুকরের যাদু যে নিতান্তই ছেলেখেলা মাত্র হবে, সে বিষয়ে এদের কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে বলে মনে হলো না।

কিন্তু উদ্যা-র "হালকা আর ভারি বাক্স" (Light and heavy chest) খেলাটি দেখে সমবেত আরবদের মনে জাগলো বিস্ময় আতঙ্ক। খেলাটি এই: একটি ছোটো হালকা বাক্স মঞ্চের উপর রেখে একজন ভীমকায় পালোয়ান আরবকে উদ্যা বললেন, "দেখ তো এই বাক্সটা তুলতে পারো কিনা।" বলা বাহুল্য অনায়াসে বাক্সটা তুলে ফেললো সেই পালোয়ান লোকটা। তুলে আবার রেখে দিয়ে তাচ্ছিল্যভরে হাসলো একটু। সেই তাচ্ছিল্যের হাসির ছোঁয়াচ লাগলো সারা হলের আরবদের মুখে। উদ্যা তখন সেই আরব পালোয়ানটিকে বললেন, "এইবার আমি আমার যাদুর বলে তোমার দেহ থেকে শক্তি কেড়ে নিচ্ছি। ধীরে ধীরে তোমার শক্তি কমে যাচ্ছে। আচ্ছা এইবার চেষ্টা করে দেখ তো বাক্সটি তুলতে পারো কিনা।" আবার পরম তাচ্ছিল্যভরে সেই বাক্সের হাতলে হাত লাগালো সেই অসুরের মতো শক্তিশালী আরব। কিন্তু বাক্সটি তুলবার চেষ্টা করতে গিয়েই তার মুখের হাসি ঘুচে গেলো। দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলো সে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে। দেহের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠলো,

সারা দেহ কাঁপতে লাগল থর থর করে। কিন্তু বাক্সটা সে কিছুতেই তুলতে পারল না! এ কি অলৌকিক ব্যাপার! কলির এই ভীমকে কি যাদুর বলে শিশুর চাইতে দুর্বল বানিয়ে দিয়েছেন যাদুকর উদ্যাঁ, তার দেহ থেকে শক্তি শুষে নিয়ে? সমবেত দর্শকদের মুখ থেকেও হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, বৈদ্যুতিক চুম্বকের (electro magnet) প্রয়োগ। মঞ্চের নেপথ্যে উদ্যাঁর সহকারী উদ্যাঁর ইশারা অনুযায়ী বিদ্যুৎ তরঙ্গ চালু করে দিলেই বাক্সর তলার লোহা মঞ্চের ওপরে লোহার সঙ্গে বৈদ্যুতিক চুম্বকের আকর্ষণে আটকে থাকত, সে অবস্থায় (অর্থাৎ বিদ্যুৎ তরঙ্গ চালু থেকে বৈদ্যুতিক চুম্বকের আকর্ষণ যতক্ষণ বজায় থাকতো) মঞ্চ থেকে বাক্সটি তোলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পালোয়ানের পক্ষেও সম্ভব হতো না। নেপথ্যে সহকারী বিদ্যুৎ-তরঙ্গটি বন্ধ করে দিলেই বৈদ্যুতিক চুম্বকের আকর্ষণ আর থাকতো না, সুতরাং বাক্সটি অনায়াসে তোলা যেত। কিন্তু সে সময় (অর্থাৎ এখন থেকে একশো বছরেরও বেশি আগে) বিদ্যুৎশক্তি মাত্র নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে; ইউরোপেও তখন অল্প লোকই এই শক্তির খবর জানত। আলজিরিয়ার এই আরবরা তো এ ব্যাপারে ছিল একেবারে অজ্ঞ, সুতরাং তারা যে এ ব্যাপারটাকে ভুতুড়ে, অলৌকিক ভাববে, এতে বিস্ময়ের কি আছে? যাদুকর উদ্যাঁ শুধু যাদুর চর্চাই করতেন না, বিজ্ঞান চর্চাও করতেন, বিশেষ করে ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎতত্ত্বের। বিদ্যুতের কার্যকরী প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি মৌলিক আবিষ্কারের জন্য প্যারী (Paris) শহরের একটি প্রদর্শনীতে তিনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে একটি পদকও পেয়েছিলেন। যাদু-বিদ্যায় বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগে তিনিই বিশ্বের সর্বপ্রথম যাদুকর।

বাক্সটি তুলতে না পেরে সেই পালোয়ান আরবটি একবার হাল ছেড়ে দিয়ে তারপর মরিয়া হয়ে আবার চেষ্টা করতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উদ্যাঁর গোপন ইঙ্গিতে নেপথ্যের সহকারী এমনভাবে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চালালেন যে বিদ্যুতের শক খেয়ে লোকটা হঠাৎ অবসন্ন বোধ করল। তার দুটি হাঁটু বেঁকে গেলো আর কাঁপতে কাঁপতে সে বসে পড়তে বাধ্য হলো। নেপথ্য থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ হঠাৎ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতেই পেছন দিকে ছিটকে পড়ে গেল লোকটা। তারপর "ইয়াল্লা!" বলে চীৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল। জীবনে সে বুঝি কখনো এমন নাকাল হয়নি, এমন ভয় পায়নি।

আরবদের আরো যেসব খেলা উদ্যাঁ আলজিরিয়ায় দেখিয়েছিলেন, তাদের

সম্পূর্ণ ফিরিস্তি বা ফর্দ দেবার দরকার নেই, যে খেলাগুলো তাদের সবচেয়ে বেশী চমকে দিয়েছিল তাদের কথাই বলি। একটি খেলায় একজন আরবকে তিনি মঞ্চের ওপর ডেকে আনলেন। এনে বেতের তৈরি একটা বড়ো ঝুড়ি চাপা দিলেন তার ওপর। তারপর ঝুড়িটি তুলে নিতেই দেখা গেল জলজ্যান্ত লোকটা বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! ভুতুড়ে কাণ্ড দেখে কয়েকজন আরব দর্শক ভয়ে চীৎকার করতে করতে হল থেকে বেরিয়ে গেল, পাছে এই শ্বেতকায় যাদুকর বেতের ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে তাদেরও অমনি করে উড়িয়ে দেন। কিছুক্ষণ বাদে সেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া লোকটাকে আবার সশরীরে হাজির হতে দেখে সবাই দুচোখ কপালে তুলে বললে, "ইয়া আল্লা!"

বন্দুকের গুলি ধরার খেলাটা প্রথমে একটু নতুন ভাবে দেখালেন উদ্যাঁ। একটা চিহ্নিত গুলি ভরা হলো বন্দুকে। একটি ছুরির ফলা উঁচু করে তাতে একটি আপেল বিঁধিয়ে ধরে রইলেন যাদুকর উদ্যাঁ। বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হলো আপেলটিকে লক্ষ্য করে। গুলির ধাক্কায় নড়ে উঠলো আপেল, কেঁপে উঠল উদ্যাঁর হাত। ছুরি দিয়ে আপেলটি কেটে তার ভেতর থেকে তিনি বার করে দেখিয়ে দিলেন বন্দুক থেকে সদ্য ছোঁড়া সেই চিহ্নিত গুলিটি!

আলজিয়ার্স শহরটি সমুদ্র-উপকূলে। উপকূল পিছনে ফেলে উদ্যাঁ তাঁর যাদু প্রদর্শনী নিয়ে চলে গেলেন আলজিরিয়ার অভ্যন্তরে। সেখানে তিনি যাদুর খেলা দেখাচ্ছেন, এমন সময় একজন আরব এগিয়ে এসে বললে, "আপনি তো মস্ত যাদুকর। আমার নিজের পিস্তল দিয়ে আমাকে নিজের হাতে আপনার ওপর গুলি চালাতে দিতে পারেন?"

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে জান বিপন্ন হবে বটে, কিন্তু গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলে সঙ্গে সঙ্গে মান যাবে; শুধু নিজের মান নয়, ফরাসী জাতির। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আলজিরিয়ায় এসেছেন, তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং জান বিপন্ন করেও তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। বললেন, "পারি, এবং দেবো। কিন্তু তার আগে আমার সহায়ক শক্তির আবাহন করে নিতে হবে। কাল রাত্রে তোমাকে আমি সুযোগ দেবো।"

পরদিন ভোরবেলা উদ্যাঁ এই বিপদসংকুল দুরূহ পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। মোম এবং ভুসা (lamp black) মিশিয়ে তাই দিয়ে পিস্তলের এক-জোড়া নকল টোটা তৈরি করলেন তিনি। বাল্যকাল থেকেই যন্ত্রপাতির কাজে আর বিভিন্ন জিনিস তৈরিতে অসামান্য দক্ষতা ছিল তাঁর। টোটা দুটি প্রায়

হুবহু আসল টোটার মতো হলো। একটি টোটার বহিরাবরণ জমে শক্ত হতেই তাতে একটি ফুটো করে ভেতরের মোম বার করে ফেলে সেই ফাঁপার ভেতর খানিকটা রক্ত পুরে দিয়ে মুখটা আবার বুজিয়ে দিলেন।

পরের রাত্রিতে যাদু প্রদর্শনের সময় সেই সন্দেহগ্রস্ত আরব লোকটির হাতে একটি ছোটো প্লেটে কতকগুলো পিস্তলের টোটা দিয়ে বললেন, "পরীক্ষা করে দেখো এগুলো সত্যি সত্যি সীসার তৈরি কিনা।"

লোকটি টোটাগুলো পরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের পিস্তলটা দিল যাদুকর উদ্যাঁর হাতে। প্লেট থেকে একটি টোটা নিয়ে সেটিকে ঐ পিস্তলে পুরে তাতে বারুদ ঠেসে ঐ আরব লোকটির হাতে দিলেন যাদুকর। টোটাটি তিনি যখন পিস্তলে পুরে দিচ্ছিলেন, তখন কড়া নজরে তার হাতের দিকে তাকিয়েছিল লোকটা। একটু কেঁপে উঠেছিল যাদুকরের বুক, কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য। তাঁর দক্ষ হাতের কৌশলে আগে থেকে হাতে লুকিয়ে রাখা একটি নকল টোটা (যার ভেতরে রক্ত নেই) চলে গেল পিস্তলের ভেতর, আসল টোটাটি লুকিয়ে রইল তার হাতে। অভ্যস্ত পাকা হাতে লুকানো টোটা ধরা পড়লো না আরব লোকটির চোখে।

পেছনদিকে কিছুদূর গিয়ে বুকের ওপর দু হাত আড়াআড়িভাবে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন যাদুকর উদ্যাঁ। বললেন, "চালাও গুলি।"

লোকটা টিপে দিল পিস্তলের ঘোড়া। 'গুড়ুম' আওয়াজও শোনা গেল। কিন্তু একি? এতটুকু টললেন না তো যাদুকর! দেখা গেল দুই দাঁতের ফাঁকে তিনি সদ্য-নিক্ষিপ্ত টোটাটি ধরে ফেলেছেন! পিস্তল যে ছুঁড়েছিল সে নিজেই এসে উদ্যাঁর দাঁত থেকে টোটাটি নিয়ে দেখল সত্যিই এ তার পরীক্ষিত সীসার টোটা। (বোধকরি বলে দিতে হবে না সবার অলক্ষ্যে এক ফাঁকে হাতের টোটাটি মুখের ভেতর নিয়ে নিয়েছিলেন উদ্যাঁ, এবং আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে টেনে এনে দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছিলেন।)

যাদুকর বললেন, "কি আশ্চর্য! জলজ্যান্ত মানুষের গায়ে গুলি চালিয়েও এক ফোঁটা রক্ত বার করতে পারলে না? এই দেখো আমি গুলি মেরে ঐ দেয়ালের গা থেকে রক্ত বার করছি।"

বলে লোকটির হাত থেকে পিস্তলটি নিয়ে তাতে নতুন করে আর একটি টোটা ভরলেন তিনি। (বলা বাহুল্য, রক্ত-পোরা দু নম্বর নকল টোটাটি এবার ভরে দেওয়া হলো পিস্তলে।) দেয়ালের সামনে গিয়ে পিস্তল ছুড়লেন উদ্যাঁ, সঙ্গে

সঙ্গে দেয়ালের গায়ে রক্তের ছোপ পড়ল। আরবরা ভিড় করলো দেয়ালের কাছে। দেয়ালে হাত দিয়ে দেখল সত্যিকারের রক্ত!

এতক্ষণ যা ছিল বিস্ময়, সীমা ছাড়িয়ে তাই গভীর ভীতিতে পরিণত হলো। এবার আরবদের মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে যাদুবিদ্যায় এই ফরাসী যাদুকরের কাছে তাদের যাদুকরেরা নিতান্তই শিশু।

যাদুকর উদ্যাঁর মন ভরে উঠল আনন্দে। আলজিরিয়ার মোল্লা-যাদুকরের দুরন্ত সর্বনাশা প্রভাবের ভিৎ নড়িয়ে দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এখানেই থেমে গেলে চলবে না, আর একটু এগোনো দরকার। তিনি আরবদের বুঝিয়ে দিলেন, "এতদিন ধরে তোমাদের আপন যাদুকরদের ভোজবাজির ফাঁকিকে ফাঁকি বলে ধরতে না পেরে অলৌকিক ব্যাপার বলে তোমরা ভুল করে এসেছ। আমার খেলাগুলোও তেমনি একটিও অলৌকিক নয়। সবগুলোই লৌকিক কৌশলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

যাদুকর উদ্যাঁ তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বে এবং নিপুণ নিখুঁত যাদু প্রদর্শনে আলজিরিয়ার আরবদের ওপর কি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার কিছুটা আভাস দেবার জন্য তাঁদের দেওয়া বিদায়-অভিনন্দনপত্রের আংশিক ভাবানুবাদ নীচে দিচ্ছি :

"জয় হোক আল্লার!"

"যিনি অজানাকে জানান, যাঁর মেহেরবানিতে আমরা হরফের পর হরফ সাজিয়ে মনের ভেতরকার সুন্দর ফুলগুলোকে বাইরে ফোটাতে পারি।"

"বজ্র-বিদ্যুতের মধ্য দিয়ে স্নিগ্ধ, ভূমি-উর্বর-করা বৃষ্টিধারার মতো, উদার বিধাতা আমাদের ভেতর পাঠিয়েছেন এ যুগের পরম বিস্ময়, বিস্ময়-উৎপাদনের শিল্পে ও বিজ্ঞানে অসামান্য সুপণ্ডিত মহামন্তি রবেয়ার উদ্যাঁ-কে।"

"আমাদের এই শতাব্দীতে তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই। অতীতের সমস্ত বিস্ময় তাঁর সৃষ্ট বিস্ময়ের তুলনায় ম্লান। আমাদের যুগ তাঁকে আপন বলতে পেরে ধন্য হয়েছে।

"তিনি জয় করেছেন আমাদের হৃদয়। তাঁর বিস্ময়কর বিজ্ঞানের রহস্যময় খেলা দেখিয়ে তিনি অভিভূত করেছেন আমাদের মন। চোখের সামনে এত রকমের অসম্ভব সম্ভব হতে আমরা আর কখনো দেখি নি। তাঁর বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি আমাদের যেসব অপূর্ব বিস্ময় দেখিয়ে গেলেন, সেজন্য আমরা চিরদিন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।...

"তাঁর উপযুক্ত প্রশংসা করবার ভাষা নেই! বৃষ্টি যতদিন ভূমিকে উর্বর করবে, রাত্রি যতদিন চাঁদের আলোয় আলোকিত হবে, যতদিন সূর্যের আলোর দুঃসহ তীব্রতা হ্রাস করবে মেঘমালা, ততদিন তাঁর প্রতি পরম শ্রদ্ধায় আমাদের চিত্ত বিস্ময়ে অবনত থাকবে।"

কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার ইতিহাসে স্মরণীয় বছর, ইংলণ্ডের আনুগত্য থেকে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার বছর, যা থেকে শুরু হয়েছে স্বাধীন মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস। এই বছরে ইংলণ্ডের রাজধানীতে আবির্ভূত হলেন এক অসাধারণ রহস্যময় দম্পতি—অসুন্দর স্থূলকায় কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো (Count Cagliostro) এবং তাঁর সুন্দরী তন্বী তরুণী পত্নী সেরাফিনা।

লণ্ডনের সেরা অভিজাত পান্থশালায় মহা জমকালো বিরাট জুড়ি গাড়িতে চড়ে এলেন পত্নীসহ কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো। গাড়োয়ানের সাজ-পোশাক জাঁক-জমকেও চোখে চমক লাগে; গাড়ির আগে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে হুকুম-বরদার ভৃত্যদের জাঁকও কিছু কম নয়।

অত্যন্ত গম্ভীর, স্বল্পবাক, নেপথ্য-বিলাসী এই নবাগত অতিথি ক্যালিওস্ট্রো। তাঁকে ঘিরে যেন এক অলৌকিক রহস্যের আবহাওয়া, তিনি যেন এ জগতের মানুষ নন, এসেছেন অন্য কোনো জগৎ থেকে। তেমনি রহস্যময়ী তাঁর সঙ্গিনী সেরাফিনা, মুখে তাঁর মোনালিসার হাসির চাইতেও রহস্যময় মৃদু হাসি, দুচোখে তাঁর বহু দূরের স্বপ্নময় ইঙ্গিত, পরীর মতো হাল্‌কা যেন তাঁর পদক্ষেপ।

এই দুজনের আগমনে বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটল সে অঞ্চলের মানসিক আবহাওয়ায়; বাসিন্দারা তাঁদের স্নায়ুতে অনুভব করলেন এক বিচিত্র, অবর্ণনীয় এবং কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর শিহরণ। কারা এই দুজন? এসেছেন কোথা থেকে, এবং কেন? এঁদের চলাফেরা হাবভাব সব কিছুতেই রহস্য জড়ানো। বাইরের জগৎ থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখার আভিজাত্য এঁদের; কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তো দূরের কথা, পরিচিত হবারও বিন্দুমাত্র আগ্রহ এঁদের দেখা যাচ্ছে না। পান্থশালার অন্যান্য অতিথিরাও বড় একটা এঁদের দর্শন পাবার সুযোগ লাভ করেন না। এঁদের আহার্যও সম্পূর্ণ আলাদাভাবে, কাউণ্টের বিচিত্র নির্দেশ অনুযায়ী বিশেষভাবে তৈরি করে এঁদের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এঁদের খানা পাকানোর পদ্ধতিতেই যে শুধু বিশেষত্ব তা নয়, কাউণ্টেরই নির্দেশমতো কিছু কিছু অদ্ভুত দ্রব্যও তাতে মেশানো হয়। পান্থশালার মুগ্ধ মালিক সদাই তটস্থ পাছে এই অসাধারণ দম্পতির এতটুকুও অসুবিধা ঘটে; এমন দরাজ হস্ত, দিল-

দরিয়া, অভিজাত, রহস্যময় অতিথি তিনি জীবনে আর কখনো পান নি। অর্থ দিয়ে এই কাউণ্ট যেভাবে ছিনিমিনি খেলেন, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না যে তিনি অসাধারণ ঐশ্বর্যবান।

কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো এবং তাঁর পত্নী সেরাফিনা সম্বন্ধে অসীম কৌতুহল শুরু হলো চারধারে, শুরু হলো তাঁদের নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা। এই রহস্যময় দম্পতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় যখন দেখা গেলো খুব সুলভ নয়, তখন অদম্য কৌতূহল মেটাবার জন্য অনেকে শরণ নিলেন কাউণ্টের ভৃত্যদের। ভৃত্যদের মুখে যা শোনা গেল তাতে রহস্য বরং আরো বেড়ে গেল, বহু মনে জাগাল ভীতি-পূর্ণ শ্রদ্ধা অথবা শ্রদ্ধাপূর্ণ ভীতি। প্রভু এবং প্রভুপত্নী সম্পর্কে ভৃত্যেরা সবাই একমত: এঁরা অসাধারণ ঐশ্বর্যবান, অসাধারণ দিলদরিয়া, অসাধারণ রহস্যময়, এবং এঁরা দুজনেই, বিশেষ করে কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো, অলৌকিক শক্তির অধিকারী অতুলনীয় যাদুকর।

সেরাফিনা পূর্ণযৌবনা সুন্দরী, তাঁর বয়স তখন সবেমাত্র কুড়ি বছর হয়েছে, কিন্তু রটে গেল (অর্থাৎ সূক্ষ্ম কৌশলে রটানো হলো) তাঁর বয়স ষাট বছর ছাড়িয়ে গেছে। আশ্চর্য! কি করে এই স্থির যৌবন সম্ভব হলো? ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেলো (অর্থাৎ কায়দা করে ক্যালিওস্ট্রোই প্রকাশ করালেন) এই স্থির যৌবনের উৎস হচ্ছে যাদুকর ক্যালিওস্ট্রোর আপন হাতে প্রস্তুত করা সঞ্জীবনী রসায়ন—"মিশরী মদ"; এ রসায়ন প্রস্তুতের প্রকরণ কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো বহু সাধনায় বহু অন্বেষণ আর গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন মিশরের প্রাচীন গুপ্ত রহস্যের ভাণ্ডার থেকে, এ কথাও প্রচারিত হয়ে গেল। এই রহস্যময় সঞ্জীবনী রসায়নের অসীম ক্ষমতা যৌবন প্রলম্বিত এবং বার্ধক্য বিলম্বিত করে আয়ু বৃদ্ধি করবার, মৃত্যুকে পিছিয়ে দেবার, হারানো যৌবন ফিরিয়ে আনবার।

আরেকটি চমকপ্রদ সংবাদ রটল ক্যালিওস্ট্রো সম্বন্ধে—তাঁর কাছে এমন দ্রব্য আছে, যার সাহায্যে কয়েকটি গোপন প্রক্রিয়া দ্বারা তিনি যে-কোনো সস্তা ধাতুকে সোনায় পরিণত করে দিতে পারেন। এই বিদ্যা বা প্রক্রিয়ার নামই 'অ্যালকেমি' (Alchemy)।

যেমন রটে গিয়েছিল, শ্রীমতী সেরাফিনাকে প্রায় নবযৌবনার মতো দেখালেও তিনি ষাট বছরের বুড়ি, অথবা তিনি বয়সে ষাট হলেও দেখতে যুবতী, তেমনি এও রটে গিয়েছিল যে, এই রহস্যময় কাউণ্টকে দেখে তাঁর খুব বেশী বয়স মনে না হলেও তিনি বহুকালের বুড়ো, তাঁর বয়সের গাছপাথর নেই। নানা-

রকম উদ্ভট সৃষ্টি-ছাড়া অনুমান বা গবেষণা চলছিলো তাঁর বয়স সম্বন্ধে। প্রত্যক্ষ-ভাবে নয় (বলাই বাহুল্য), পরোক্ষভাবে নিজের সম্পর্কে এই নানারকম উদ্ভট কল্পনাকে উস্‌কে তুলতে সদা যত্নবান ছিলেন কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো। মুখে মুখে অতিরঞ্জিত হতে হতে নানারকম গাঁজাখুরী কিম্বদন্তী প্রচারিত হয়েছিল তাঁর সম্বন্ধে। যেমন, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এবং জুলিয়াস সীজারকে নিজের চোখে দেখেছেন ক্যালিওস্ট্রো ; দেখেছেন রোম শহর আগুনে পুড়ে ছাই হবার দৃশ্য দেখতে দেখতে পরম পুলকে বেহালা বাজাচ্ছেন রোম-সম্রাট নিরো ; এমন কি, যীশু খ্রীষ্টকে যখন ক্রুশ-বিদ্ধ করা হচ্ছিল, তখন ক্যালিওস্ট্রোও ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে একজন !

মানুষ চায় নিজের যৌবন প্রলম্বিত করতে, ফিরে পেতে চায় হারানো যৌবন, চায় অনেক দিন বেঁচে থাকতে। সোনার প্রতি মানুষের আকর্ষণও প্রচণ্ড। আর মানুষ যা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে তাই বিশ্বাস করতে তার ইচ্ছা হয়, আর এই ইচ্ছাই প্রবল হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে পরিণত হয়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম দক্ষতার সঙ্গে মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন সারা বিশ্বের অন্যতম সেরা ধাপ্পা-কৌশলী কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো। অনেকের মতে ধাপ্পা-জগতের ইতিহাসে তিনি এখন পর্যন্ত অপরাজিত শিল্পী। পৃথিবীর যাদু-চর্চার ইতিহাসেও ক্যালিওস্ট্রোর নাম চিরস্মরণীয়।

কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো কিন্তু আসলে কাউণ্টও ছিলেন না, ক্যালিওস্ট্রোও নয়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল জোসেফ (বা 'জিউসেপ্পি') বল্‌সামো, ডাক নাম ছিল 'বেপ্পো'। তিনি জন্মেছিলেন খৃষ্টীয় ১৭৪৩ সালে, সিসিলি দ্বীপের প্যালার্মো শহরে এক নিতান্ত গরীব পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সাধারণ দোকান-দার। দুষ্টু ছেলে বেপ্পোর নানারকম উৎপাতে পাড়ার লোক অস্থির, শহরের লোক অস্থির। বেপ্পোর যেমন ষণ্ডা চেহারা, তেমনি সে বেপরোয়া ডানপিটে, বিবেকের কোনো বালাই তার নেই।

বারো বছর বয়সে বেপ্পোকে এক স্কুলে পাঠানো হলো বিদ্যাচর্চার জন্য। সেখানে গুরুমশাইদের সঙ্গে বেপ্পোর ব্যক্তিগত সম্পর্কটা তেমন প্রীতিপূর্ণ হলো না, তাঁদের হাতের প্রচুর কানমলা খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে তিনি পালালেন সেই স্কুল থেকে। তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। মায়ের উদ্যোগে তিনি ভর্তি হলেন এক মঠে। মার বিশ্বাস মঠের সাধু-সন্ন্যাসীদের শিক্ষাধীনে কিছুদিন থাকলে ছেলের স্বভাবচরিত্র শোধরাবে। কিছুদিন বাদে বেপ্পো হবেন মঠের চিকিৎসকের সহ-

কারী; তাঁর কাজ হলো ওষুধের শিশি বোতল ধুয়ে সাফ করা, ওষুধের গাছ-গাছড়া লতাপাতা সংগ্রহ করা, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। এসব কাজের সঙ্গে সঙ্গে বেপ্পো এই চিকিৎসকের কাছে কিছু কিছু চিকিৎসা-বিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রের কিছু কিছু জ্ঞানও আয়ত্ত করে নিতে লাগলেন। শিষ্যের শিখবার অসামান্য আগ্রহ আর আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে এই চিকিৎসক গুরুটি খুশী হলেন তাঁর ওপর। মাঝে মাঝে বেপ্পোর ওপর আরেকটি কাজ চাপতো—তিনি আহারের সময়ে সাধু-মহাপুরুষদের অলৌকিক জীবনকাহিনী মোটা মোটা গ্রন্থ থেকে পড়ে শোনাতেন মঠের সাধুদের। এই 'মহাপুরুষ'দের অলৌকিক ক্ষমতার নানা কাহিনী পড়ে শোনাতে শোনাতে বেপ্পো বল্‌সামোর কল্পনাপ্রবণ মন ভরে উঠল নানা রকমের মতলবে আর রঙীন স্বপ্নে: ঐ রকম 'অলৌকিক' শক্তির নমুনা দেখিয়ে তিনিও কি লাভ করতে পারবেন না প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, অর্থ, সম্মান?

মঠের একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে একদিন বেপ্পো যে দুষ্টুমি কাণ্ড করলেন, তাতে তিনি মঠ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। জালিয়াতিতে তাঁর হাতটি ছিল পাকা। মঠ থেকে বেরিয়েই তিনি নানা মক্কেলের হয়ে দলিল এবং দস্তখত ইত্যাদি জাল করে দিয়ে, এবং আরো নানা ধরনের চতুর অসদুপায়ে অনায়াসেই অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন।

একবার মারানো (Marano) নামে এক স্বর্ণকারের গভীর আস্থা অর্জন করে তিনি তাঁকে বোঝালেন সমুদ্রতীরের কাছাকাছি এক পাহাড়ের গুহার ভেতর মাটির তলায় রয়েছে বহুমূল্য গুপ্তধন। এই গুপ্তধনের সন্ধান দেবার বিনিময়ে মারানোর কাছ থেকে বেপ্পো কিছু পরিমাণ সোনা আগাম দক্ষিণা নিয়ে নিলেন। বেপ্পোর নির্দেশমতো মারানো কোদাল আর গাঁইতি নিয়ে সেই গোপন গুহায় মধ্যরাত্রে গেলেন বেপ্পোর সঙ্গে, উদ্দেশ্য—ঐ গুপ্তধন খুঁড়ে বার করা। বেপ্পো রহস্যময় ভঙ্গীতে বেশ গুরুগম্ভীর ভাবে মাটির ওপর ফস্‌ফোরাসের সাহায্যে যাদুচক্র আঁকলেন: ফস্‌ফোরাসে আঁকা বৃত্তটি জ্বলজ্বল করতে লাগলো মধ্যরাত্রির ঝাপসা অন্ধকারে। বেপ্পো তারপর অদ্ভুত দুর্বোধ্য ভাষায় নানারকম মন্ত্র পড়ে মারানোকে বললেন ঐ যাদু-বৃত্তের ভেতর খনন-কার্য শুরু করতে। কাজ শুরু করলেন মারানো। আনন্দে তাঁর হৃদয় ভরপুর, আজ বহুমূল্য গুপ্তধনের অধিকারী হবেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ একি? বিকট চীৎকারে আতঙ্ক জাগিয়ে যেন শয়তানেরই চেলা-চামুণ্ডারা একসঙ্গে চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কীল-ঘুঁষি চালিয়ে নাস্তানাবুদ করে তুলল স্বর্ণকার মারানোকে। সেদিন গুপ্তধন পাওয়া

তো দূরে থাক, মার খেয়ে চোখ মুখ ফুলিয়ে আর ছেঁড়া জামা নিয়ে কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন মারানো। তাঁর সঙ্গে টাকা-কড়ি যা কিছু ছিল তা কেড়ে রেখে দিয়েছিল ঐ শয়তানের অনুচরগুলোই। মারানো টের পেলেন ওরা যে শয়তানের চেলা, সে শয়তান স্বয়ং বেপ্পো ; বেপ্পোরই ধাপ্পায় ভুলে তিনি বিশ্রী রকম বোকা বনেছেন। ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—এই প্রতারণা, অপমান আর প্রহারের উপযুক্ত প্রতিশোধ তিনি নেবেনই। আইনের সাহায্য নিতে গেলে নিজের বোকামিই প্রকাশ হয়ে পড়বে, বেপ্পোকেও তেমন কিছু জব্দ করা যাবে না, তাই ধনী স্বর্ণকার মারানো স্থির করলেন যে, ভাড়াটে ঘাতক দিয়ে তাকে হত্যা করিয়ে গুম করে ফেলবেন। মারানোর প্রতিশোধ এড়াবার জন্য বেপ্পো প্যালার্মো শহর ছেড়ে গোপনে পালিয়ে গেলেন।

প্যালার্মো থেকে পালাবার পর থেকেই শুরু হলো তাঁর নানা দেশে ভ্রমণ : গ্রীস, মিশর, আরব, পারস্য, রোডস দ্বীপ, মালটা, নেপলস্, ভেনিস, রোম। নিজেকে ঘিরে একটা অদ্ভুত রহস্যগম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি করে রাখা আর কাহিনী বানাবার আশ্চর্য ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সর্বত্রই তিনি ধাপ্পার জোরে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। লোক ঠকিয়ে প্রচুর পয়সা কামাতে তাঁকে কখনোই খুব বেশি বেগ পেতে হয় নি, এমনি আশ্চর্য ছিল তাঁর ধাপ্পা-প্রতিভা এবং অভিনয়-ক্ষমতা। রোম নগরীতে এসে তাঁর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। তিনি বিবাহ করলেন লোরেন্‌জা ফেলিশিয়ানি নাম্নী এক সুন্দরী দর্জি-কন্যাকে। শিবের সঙ্গে শক্তির মিলন হলো যেন। সামান্য এক দর্জির মেয়ে হলেও লোরেন্‌জার রক্তে ছিল অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, চিত্তে ছিল রোম্যান্টিক কল্পনা আর উচ্চাশা। তিনি বুঝলেন এই লোকটিই হবেন তাঁর যোগ্য জীবন-সঙ্গী ; এঁর ভেতর যে মাল-মশলা আছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারলে জীবনের অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এঁর সহযোগিতায় পূর্ণ করে নেওয়া যাবে।

দক্ষ পরিচালিকার হাতে পড়ে এক আলাদা রূপ পেলেন বেপ্পো বল্‌সামো। নিজের ভ্রাম্যমাণ জীবনের যে সব আষাঢ়ে গল্প অম্লান বদনে বলে যেতেন নির্লজ্জ মুখর বেপ্পো, তারই মধ্যে লোরেন্‌জা পেলেন অসামান্য কল্পনাশক্তির পরিচয়। বেপ্পোর আত্মম্ভরিতায় তিনি দেখলেন অসামান্য আত্মবিশ্বাস আর আত্মনির্ভর। তাঁর অসুন্দর বিপুল দেহভারে দেখলেন ওজনদার ব্যক্তিত্ব। সৃজনী কল্পনার চোখে লোরেন্‌জা দেখলেন তাঁর বিধাতা-প্রেরিত এই জীবন-সঙ্গীটির ভবিষ্যৎ রূপ। দেখে পুলকিত হলেন। খুব সম্ভব বেপ্পো বল্‌সামোর অসামান্য ভবিষ্যৎ-

সম্ভাবনা এক লহমায় দেখে নেবার মতো দূরদৃষ্টি লোরেন্‌জার ছিল বলেই তিনি সানন্দে বরমাল্য পরিয়েছিলেন বেপ্পোর স্থুল কণ্ঠে। নইলে লোরেন্‌জার মতো সুন্দরীর বেপ্পো বল্‌সামোর মতো অসুন্দরের প্রেমে পড়বার অন্য কোনো কারণ ছিল না।

তালিম দিয়ে দিয়ে স্বামী বেপ্পোর বদ্‌গুণগুলোকে সদ্‌গুণে পরিণত করতে লাগলেন লোরেন্‌জা। স্থুল হাবভাব আর স্বভাবগুলোকে মার্জিত করে তুললেন যথাসম্ভব, অগোছালো আবোল তাবোল মিথ্যাভাষণগুলোকে বেশ করে গুছিয়ে একটি সুসম্বদ্ধ কাহিনীতে পরিণত করে দিয়ে, সেই কাহিনীটিতেই অভ্যস্ত করে তুললেন বেপ্পোকে। সমাজের উঁচুমহলে মেলামেশা করবার উপযুক্ত আদব-কায়দা-দুরস্ত হয়ে উঠতে লাগলেন বেপ্পো বল্‌সামো—তাঁকে তালিম দিতে লাগলেন তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষিনী জীবনসঙ্গিনী লোরেন্‌জা ফেলিশিয়ানি।

তালিম ও প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে পর বেপ্পো বল্‌সামো হলেন 'কাউণ্ট ক্যালিওস্ত্রো'। লোরেন্‌জা ফেলিশিয়ানি হলেন 'সেরাফিনা'। তারপর শুরু হলো তাঁদের যুগ্ম ধাপ্পা-অভিযান, নিপুণ অভিনয়ে, অসাধারণ পরিকল্পনায়, বে-পরোয়া দুঃসাহসিকতায় এবং দীর্ঘ সাফল্যে পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা বিরল। জমকালো চারঘোড়ায় টানা গাড়িতে—সঙ্গে এক ঝাঁক জাঁকালো উর্দিপরা ভৃত্য নিয়ে ইউরোপের নানা জায়গায় ভ্রমণ করতে লাগলেন পত্নী 'সেরাফিনা' সহ 'কাউণ্ট ক্যালিওস্ত্রো'। যেখানে যেতে লাগলেন সেখানেই অর্থ ছড়াতে লাগলেন দরাজ হাতে, বহুজনের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। চারিদিকে খ্যাতি ছড়িয়ে গেল—রহস্যময়, রাশভারি, অমিত ঐশ্বর্যবান, দিল-দরিয়া কাউণ্ট-ক্যালিও-স্ত্রোর। অকাতরে দান, দরিদ্রনারায়ণের প্রতি তাঁর অপরিসীম করুণা এবং ধনী হোমরা-চোমরাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম অবজ্ঞা এবং অশ্রদ্ধা অসংখ্য হৃদয়ে তাঁকে অসামান্য শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে দিলো।

কাউণ্ট ক্যালিওস্ত্রোর শ্রীমুখ-নিঃসৃত অসংখ্য আষাঢ়ে ধাপ্পা অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক গোগ্রাসে গিলেছিল ভেবে বিস্ময়ে আত্মহারা হবার কারণ নেই, কেন না, এই বিংশ শতাব্দীতেও বহু ধাপ্পা বহু শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে, এবং সে সব ধাপ্পাকে বেদ-বাক্য বলে মেনে নেবার মতো লোকেরও অভাব হচ্ছে না। দুনিয়ার উজবুকের অভাব কোনোদিন হয় না বলেই বুজরুক ধাপ্পাবাজেরও কোনো-দিন অভাব হয় না।

'অলৌকিক' প্রতারক ক্যালিওস্ত্রো যে যুগে তাঁর বুজরুকি দিয়ে বিরাট

পসার জমিয়েছিলেন, সেই খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল যুক্তির যুগ, বুদ্ধির যুগ, মগজের যুগ, যাকে ইংরেজীতে বলা হয়েছে 'এজ অভ রীজন্' (Age of Reason)। হৃদয়বৃত্তির চাইতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য বেশি ছিল বলেই সে যুগের সাহিত্যে কাব্যের চাইতে গদ্যেরই বিকাশ বেশী হয়েছিলো। কিন্তু বিশ্ব সম্বন্ধে বুদ্ধির মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান যখন বৃদ্ধি পেলো, তখন এই বিরাট বিশ্বে আপন তুচ্ছতা উপলব্ধি করে মানুষের হতাশা, ভীতি এবং অসহায়তাবোধও বাড়লো, যা থেকে আমাদেব মন চাইলো মুক্তি। আমাদের মন স্বাভাবিকভাবেই সান্ত্বনা খুঁজলো অলৌকিকরহস্যে, যা সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। নির্মম সত্য বা বাস্তব থেকে মানুষ চাইলো রহস্যের রাজ্যে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে, মুক্তি পেতে চাইলো অমোঘ নিয়মের নিগড় থেকে। 'মানুষের স্বভাবই এই। তাই তো যে যুগের ফরাসী দেশে দেখি ভোল-তেয়ারের মতো নির্মম বাস্তববাদী লেখক, সে যুগের ফরাসী দেশেই বহু রূপকথারও সৃষ্টি হয়েছিল। ডারউইনের (Darwin) বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ যে যুগে প্রকাশিত হয়েছিল সে যুগেই রচিত হয়েছিল লিউইস ক্যারল-এর আযাঢ়ে রূপকথা 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'। রূঢ় বাস্তব আর নানা নিয়মের নিগড় থেকে মুক্তির কামনা বা 'পলায়নী মনোবৃত্তি' গড়ে উঠেছিল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রূপেই।

রূঢ় অপ্রিয় বাস্তবের আওতা থেকে পলায়নের বিভিন্ন রকমের পথ আছে। আছে নানা রকমের দ্রব্যগুণ, আছে তথাকথিত ধর্ম বা অধ্যাত্মবিলাস, মনো-জগতের সূক্ষ্ম আফিম : আছে এক দিকে সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য আর অন্যদিকে নৈতিক জাহান্নামের পথ। আর আছে যাদু, যা জব্দ করে বিধাতাকে, বাতিল করে দেয় প্রকৃতির নিয়মাবলী ; যার মন্ত্রবলে দৈবকে পরাভূত করতে চায় মানুষ। এই যাদুর ক্ষেত্রকেই নিজেদের কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নিলেন অসাধারণ দম্পতি ক্যালিওস্ট্রো-সেরাফিনা।

সেরাফিনাই তালিম দিয়ে দিয়ে তাঁর স্বামীটিকে শিখিয়েছিলেন তাঁর প্যালার্মো শহরের জীবন একেবারে ভুলে যেতে। ঠিক হলো তিনি এখন থেকে বিশ্বাস করবেন তিনি কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী ট্রেবিজণ্ডরাজ্যের শেষ নৃপতির হতভাগ্য পুত্র, সেই রাজ্যের পতনের পর পালাবার পথে দস্যুদের হাতে ধরা পড়ে তিনি মক্কা শহরের বাজারে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হন। সহৃদয় প্রভুর কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ভ্রমণ শুরু করেন, এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দরবেশ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে সামান্য ধাতুকে সোনায় পরিণত করার রহস্যময় বিদ্যা আয়ত্ত

করেন। দামাস্কাস শহরে বহু প্রাচীন গুপ্তবিদ্যার ভাণ্ডারী মহাগুরু আলমোটাসের কাছ থেকেও নানা গুপ্তবিদ্যার গভীর জ্ঞান তিনি লাভ করেন। সেরাফিনার নির্দেশে এই কাহিনী মনে মনে বার বার আওড়াতে আওড়াতে ক্যালিওস্ট্রো এই বানানো কাহিনীকেই সত্য বলে কল্পনা করতে লাগলেন, অভিনেতা যেমন করে তাঁর অভিনীত ভূমিকা চরিত্রের ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

সেরাফিনাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে পাবার আগে বেপ্পো-র কাজ ছিল শাঁসালো শিকারদের মাথায় কাঁটাল ভেঙে বেশ কিছু দাঁও মেরেই তাদের নাগালের বাইরে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেরাফিনার হাতে পড়ে যখন তিনি হলেন মহা রহস্যময় অলৌকিক গুপ্তবিদ্যার ভাণ্ডারী কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো, তখন তাঁর কর্মধারা গেলো একেবারে বদলে। তখন আর পলায়ন নয়, তখন লক্ষ্য হলো অলৌকিক মহাজ্ঞানের ভাঁওতা দিয়ে মুগ্ধ অন্ধ ভক্ত শিষ্যের দল তৈরি করা এবং কায়েমিভাবে তাদের দলভুক্ত করে রাখা। তারা যেন এমন এক গুপ্ত মহা-সম্প্রদায়ের দীক্ষিত সদস্য, যার প্রধান পুরোহিত মিশরী গুপ্তমহাবিদ্যার মহাবিদ্বান ক্যালিওস্ট্রো, এবং মহানেত্রী সেরাফিনা।

ক্যালিওস্ট্রোর আবাসে যে আধ-অন্ধকার ঘরে অলৌকিক চক্র-বৈঠক বসত, তার দরজায় লেখা থাকত :

সাহস রাখো !

নীরব থাকো ! ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করো !

চক্র-বৈঠকে যাকে তাকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হতো না, কারণ এ সব অলৌকিক ব্যাপারে অধিকারী ভেদ আছে, অবিশ্বাসীর স্থান নেই। যাঁরা অধিকার পেতেন তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতেন—এ অধিকার পাবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ক্যালিওস্ট্রোর ভৃত্যদের খোসামোদ করে তাদের গুপ্ত সাহায্য নিতে হতো, এবং সেজন্য তাদের কিছু ঘুষও দিতে হতো।—

যে ঘরে চক্র-বৈঠক বসত তার ছাদ, মেঝে এবং চার দেয়াল থাকত কালো কাপড়ে ঢাকা, সেই কাপড়ের বুকে সাদা সুতোয় নানারকম সাপের নক্সা আঁকা। প্রদীপ জ্বলতো মৃদু, রহস্যময়। একটা বেদীর ওপর কয়েকটি নরকঙ্কাল। দু'পাশে গুপ্তবিদ্যাবিষয়ক পুঁথির স্তূপ। অনুভূতিপ্রবণ, সহজবিশ্বাসী মানুষের মনে এই ধরনের গা ছমছম করানো পরিবেশ এবং আবহাওয়ার প্রভাবের কথা ভালোই জানা ছিল মানব চরিত্রে অভিজ্ঞ মহাধূর্ত এবং মহা অভিনেতা কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রোর। অদ্ভুত, জমকালো, বীভৎস নানারকম অনুষ্ঠান দিয়ে তিনি এই

আবহাওয়াকে আরো রহস্যময় করে তুলতেন। লৌকিক যাদুবিদ্যার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এই পরিবেশে তিনি নানারকম অলৌকিক লীলা দেখাতেন, এবং একবার স্বয়ং শয়তানের আবির্ভাবও ঘটিয়েছিলেন।

কাঁচের তৈরি একটি গোলক ছিল তাঁর। সেই গোলকটিকে জলে পূর্ণ করে রেখে দিতেন চক্রের মাঝখানে। সেই রহস্যময় গোলকের সামনে নতজানু হয়ে বসতেন এক সুন্দরী তরুণী, গোলকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ক্যালিওস্ট্রো তখন মন্ত্র পড়ার ভঙ্গিতে গম্ভীর কণ্ঠে কয়েকটি অলৌকিক শক্তিকে আদেশ করতেন ঐ কাঁচের গোলকের ভেতরে প্রবেশ করতে। বৈঠকে যাঁরা উপবিষ্ট, তাঁরা সবিস্ময়ে দেখতেন গোলকের ভেতরের জল যেন কোন রহস্যময় শক্তির আলোড়নে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, উত্তাপে ফুটতে শুরু করেছে যেন টগ্‌বগ্‌ করে। গোলকের মুখোমুখী ধ্যানমগ্না সুন্দরী তরুণীটি চঞ্চল হয়ে উঠতেন সঙ্গে সঙ্গে, মনে হতো তাঁর সারা দেহে শিহরণ জেগেছে। নানা বিভিন্ন দেশে তখন কি ঘটছে, তরুণী যেন ঐ গোলকের ভেতরের জলে দেখতে পেতেন তারই চলচ্ছবি, আর তাই বর্ণনা করে যেতেন মুখে মুখে। শুধু বর্তমানই নয়, ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতিবিম্বও ঐ জলের বুকে দেখে বর্ণনা করে যেতেন তিনি। চক্র-বৈঠক উপস্থিত সবাই রোমাঞ্চিত শিহরণে অধীর হয়ে উঠতেন এই অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে।

ইউরোপের বড় বড় শহরে ভ্রমণ করণে লাগালেন ক্যালিওস্ট্রো। মন্ত্রমুগ্ধ ভক্তে পরিণত করলেন অর্থ বৈভবে পদগৌরবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত সে যুগের বহু হোমরা চোমরা ব্যক্তিকে।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ক্যালিওস্ট্রো গেলেন ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী শহরে। এখানে তাঁর সব রকম সুবিধা করে দিলেন ফরাসী রাজবংশীয় যুবক কার্ডিনাল দ্য রোহাঁ (Cardinal de Rohan)। দ্য রোহাঁ ক্যালিওস্ট্রোর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হয়ে তাঁর অলৌকিক শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হয়েছিলেন।

সারা প্যারী শহর ক্যালিওস্ট্রোকে নিয়ে মেতে উঠলো। তাঁর ভবনে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যায় বসতে লাগলো চক্র-বৈঠক, ক্যালিওস্ট্রোর অলৌকিক শক্তির খ্যাতি মুখে মুখে ছড়াতে লাগলো দাবানলের মতো। মন্ত্রমুগ্ধ ধনী মূর্খদের ভাণ্ডার থেকে প্রচুর অর্থ দু হাতে লুটতে লাগলেন ক্যালিওস্ট্রো অনায়াসে। সারা প্যারী শহর শুধু নয়, সারা দেশটাই তখন ক্যালিওস্ট্রোর মতো জমকালো বুজরুকের জন্য যেন তৈরি হয়েই ছিলো। জীবনের সত্যিকারের মূল্যবান সব কিছুর প্রতি তখন সবার উদাসীনতা এবং তাচ্ছিল্য, উদ্ভট অলৌকিক ব্যাপার এবং অসার জয়-

কালো বুজরুকির হুজুগে মেতে উঠতে সবারই অসীম আগ্রহ। হুজুগপ্রিয় সমাজ বুজরুক-সম্রাট ক্যালিওস্ট্রোকে পেয়ে যেন বর্তে গেলো। তাঁকে ঘিরে যে রহস্যের আবহাওয়া, তাই তাঁকে আরো মোহনীয় করে তুললো।

লোভ এবং দুঃসাহস বেড়ে উঠলো ক্যালিওস্ট্রোর। শেষ পর্যন্ত ফরাসী দেশের রানী মারী আঁতোয়ানেৎ-এর (Marie Antoinette) হীরার নেকলেসের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে তিনি প্যারী শহরের বিখ্যাত 'বাস্তিল' (Bastille) কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। কিছুদিন পরেই তিনি কারাগার থেকে ছাড়া পেলেন বটে, কিন্তু প্যারী শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। (এই 'বাস্তিল' একদিন ধ্বংস হবে বলে ক্যালিওস্ট্রো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলে ; সেটি সত্য হয়েছে।)

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে – ফরাসী বিপ্লবের বছর – ক্যালিওস্ট্রো ছিলেন রোম নগরীতে। সেখানে বেপরোয়া দুঃসাহসী ক্যালিওস্ট্রো মিশরী মহাবিদ্যার গুপ্তমঠ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। খৃষ্টান জগতের প্রধান পুরোহিত পোপের নিজস্ব এলাকায় এতো বড়ো দুঃসাহস করার ফলে ধরা পড়লেন তিনি, এবং ধর্মীয় বিচারালয়ের (Holy Inquisition) বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। পরে পোপ মৃত্যুদণ্ড মকুব করে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। পরের বছর কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুটি অলৌকিক কাহিনী

ভারত স্বাধীন হবার অনেক আগে কলকাতার মাইল পনেরো দূরে একটি মফস্বল শহর। রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসেছে তার বুক জুড়ে। বিভিন্ন রকমারি জিনিসের সারি সারি দোকান, নানা বিচিত্র প্রদর্শনীর তাঁবুও পড়েছে এখানে ওখানে মাঠের ওপরে ছড়িয়ে। এ শহরে সারা বছরের সেরা মরশুম। এই মেলা চলবে কয়েকদিন ধরে। কেনা-বেচা আর আমোদ-প্রমোদ হবে খুব, তাতে যোগ দিতে এসেছে, আসছে অনেক বাইরের মানুষ। নানা বয়সের, নানা জাতের, নানা রুচির, নানা চরিত্রের। এই বিশেষ মরশুমী আনন্দের আবহাওয়া ছড়িয়ে আছে সারা শহর জুড়ে।

কিন্তু কান্নায় ভরে উঠেছে পুলিশ থানা। কাঁদছে কে? একটি বিধবা স্ত্রীলোক। কেন? তার একমাত্র সন্তান চার বছরের ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

স্ত্রীলোকটির স্বামী পয়সাকড়ি কিছু রেখে যেতে পারেনি। গিয়েছিলো শুধু মাথা গোঁজবার মতো একটি কুঁড়েঘর আর এই একমাত্র সন্তানটিকে আড়াই বছরের রেখে। বৈধব্যের শুরু থেকেই এবাড়ি ওবাড়ি কাজ করে কষ্টেসৃষ্টে মোটামুটি একরকম করে চালিয়ে নিয়েছে বিধবা স্ত্রীলোকটি। ছেলের মুখ চেয়ে কোনো কষ্টই গায়ে মাখে নি। কিন্তু তার সবে ধন নীলমণি বুকের মাণিককে হারিয়ে দিয়ে বিধাতা যে অমানুষিক শয়তানি করেছে, এ কষ্ট সে আর সইতে পারছে না; দারোগাবাবু তার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে না দিলে সে আর এ ছার প্রাণ রাখবে না, এই থানাতেই মাথা কুটে মরবে।

বিধবার এই ভীতি-প্রদর্শনে দারোগাবাবু ভীত না হলেও অস্বস্তি বোধ করলেন। স্ত্রীলোকটি দেহে প্রাণ রাখবে কি না রাখবে তা নিয়ে তাঁর মাথা মোটেই ব্যথিত নয়, কিন্তু সে এই থানার ভেতরেই প্রাণত্যাগ করবার চেষ্টা করলে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে, যাকে বলে 'নুইস্যান্স'। আর এই মেয়ে মানুষটিকে যেরকম বেপরোয়া নাছোড়বান্দা দেখা যাচ্ছে, তাতে ওর পক্ষে অমন একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ঘটানো কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। ওদিকে থানার ভেতরে বামাকণ্ঠের এই ব্যাকুল কান্নায় থানার বাইরে ছোটোখাটো রকমের একটা কৌতূহলী ভিড় জমে গেছে। ব্যাপার কি? থানার ভেতর মেয়েমানুষ অমন করে কাঁদে কেন?

কৌতূহলী জনতাকে কৌতূহলে না রাখাই ভালো বিবেচনা করে বাইরের খোলা বারান্দায় এসে বসলেন দারোগা বাবু। সেইখানে এসে বিধবা স্ত্রীলোকটি তার ছেলে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী শোনাতে লাগলো দারোগাবাবুকে। অদূরবর্তী জনতার কানে পৌঁছতে লাগলো সেই কাহিনী।

শুনে বোঝা গেল কাল রাতে বিধবা স্ত্রীলোকটি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরের দরজায় যথারীতি খিল এঁটে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তার অনেক পরে নিজে ঘুমিয়েছিল। আজ অন্যান্য দিনের মতোই ভোরে উঠে দেখে ছেলের বিছানা ছেলেহীন, দরজার খিল খোলা। কোথায় গেল ছেলে ? প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বেরিয়েছে কি ? কিন্তু রাতে ঘুমিয়ে পড়ার পর প্রকৃতি তো তাকে বড়ো একটা ডাকে না। আর প্রকৃতির ডাকে বাইরে যাবার দরকার হলেও সে সাহস করে একা বেরোবার ছেলেই নয়, নিশ্চয়ই সে মাকে ঠেলে জাগাতো।

দারোগাবাবু শুধালেন, "বিছানায় ছেলেকে না দেখে তুমি কি করলে ?"

"কেঁদে উঠলুম, দারোগাবাবু।"

"তারপর ?"

"তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলেকে ডাকতে লাগলুম। এধারে ওধারে খুঁজলুম। কোথাও সাড়া পেলুম না।"

"কোনো বাড়িতে গিয়ে ছেলে বসে নেই তো ?"

"কাছে পিঠে তেমন কোনো বাড়ি নেই দারোগাবাবু।" বললে স্ত্রীলোকটি। "তবু যে সব বাড়িতে কাজ করি খোঁজ নিয়েছি। কোথাও সে যায় নি।"

দারোগা আরো জেরা করলেন, জেরার জবাবও পেলেন, কিন্তু তাতে রহস্যের কোনো কিনারা পেলেন না। অথচ নালিশকারিনী এমন কোনো দামী ব্যক্তি নয়, যার ছেলে হারিয়েছে বলে শহরের পুলিশবাহিনীকে ব্যস্ত করে তুলতে হবে।

"তোমার ছেলেকে কেউ ভাগিয়ে নিয়ে গেছে বলে সন্দেহ হয় ?" প্রশ্ন করলেন দারোবাবু।

স্ত্রীলোকটি মাথা নেড়ে বললে, "না।"

"তবে ? তবে আর আমরা কি করবো ? তোমার ছেলের জন্যে সারা রাজ্য তোলপাড় করে বেড়াবো ?"

তখন অদূরে উপস্থিত জনসাধারণের প্রতিনিধিদের ভেতর গবেষণা শুরু হলো ; অনেক 'হয়তো' এবং অনেক 'বোধহয়' শুনতে পাওয়া গেল। শেষ

পর্যন্ত স্থির হলো ব্যাপারটা একটু রহস্যময়—যে ডাকে বিধবার ছেলেটি সাড়া দিয়েছিল, সে প্রকৃতির ডাক নয়, নিশির ডাক। লৌকিক নয়; অলৌকিক।

'অলৌকিক' শুনে দারোগাবাবু বোধ করি একটু খুশী হলেন, কারণ তাহলে এ ব্যাপারে লৌকিক পুলিশের মাথা না ঘামালেও চলবে।

প্রবীণ গোছের এক ভদ্রলোক বললেন, "আমার তো মনে হয়, বুঝলে গো মেয়ে, তোমার ছেলের ওপর কিছুর ভর হয়েছে। রোজা ডেকে ঝাড়াও।"

শুনে আরেকজন বললেন, "বলেছো ভালো। ছেলেকে পেলে তবে তো রোজা ডেকে ঝাড়াবে।"

সুতরাং মীমাংসা হলো ছেলেটিকে ঝাড়াবার আগে তাকে খুঁজে বার করা দরকার।

তখন একজন লোক দারোগাবাবুকে বলল, "হুজুর অভয় দেন তো একটা কথা বলি।"

"দিলাম। বলো।" বললেন দারোগাবাবু।

লোকটি বললে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যাদুকর 'তকমাওয়ালা সাঁই'-এর কথা। ঐ যে দেখা যাচ্ছে মেলার মাঠ, তাতে পড়েছে তক্‌মাওয়ালা সাঁইয়েরও তাঁবু। এই মাত্র কলকাতা থেকে বিকেলের গাড়িতে এসে পৌচেছেন তিনি। সারা কলকাতায় তাঁর যাদুকর খ্যাতি। বিস্ময়কর তাঁর নানা রকম যাদুর খেলা, বিস্ময়কর তাঁর সম্মোহন, যাকে বলে 'মিসমেরাজিম'। জিন আর পরীদের সঙ্গে কথা কইতে পারেন এই অসামান্য মায়াবী। যাদুবিদ্যার বহু লুপ্ত রত্ন তিনি উদ্ধার করেছেন। তিনি কি রহস্যময়ভাবে হারিয়ে যাওয়া বালকটিকে তাঁর অলৌকিক শক্তিতে উদ্ধার করে দিতে পারবেন না? তাঁকে গিয়ে ধরে পড়লে হয়তো ছেলেটিকে ফিরে পাওয়ায় কিছু সুবিধা হলেও হতে পারে।

হারিয়ে যাওয়া ছেলেটির মা তখন কেঁদে দারোগাবাবুর পা জড়িয়ে ধরে বললে, দারোগাবাবুই তার একমাত্র ভরসা, ঐ সাধু সন্ন্যেসি-ফকির বুজরুকে তার বিশ্বাস নেই।

কিছুতেই পা ছাড়ে না যে; আচ্ছা আপদ তো!

"সব ঠিক করে দিচ্ছি", ভরসা দিয়ে দারোগাবাবু নিমন্ত্রণ পাঠালেন যাদুকর তক্‌মাওয়ালা সাঁইয়ের তাঁবুতে। সেই নিমন্ত্রণবাহী দূতের সঙ্গে কয়েকজন চেলা নিয়ে এসে হাজির হলেন তক্‌মাওয়ালা সাঁই।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, দুই চোখে নির্ভীক বেপরোয়া দৃষ্টি, মুখে আত্মপ্রত্যয়ের

হাসি। মাথায় কালো রুমাল বাঁধা। পরনে রেশমের জামা, পা-জামা। পায়ে শৌখিন নাগরা। গায়ে রেশমি জামার বুকের ওপরে দুলছে অনেক মেডেলের মালা। 'তক্‌মাওয়ালা' বিশেষণের মূলে এই মেডেল। গলায় বিভিন্ন রঙের পাথরের মালাও দুলছে একটি।

দারোগাসাহেবকে সসম্ভ্রমে সালাম ঠুকে দাঁড়ালেন তকমাওয়ালা। মানী মানুষ মানী মানুষকে সম্মান দেখাচ্ছে, এই ভাব। হাসিমুখে দিলেন নিজের পরিচয় :

"যাদুকর নারাসা, তক্‌মাওয়ালা সাঁই। আপনার বান্দা। কি হুকুম হয়?"

অলৌকিক ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক, একটা রহস্যময় ব্যক্তিত্ব আছে বটে লোকটার। সেই ব্যক্তিত্বের প্রভাব বেশ স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলেন দারোগাবাবু। একেবারে চেয়ারের মর্যাদা দিতে তবু বাধলো হয়তো, একটা টুল এনে বসতে দিলেন। দারোগাবাবুর হুকুমে সেই স্ত্রীলোকটি বহুকষ্টে কান্না চাপতে চাপতে তার দুঃখের কাহিনী শোনালো যাদুকরকে।

পরিস্থিতিটা নাটকীয়ও বটে, রোমাণ্টিকও বটে। চুরি, রাহাজানি, খুন, ডাকাতির বাইরে আজকের এই ব্যাপারটি, এতে ক্রাইম নেই, রোমাঞ্চ আছে; একটু নূতনত্বের স্বাদ পাওয়া গেলো। তাই আজ আর ততোটা 'অফিশিয়াল' নন দারোগাবাবু; অনেক কমিয়ে দিয়েছেন তাঁর রাশভারিয়ানা।

হঠাৎ উপস্থিত কৌতূহলীদের পেছনের লাইনে একজন একটু হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে যেন বৈদ্যুতিক 'শক' খেয়ে টুল থেকে লাফিয়ে উঠে সেই হাসির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন যাদুকর নারাসা, ওরফে 'তক্‌মাওয়ালা সাঁই'। ঐ হাসি তাঁকেই বিদ্রূপ করে, এই সন্দেহে জ্বলে উঠলো তাঁর দুটি চোখ। অদ্ভুত তাঁর এই দ্রুত পরিবর্তন। হঠাৎ শূন্য থেকে ডান হাতের থাবায় অদৃশ্য কি যেন ধরে নিয়ে ফুঁ দিয়ে মন্ত্রপূত করে তাকে ছুঁড়ে মারবার ভঙ্গি করলেন সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কায় কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গিয়ে লোকটি অসহ্য যন্ত্রণায় দেহ সংকুচিত করে গোঙাতে লাগলো। যাঁরা 'বাণ মারা'-র গল্প শুনেছিলেন, তাঁরা বাণ মারার এই চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে চমৎকৃত হলেন, ভীতও হলেন। দারোগাবাবুরও সেই অবস্থা। লৌকিক ক্ষমতাওয়ালা মানুষ অলৌকিক ক্ষমতার নমুনা দেখে অস্বস্তি বোধ করে বললেন :

"এ কেয়া হুয়া?"

তক্‌মাওয়ালা সাঁই বললেন, "এ হলো বেতমিজ বেওকুফের মগজে একটু

আক্কেল ঢোকাবার ব্যবস্থা। লোকটার এতো বড়ো স্পর্দ্ধা, সে অলৌকিক শক্তিকে হেসে উপহাস করে?"

বাণাহত লোকটির অবর্ণনীয় দুর্দশায় বেশ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। স্পষ্ট বোঝা গেলো এই 'বাণ'-এর নিদারুণ বন্ধন থেকে মুক্তি না পেলে অল্পক্ষণের ভেতরই লোকটি দম আটকে মারা যাবে। যাদুকরের সঙ্গী শিষ্যটিও অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলো, শেষে ওস্তাদকে নরহত্যার দায়ে পড়তে না হয়। সে ব্যাকুল হযে বলতে লাগলো—"বাণ ছুড়া লী জীয়ে ওস্তাদ।"

দারোগাবাবুও চিন্তিত। কিন্তু মোটেই যেন চিন্তিত হননি, এই ভাব দেখিয়ে তিনিও তক্‌মাওয়ালা যাদুকরকে অনুরূপ অনুরোধ করলেন।

দারোগা সাহেবের হুকুম অমান্য করতে পারলেন না তক্‌মাওয়ালা সাঁই। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর লোকটির দিকে বারবার তিনবার মন্ত্রপূত মুক্তিবাণ নিক্ষেপ করে তিনি আগেকার বাণের বন্ধন কেটে দিলেন। লোকটির কাতরানি বন্ধ হলো, তারপর সে ধীরে ধীরে উঠে বসে অবসন্ন কণ্ঠে বলল, "জল।"

জল দেবার উপক্রম হচ্ছিল। যাদুকরের শিষ্য বলে উঠল, "খবরদার। এখনই পানি দিলে কলিজা ফেটে মরে যাবে। বাণের চোটটা আগে সামলে নিক। তার বাদে পানি।"

হঠাৎ রাগের মাথায় যাদুবাণ মেরে ফেলে তক্‌মাওয়ালা সাঁই বোধ করি একটু অনুতপ্তই হয়েছিলেন; চোট যে এতোটা লাগবে তিনি তা বুঝতে পারেন নি। লোকটিকে দাঁড় করিয়ে তার শিরদাঁড়ায় কয়েকবার হাত বুলিয়ে দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুললেন, জল খাওয়ালেন। তারপর মৃদু হুঁশিয়ারির সুরে বললেন, "অ্যায়সা ঔর কভী মৎ করনা।" অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিকে উপহাসের দুঃসাহস অ কোরো না। লোকটি নাকে খত দেবার ভঙ্গিতে বিদায় নিয়ে কেটে পড়ল।

বিধবা স্ত্রীলোকটির এইবারে বিশ্বাস হল এই রহস্যময় আগন্তুকটির অলৌকিক ক্ষমতায়। "আমার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দিতেই হবে ফকির সায়েব।" বলে সে লুটিয়ে পড়ল তক্‌মাওয়ালা যাদুকর নারাসার পায়ে।

এই ধরনের হুজুগি-খবর ছড়াতে বেশী দেরি লাগে না। থানার অনতিদূরবর্তী কৌতূহলী ভিড় বেশ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠল।

কিন্তু তামাসা সেদিন আর কিছু হল না। ট্রেন থেকে এই একটু আগে মাত্র নেমেছেন, এখনো একটুও বিশ্রাম হয়নি, এই অজুহাতে মাফ চাইলেন তক্‌মাওয়ালা। ছেলে ভোরে বেরিয়ে কোথাও গেছে, নিশ্চয় রাতের আগেই

ফিরে আসবে। যদি না আসে? "তো কাল দেখা যাবে। বান্দা তো হাজিরই থাকবে হুজুর। কালই হুকুম করবেন আপনি", বলে হুজুরের অনুমতি নিয়ে তাঁবুর দিকে ফিরে চললেন সশিষ্য যাদুকর তক্‌মাওয়ালা সাঁই। তাঁকে আজ আর ঘাঁটাতে চাইলেন না দারোগাবাবু।

পরদিন ভোরবেলা। থানার অদূরের ফাঁকা জায়গায় মস্ত ভিড়। বিধবার ছেলে ফিরে আসেনি। কাল সাইকেলে চড়ে পুলিশ কনস্টেবলরা অনেক জায়গায় তালাস করেছে, হারান ছেলের কোন পাত্তা মেলে নি। তাই শেষ পর্যন্ত অদ্ভুতকর্মা তক্‌মাওয়ালা সাঁইয়ের অলৌকিক শক্তির শরণ নেওয়া হয়েছে।

ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করা হয়েছে একটা। তাতে একদিকে বসল হারান ছেলেটির মা, তার উল্টো দিকে বসলেন শিষ্যসহ তক্‌মাওয়ালা সাঁই। উপস্থিত জনগণের সামনে সাঁইয়ের চোখ বেঁধে দেওয়া হল হারিয়ে যাওয়া ছেলেটির ব্যবহৃত একটি ফতুয়া দিয়ে।

স্বর্গীয় ওস্তাদের নামে মন্ত্র পড়ে ফতুয়াটিকে মন্ত্রপূত করে নিলেন তক্‌মাওয়ালা সাঁই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথাটা দুলতে লাগল। ফতুয়া ছুটে যেতে চাইছে ছেলেটির কাছে তাই টান পড়ছে তক্‌মাওয়ালার মাথায়! ফতুয়া যেদিকে যেতে চাইছে সেই দিকে গাড়োয়ানকে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিলেন তক্‌মাওয়ালা। গাড়োয়ান গাড়ি চালাতে লাগল সেই ভাবে ধীরে ধীরে। গাড়ির দুধারে আর পিছনে কৌতূহলী জনতার সারি। কি এক রহস্যময় অদৃশ্য শক্তি অমোঘ টানে টেনে নিয়ে চলেছে ফতুয়াটিকে, সেই টানে এগিয়ে চলেছেন ফতুয়া-সংলগ্ন তক্‌মাওয়ালা সাঁই, আর তক্‌মাওয়ালা-সংলগ্ন ঘোড়ার গাড়ি! ফতুয়ার টানে দুএকবার সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন তক্‌মাওয়ালা সাঁই। দেখে সবাই শিহরিত, বিস্মিত।

কিছু দূর গিয়ে ফতুয়ার টানের ইঙ্গিত পেয়ে তক্‌মাওয়ালা বললেন ডাইনে গাড়ি ঘোড়াতে। গাড়োয়ান ডাইনে গাড়ি ঘোরাল। কিছু দূর গিয়ে বাঁয়ে, তারপর ফের ডাইনে। কৌতূহলী, বিস্ময়মুগ্ধ দর্শকদল চলল সঙ্গে সঙ্গে। বিধবা স্ত্রীলোকটির মনের ভেতর কি ভীষণ তুফান চলছে কে জানে? তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে খুঁজে বার করে তার বুকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন কি এই রহস্যময় পুরুষ? ঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে চলছে ধীরে ধীরে। তার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলেছে কৌতূহলীর দল। তারা লক্ষ্য করছে সন্তান হারান বিধবা মায়ের মুখমণ্ডলে আশা নিরাশার নিদারুণ দ্বন্দ্ব।

ঘোড়া দুটি গাড়ি টানছে ধীরে, অতি ধীরে। এতে তাদের মেহনত বেশী, কিন্তু উপায় নেই ; জলদি এগোতে গেলেই মুখের লাগামে প্রচণ্ড টান পড়ছে।

হারান ছেলেটির একটি ফতুয়া জড়িয়ে তকমাওয়ালার চোখ বাঁধা। সেই অবস্থাতেই তিনি চুপচাপ তাঁর আসনে বসে আছেন, আর গভীর মনোযোগ দিয়ে কি যেন শুনছেন কান পেতে।

মফস্বল শহর ছাড়িয়ে শহরতলীর জনবিরল পথ বেয়ে গাড়ি চলছে মন্থর গতিতে। সহসা চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রহস্যময় যাদুকর তকমাওয়ালা সাঁই। কোথা থেকে যেন কোন রহস্যময় ইঙ্গিত তাঁর কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে। আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন তকমাওয়ালা।

পদব্রজে যাঁরা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আসছিলেন কৌতূহলের তাড়া খেতে খেতে, তাঁদের কৌতূহলী উত্তেজনা এইবার চরমে উঠল। কিসের ইঙ্গিত শুনেছেন তকমাওয়ালা। কোন দিক থেকে এসেছে সে ইঙ্গিত ?

দেখা গেল তকমাওয়ালা শিষ্য বা সাগরেদটিও গুরু অর্থাৎ ওস্তাদের এই অদ্ভুত ভাব পরিবর্তন দেখে চমকে উঠেছে, একটু ভীতও হয়েছে যেন, হঠাৎ হলো কি ওস্তাদের ?

সবিনয় শুধালে ওস্তাদকে। ওস্তাদ বললেন, "গাড়ি থামাও।" উল্টো দিকের আসনে একা বসেছিল হারান ছেলেটির মা, তার ব্যাকুল হৃদয় বুঝি হঠাৎ আশার আলোর ঝলকানিতে একটু ঝলমল্ করে উঠলো। তবে কি সফল হবেন এই দৈবপ্রেরিত অলৌকিক শক্তিমান মহাপুরুষ ? তার হারিয়ে যাওয়া বুকের মাণিক আবার কি তার বুকে ফিরে আসবে ?

দাঁড়িয়ে পড়েছে কৌতূহলী জনতা। দেখা যাক এইবার কি হয়। শিষ্যের হাত ধরে গাড়ি থেকে নামলেন যাদুকর তকমাওয়ালা সাঁই। যাদুকরের নির্দেশে গাড়ি থেকে নামানো হলো সেই সদ্য নিরুদ্দিষ্ট-সন্তান বিধবা স্ত্রীলোকটিকে।

গাড়ি থেমেছিল এক গৃহস্থের বাড়ির সামনে। বাড়ি মানে মাটির দেয়াল আর খড়ের ছাউনির খান দুই ঘর। এক পাশে একটি গোয়াল ঘর !

মন্ত্রপূত ফতুয়ার টানে শিষ্যের হাত ধরে ঐ গোযালঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন তকমাওয়ালা। তাঁর পিছু পিছু গেলো সেই বিধবা। পিছু পিছু মহাকৌতূহলী জনতা।

ব্যাপার দেখে এগিয়ে এলেন গৃহস্থ আর গৃহস্থপত্নী। দুজনেই বিস্মিত, ভীত। তকমাওয়ালা এগিয়ে গেলেন গোয়াল ঘরের দিকে। গোয়াল ঘরের সামনে

দাঁড়িয়ে চোখের নিমেষে খুলে ফেললেন চোখের বাঁধন—ফতুয়াটা। যেন তার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পড়লো বিরাট খড়ের গাদায়। তক্‌মাওয়ালা বললেন, "মন্ত্রপূত এই ফতুয়াই—ফতুয়ার মালিকের সন্ধান দিয়েছে। তোমার ছেলে আছে এই খড়ের গাদারই ভেতর।"

সত্যিই তাই। ঐ খড়ের গাদা থেকেই উদ্ধার করা গেলো বিধবার হারানো ছেলেকে। সে ছেলে পরম নিশ্চিতভাবে ঘুমিয়ে আছে। জানে না তাকে নিয়ে এতো হৈ হৈ কাণ্ড।

হারানিধিকে ফিরে পেয়ে অসহ্য আনন্দে বিধবা স্ত্রীলোকটি কান্নায় আকুল হয়ে উঠলো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। হট্টগোলে জেগে উঠলো ছোট্টো ছেলেটি। বিস্ময়ে অবাক। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "একি? কোথায় আমি? এখানে কেন? বাবা কোথায়।"

বাবা! সে তো অনেক আগেই ওপারে রওনা হয়ে গেছে; তার কথা বলে কেন ছেলে? আর এখানে সে এলোই বা কি করে?

চার বছর বয়সের ছেলেটির মুখের এলোমেলো কথা গুছিয়ে নিয়ে যা বোঝা গেলো তা শুনে ছেলের বিধবা মার তুচোখ কপালে উঠলো। সর্বনেশে ছেলে বলে কি? শেষরাতে তার বাবা এসে ঘুম ভাঙিয়ে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল; তারপর বাবার সঙ্গে সে কোথায় কোথায় কতক্ষণ ঘুরছে, আর তারপর কখন কেমন করে এই খড়ের গাদার ভেতর এসে ঘুমিয়ে পড়েছে, কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, তা সে নিজেই জানে না!

শুনে ভিড়ের ভেতর অনেকে শিউরে উঠলেন। কারণ ছেলেটির বাবা মারা গেছে বছর দেড়েক আগে। পরলোকগত বাপ এসে তার ইহলোকের ছেলেকে ঘর ছাড়িয়ে এতদূর নিয়ে এসে এই নিরালা গৃহস্থবাড়ির গোয়াল ঘরে খড়ের গাদায় রেখে গেছে, এ যে ভয়ানক অলৌকিক ভূতুড়ে ব্যাপার। এমন লোমহর্ষক অদ্ভুত ঘটনা এ অঞ্চলে গত সিকি শতাব্দীর ভেতরও ঘটে নি। বিধবা স্ত্রীলোকটি তার ছেলেকে বুকে চেপে ধরে ভয়ে আর আনন্দে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

"রোও মত। কুছ ডর নেহি।" বললেন যাতুকর তক্‌মাওয়ালা সাঁই। অর্থাৎ 'কেঁদো না। কোনো ভয় নেই।'

ভীতা স্ত্রীলোকটি তবু হাউ হাউ করে কেঁদেই সারা। ছেলের বাপের যখন নজর পড়েছে তখন ছেলেকে নিয়ে আবার উধাও হবে। তখন?

"কুছ ডর নেহি।" আবার ধ্বনিত হয়ে উঠলো তক্‌মাওয়ালা যাদুগুণীর অভয়বাণী।

এদিকে গৃহস্থ বেচারাও ভয়ানক ঘাবড়ে গেছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনায় নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করেন, ভূত বাপ তার ছেলেকে এনে তাঁরই গোয়ালের খড়ের গাদায় রেখে দিয়ে গেলো কেন? তবে কি তাঁর গৃহস্থালীর ওপর সেই ভূতটির নজর পড়েছে? এরপর কি তাঁকে যখন তখন ভূতের উপদ্রব সইতে হবে?

গৃহস্থ ব্যকুল হয়ে হাতে পায়ে ধরে অনুনয় করতে লাগলেন তক্‌মাওয়ালা সাঁইকে, ভৌতিক উৎপাত থেকে তাঁর গৃহস্থালীকে মুক্ত করে দিয়ে যেতে। মন্ত্র পড়ে গৃহস্থের গৃহস্থালীকে এমন করে দিয়ে যেতে হলো গুণী যাদুকরকে, যেন এই ছেলের মৃত বাপ বা অন্য কোনো ভূত এ বাড়ির বা গোয়াল ঘরের কাছাকাছিও আসতে না পারে।

অদ্ভুত, রহস্যময় সেই মন্ত্র। জলদগম্ভীর কণ্ঠ, বিচিত্র উচ্চারণ ভঙ্গি। চমকিত হলো, অভিভূত হলো, উপস্থিত জনগণ। তক্‌মাওয়ালার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্ময়কর!

আগুনের মতো খবর ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, হারানো ছেলেকে কেবল মাত্র ছেলেটির ফতুয়ার সাহায্যে অদ্ভুত ভাবে উদ্ধার করে দিয়েছেন সদ্য আগত অলৌকিক শক্তিশালী যাদুকর তক্‌মাওয়ালা সাঁই। শহরময় বিখ্যাত হয়ে গেলেন যাদুকর তক্‌মাওয়ালা। যাঁরা তাকে দেখেননি তাঁরা আকুল হয়ে উঠলেন তাঁকে দেখবার জন্যে; যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা উদ্‌গ্রীব হলেন তাঁর অলৌকিক শক্তির আরো নমুনা দেখে চমৎকৃত হবার জন্য। সুতরাং যখন জানা গেলো অলৌকিক যাদুর খেলা দেখাবার জন্যেই তাঁর এই আগমন, এবং খেলার মাঠে এই জন্যেই তাঁর তাঁবু পড়েছে, সেই তাঁবুর ভেতর সামান্য দর্শনীর বিনিময়ে তাঁর অসামান্য যাদুর খেলা মেলায় কয়েকদিন ধরে দেখতে পাওয়া যাবে, তখন সেই সামান্য দর্শনী অনেকেই দিতে লাগলেন নিঃসন্দিগ্ধ অকুণ্ঠিত চিত্তে এবং মুগ্ধও হতে লাগলেন তক্‌মাওয়ালার বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখে। কারণ হস্ত-কৌশল এবং যান্ত্রিক কৌশলের নানারকম যাদুর খেলায় (যাকে সোজা কথায়, এবং বিদেশী ভাষায় আমরা বলি 'ম্যাজিক') তিনি ছিলেন সুদক্ষ, আশ্চর্য সিদ্ধি লাভ করেছিলেন প্রচুর সাধনা করে; তাই নিতান্ত লৌকিক কৌশলের ছলনাগুলোও তাঁর পরিবেশনের যাদুতে অলৌকিক রহস্যে মণ্ডিত হয়ে উঠত।

শুধু যাদু প্রদর্শনীর দর্শনী থেকেই যে তক্‌মাওয়ালার আয় হলো তা নয়।

বিভিন্ন আকার আয়তন, রঙ এবং গুণের পাথর এবং মন্ত্রপূত তাবিজ-মাদুলী ইত্যাদিও বিভিন্ন দামে বিলি করতেন এই 'অলৌকিক গুণী'। অনর্গল বক্তৃতায় তিনি ফর্দ দিয়ে যেতেন দুনিয়ার কোন কোন দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং কোথা থেকে দুর্লভ পাথর সংগ্রহ করেছেন। তাঁর অলৌকিক শক্তির চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে সাধারণ মানুষের আর অবিশ্বাসের সুযোগ থাকতো না। তকমা-ওয়ালার মুখের এক একটি কথা যেন এক একটি বেদবাক্য। সুতরাং পাথর আর মাদুলী প্রচুর বিক্রী হলো তকমাওয়ালার ভাণ্ডার থেকে।

মেলার মেয়াদের শেষে যাকে যা দেবার দিয়ে থুয়েও বেশ কিছু অর্থ ঝুলিতে ভরে নিয়ে গেলেন তকমাওয়ালা সাঁই।

এবারে দুনম্বর কাহিনী। একটি রেলওয়ে স্টেশন। গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেছে, ঘণ্টা পড়ে গেছে, গার্ডের হুইস্‌ল্ বেজেছে, গার্ড সবুজ নিশান দুলিয়ে দিয়েছেন, কান কাঁপানো সিটি বেজেছে ইঞ্জিনের বাঁশিতে, কিন্তু গাড়ি ছাড়ছে না। ব্যাপার কি? গাড়ি ছাড়ছে না কেন? গাড়ি ছাড়ছে না, কিন্তু সময় এগিয়ে চলেছে হু হু করে। কামরায় কামরায় শুরু হলো যাত্রীদের গুঞ্জরণ। অনেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলেন। প্লাটফর্মে নেমেও পড়লেন কৌতূহলী কেউ কেউ।

দেখা গেলো ইঞ্জিনের সামনে প্ল্যাটফর্মের এক ধারে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন একজন দীর্ঘকায় দরবেশ; চাপা রাগে তাঁর মুখ লাল, দু চোখে আগুন। তাঁর অনতিদূরে, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে—জড়ো হয়েছে ছোটোখাটো একটি অর্ধভীত, বিস্মিত, কৌতূহলী জনতা। তার ভেতর রয়েছেন একজন টি-টি-সি, অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ টিকেট চেকার! দেরি যখন মাত্রা ছাড়িয়ে দুঃসহ হয়ে উঠলো, তখন উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন স্টেশন-মাস্টার। গার্ডসাহেব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, নিজেকে রাজার জাত বলে মনে করেন, নেটিভ ড্রাইভারের স্পর্ধা দেখে তিনি ক্ষেপে উঠলেন। তাঁর হুইস্‌ল্, আর সবুজ নিশান দোলানো অগ্রাহ্য করে এখনো ট্রেন থামিয়ে রেখেছে, এত বড়ো দুঃসাহস লোকটার! অত্যন্ত রেগে তিনি আবার হুইস্‌ল্ বাজালেন, আবার সবুজ নিশান ঝাঁকালেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না। গাড়ি যেমন ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো। গার্ডসাহেব তখন হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন ইঞ্জিনের দিকে, ড্রাইভারকে নিশান-পেটা করবেন যেন। গিয়ে দেখেন স্টেশন-মাস্টারও গিয়ে পৌঁছেছেন সেখানে। ড্রাইভার ইঞ্জিনের কল-কব্‌জা নাড়াচাড়া করে ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার আপ্রাণ চেষ্টায় গলদঘর্ম

হয়ে উঠেছে, কিন্তু স্টার্ট নিচ্ছে না ইঞ্জিন, চলা শুরু করছে না গাড়ি। ড্রাইভারের চেষ্টার ত্রুটি নেই দেখে গার্ডসাহেবের কিছুটা রাগ গলে জল হলো, তাঁর একটু যেন অনুকম্পাও হলো ড্রাইভার বেচারার ওপর। এগিয়ে গিয়ে বললেন, "ক্যা, এঞ্জিনকা কোই যন্তর বিগড় গিয়া?" ড্রাইভার বললে, "নহি সাহাব, ইস্‌পর শায়দ কোই মন্তর লাগ গিয়া, যাদু-মন্তর। মন্তর নহি ছুট্‌নেমে গাড়ি নহি ছুটেগী। তামাম কোশিশ বেকার হ্যায়।" অর্থাৎ ইঞ্জিনের ওপর সম্ভবত লেগেছে কোনো যাদুমন্ত্রের প্রভাব, সেই প্রভাব থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ইঞ্জিন চালু হবে না, চলা শুরু করবে না গাড়ি, বিফল হবে সমস্ত চেষ্টা।

"ড্যাম ইওর মন্তর। সিলি সুপারস্টীশান। লেট মি সী। ট্রাই এগেন, ম্যান।" বলে ইঞ্জিনের ভেতর উঠে গেলেন গার্ডসাহেব। শুনে প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়ানো এক প্রবীণ ভদ্রলোক, সাহেবের কানে না পৌছয় এই রকম মৃদু-কণ্ঠে, বিড়বিড় করে বললেন, "ড্যাম নয় হে বাছাধন, সুপারস্টীশানও নয়। তোমাদেরই এক হোমরা-চোমরা জাত-ভাই একবার ড্যাম ইওর মঘা বলে, তারপর ঐ মঘার নামেই নাকে খত দিয়েছিল। হেঁ হেঁ।" আরেক ভদ্রলোক তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, "আরে মশাই, ওদের শেক্‌স্‌পীয়ারই তো বলেছে দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ দান আর ড্রেম্‌ট্‌ অভ্‌ ইন ইওর ফেলজফি।"

গার্ডসাহেব শুধু গার্ডগিরি জানেন, রেলগাড়ির ইঞ্জিন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান প্রায় আমারই মতো। তবু তাঁর গায়ে রাজার জাতের চামড়া, এই বিশ্বাসের গরমে পরম বিজ্ঞতার ভঙ্গিতে তিনি ড্রাইভারকে বললেন, "নাউ ট্রাই এগেন। ফির কোশিশ করো ম্যান।" তাঁর হয়তো ধারণা নেটিভ ড্রাইভারের সঙ্গে ইঞ্জিন যদি বা দুষ্টুমি করে থাকে রাজার জাতের এ হেন একজন জাঁদরেল প্রতিনিধির সামনে সে আর সাহস পাবে না কোনোরকম নষ্টামি করতে। কিন্তু না, রাজার জাতের উপস্থিতিতেও পরিস্থিতির কিছুমাত্র উন্নতি দেখা গেলো না। ড্রাইভারের সমস্ত চেষ্টা আবার ব্যর্থ হলো, সচল হলো না ইঞ্জিন। শুধু দেখা গেলো সেই দীর্ঘকায় বিচিত্রবেশ বলিষ্ঠ দরবেশের মুখে ক্রোধের রক্তিমা দূর হয়ে দেখা দিয়েছে রহস্যময় কৌতুকের হাসি। ড্রাইভারের আপ্রাণ ব্যর্থ চেষ্টা, গার্ডসাহেবের ধাঁধা-গ্রস্ত ভাব, স্টেশন মাস্টারের বিব্রত অবস্থা, এতগুলো লোকের বিস্ময়-বিমুগ্ধ কৌতূহল, সব কিছু যেন রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছেন তিনি।

গোটা স্টেশন জুড়ে অভূতপূর্ব শিহরণ, ইংরেজিতে যাকে বলে সেন্‌সেশুন।

সেই শিহরণ ছড়িয়ে পড়লো স্টেশনের বাইরেও। ঘন জঙ্গলে দাউ দাউ দাবানলের মতো জানাজানি হয়ে গেলো, এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দরবেশ যাদু-মন্ত্রের জোরে স্টেশনের প্লাটফর্মে রেলগাড়ি আটকে রেখেছেন, ছাড়তে দিচ্ছেন না। অলৌকিক ব্যাপার দেখবার জন্যে ক্রমেই আরো লোক জড়ো হতে লাগলো। স্টেশন-মাস্টার প্রমাদ গনলেন, প্রমাদ গনলেন গার্ডসাহেব। দেরির পর দেরি হয়েই চলেছে। কিছুতেই গাড়ি চালু করা যাচ্ছে না। এখন উপায় ?

ভেবেচিন্তে একজন বিধান দিলেন, "রেলওয়ে ওয়ার্কশপে তার-পথে খবর পাঠানো যাক মিস্ত্রি পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করে. মিস্ত্রিরা এসে যন্ত্রপাতি ঠিক করে ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে যাক।" আরেকজন বললেন, "ও বাবা! সে তো কয়েক ঘণ্টার ধাক্কা। ততক্ষণে পরের ট্রেন এসে যাবে।" ড্রাইভার মাথা নেড়ে বললে, "নহী নহী, কোঈ মিস্তিরি উসতিরিসে কাম নহি বনেগা। এন্‌জিন্‌কা তামাম যন্তর তো বিলকুল ঠিক হ্যায়।" ড্রাইভারের চোখেমুখে বিরাট উদ্বেগের ভাব, ইঞ্জিনের যন্ত্র সব ঠিক আছে, তবু গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না কেন ?

একজন বললেন, "তাহলে এরপর যে গাড়িটা আসবে সে গাড়িই এ গাড়িকে ঠেলে নিয়ে যাবে।" শুনে আরেকজন বললেন "ক্ষেপেচেন মশাই ? এ গাড়ির সব চাকা যে জাম হয়ে আছে। ঠেলে নেবে কি করে ? একটি চাকাও যে ঘুরবে না।"

এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির কল্পনাও তাঁরা কোনোদিন করেননি; কিংকর্তব্যবিমূঢ় চিত্তে অবসন্ন বোধ করতে লাগলেন গার্ডসাহেব আর স্টেশন-মাস্টার। তখন এঞ্জিন থেকে নেমে এলো শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন-প্রায় ড্রাইভার; ভিড় ঠেলে দাঁড়ালো এসে পরম বিনীত ভঙ্গিতে দরবেশের সামনে। বললে, "গোস্তাকি মাফ কীজিয়ে ওস্তাদ। বান ছোড়া লীজিয়ে, লৌটা লীজিয়ে আপকা মন্তর, তাকি হম স্টার্ট দে সকেঁ।" অর্থাৎ ক্ষমা করুন অপরাধ, বান ছাড়িয়ে নিয়ে যান, ফিরিয়ে নিন আপনার মন্তর, যেন আমি গাড়িতে স্টার্ট দিতে পারি।

দরবেশ বললেন, "তুমহারা কোঈ কসুর নহী হ্যায় বেটা। কসুর জিস্‌কা হ্যায় উও খুদ মাফী নহী মাঙনেসে বান হম ছুড়া নহী লেঙ্গে। চাহে যো কুছ হোয়।" অর্থাৎ দোষ তোমার কিছু নয় বৎস। যার দোষ সে নিজে এসে ক্ষমা না চাইলে আমি বান ছাড়িয়ে নেবো না। এতে যা হয় হোক।

ড্রাইভার তখন সমস্ত যাত্রীদের প্রতিনিধি হয়ে কাঁদোকাঁদো গদগদ ভঙ্গিতে নিবেদন করলে, "ইন লোগোঁকো তকলীফ আপ সমঝ লীজিয়ে বাবা। ইনা

সভীকী তরফসে হম আরজি পেশ কর রহে হ্যায়। আপ মেহেরবানী কীজিয়ে, গাড়ী চলনে দীজিয়ে।" অর্থাৎ এতগুলো লোকের অসুবিধার কথা একবার বিবেচনা করুন বাবা। এঁদের সবার পক্ষ হয়ে আমি আপনার শ্রীচরণে আরজি পেশ করছি, আপনি তা মঞ্জুর করুন, দয়া করে গাড়ি চলতে দিন।

দরবেশ ভ্রূকুটি করে বললেন, "যো হমারা কহনা থা উও তো ম্যায়নে কহ দিয়া। ফির বাত না করো।" অর্থাৎ আমার যা বলবার বলে দিয়েছি। এরপর আর অনর্থক কথা বাড়িও না।

দরদী ড্রাইভার এতগুলো লোকের তকলিফের কথাটা বেশ ভালোই ভেবেছিলো। ওর কথাটা উপস্থিত অনেকেরই মনঃপূত হলো। সত্যিই তো এভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে আটকে থাকা ভয়ানক রকম বিরক্তিকর।

অচিরে জানা গেলো এ ব্যাপারে অপরাধী হচ্ছেন ঐ ভ্রাম্যমাণ টিকেট চেকারটি। দরবেশের কাছে টিকেট চেয়ে টিকিট পাননি, তাই বিনা টিকিটের যাত্রী বলে তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। নেহাত দরবেশ বলেই তাঁকে শুধু নামিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন, নইলে তাঁকে রেলওয়ে পুলিশের হাতে দিয়ে দিতেন।

দরবেশ দাবি করলেন, "সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির-দরবেশের টিকেট লাগা অনুচিত!" নাছোড়বান্দা চেকার বললেন, "রেল কোম্পানীর কেতাবে তেমন কোনো আইন লেখা নেই।" দরবেশ বললেন, "রেল-কানুনসে ভি বড়া এক কানুন হ্যায়।" অর্থাৎ রেলওয়ে আইনের চাইতেও যে আইন বড়ো, সেই বড়ো আইন অনুসারে সাধু-সন্তদের বিনা টিকেটে ভ্রমণ করতে কোনো মানা নেই।

কিন্তু রেল কানুনের চাইতে বৃহত্তর সেই কানুন মানতে রাজী নন টিকেট-চেকার। তিনি গোঁ ধরে রইলেন. তিনি রেল কোম্পানীর নিমক খান, অতএব রেলের আইনই তাঁর কাছে বেদবাক্য। দরবেশই হোক আর দরবেশের বাবাই হোক, বিনা টিকেটে রেলভ্রমণ করতে তিনি কাউকে দেবেন না। চেকারের সাধুতা আর কর্তব্য-পরায়ণতার এই অতি বাড়াবাড়িতে একদল যাত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক রেগে বললেন, "রেখে দিন মশাই আপনার ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির-গিরি। এমন এক আধজনা সাধু মহাপুরুষ বিনা টিকিটে রেলে চাপলে রেল কোম্পানী কিছু লাটে উঠবে না। আপনার একার পাগলামি জেদের দরুন আমরা এই এতগুলো লোক এখানে আটকে কষ্ট পাচ্ছি, সে কথাটা আপনি একবার বিবেচনা করছেন না? আপনার ঐ চুলচেরা যুধিষ্ঠির-

পনাই আপনার কাছে বড়ো হলো? ভারি যাচ্ছেতাই বে-আক্কেল লোক তো আপনি মশাই।"

তারপর যুধিষ্ঠিরপুত্র চেকারের ওপর ভরসা না রেখে গার্ডসাহেবের কাছে তিনি আরজি পেশ করলেন, "সাহেব, তুমি একবার এই দরবেশজীকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে গাড়িতে তুলে নাও, নইলে গাড়ি কিছুতেই চলবে না। ইনি নিশ্চয় কোন যোগী পুরুষ, মস্ত বড় গুণিন।"

"গুণিন? ইউ মীন উইজার্ড? ম্যাজিশিয়ান?" বললেন গার্ডসাহেব।

"হ্যাঁ সাহেব।" বললেন ভদ্রলোক। "এঁরা যাদুমন্তর দিয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারেন। ইনি নিশ্চয় মন্তর দিয়ে চাকা-বন্ধন করে দিয়েছেন, সে বন্ধন উল্‌টো মন্তর দিয়ে খুলে না দিলে চাকা ঘুরবে না, গাড়ি চলবে না।"

গাড়ি যে সত্যিই চলছে না তা নিজের চোখে দেখে গার্ডসাহেবের এই রহস্য-ময় দরবেশের অলৌকিক শক্তিতে একটু বিশ্বাস হয়েছিল। কামরূপ কামাখ্যার অদ্ভুত তন্ত্রমন্ত্রের কিছু কিছু কাহিনী তিনি শুনেছিলেন, ভেবে নিয়েছিলেন সে সব 'কক অ্যাণ্ড বুল স্টোরিজ', সব গাঁজাখুরি গল্প। এবার তাঁর মনে হলো হয়তো সেগুলো স্রেফ গাঁজাখুরি নয়। অন্তত এই অদ্ভুত লোকটাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে দেখাই যাক না গাড়ি চালু হয় কিনা। সাহেব দরবেশের সামনে গিয়ে বেশ ভদ্রভাবে হেসে রেলের কামরার ভেতরের দিকে দুহাতে ইশারা করে বললেন, "আইয়ে।" দরবেশ ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন "আই স্পীক ইংলিশ। আই ট্রাভেল্‌ড ইণ্ডিয়া, কাশ্মীর, বোম্বাই, হায়দারাবাদ, দিল্লী, লখ্‌নৌ, পাঞ্জাব, কামরূপ, কামাখ্যা।"

গার্ডসাহেব ইংরাজি ভাষায় দরবেশের অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে বললেন, "কাম ইন প্লীজ। লেট আস স্টার্ট। নো মোর ডিলে।" অর্থাৎ আসুন, আর দেরি নয়, এবার রওয়ানা হওয়া যাক।

কিন্তু গার্ডসাহেবের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না দরবেশ। যে তাঁকে নামতে বলেছিল সেই ক্ষমা চেয়ে তাঁকে ফের উঠবার আমন্ত্রণ জানালে তবেই তিনি উঠবেন; তা নইলে তিনি ট্রেনে উঠবেন না, চাকা-বন্ধনও খুলবেন না, ট্রেন আটকে থাকবে এই স্টেশনেই।

যাত্রীরা তখন মারমুখো হয়ে চেপে ধরলেন চেকারকে, ক্ষমা চাইতে হবে দরবেশের কাছে; এমনি ক্ষমা নয়, একেবারে নাকে খত দিয়ে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, "নাকে খতের দরকার নেই। যা নাক দেখছি, ওতে খত দিলে আর

থাকবে কি ? এমনিতেই মাফ চেয়ে ঠাণ্ডা করে ওঁকে গাড়িতে তুলে আমাদের রক্ষে করুন চেকার মশাই।"

এরপরও যুধিষ্ঠিরগিরি ফলাতে গেলেই যে তাঁর ওপর চাঁদা করে মার শুরু হবে, দেহের একটি হাড়ও আস্তো থাকবে না এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে এবং গার্ডসাহেবের আর স্টেশন-মাস্টারের সম্মিলিত ধমক খেয়ে চেকার ভদ্রলোক দরবেশের কাছে করযোড়ে ক্ষমা চাইলেন। ক্ষমা পেলেনও। চাকা-বন্ধন ছাড়িয়ে নিয়ে দরবেশ ট্রেনে উঠতে রাজী হলেন, কিন্তু সেজন্যে চেকারকে কড়ার করতে হল তিনি কোনো পীরের দরগায় সওয়া পাঁচ আনার সিন্নি দেবেন।

গাড়িতে উঠবার আগে হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এক খামচা ধুলো ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ডগার মাঝখানে তুলে নিলেন দরবেশ। তারপর জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে অদ্ভুত ঢঙে উচ্চারণ করলেন অদ্ভুততর রহস্যময় মন্ত্র :

"তেলিয়া মশান।
মরঘট্‌কা খোপ্‌রি, মরঘট্‌কা জ্ঞান।
আস্‌রে মাটি, ফাস্‌রে পৌন।
খুলে নারাসা, বাঁধে কৌন্ ?"

মন্ত্র পড়ে তুলে নেওয়া ধুলোর ওপর মন্ত্রপূত ফুঁ দিয়ে সেই ধুলো ছুঁড়ে মারলেন ইঞ্জিনের চাকা লক্ষ্য করে। ড্রাইভারের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "বন্ধন খুল দিয়া বেটা। অব ছুটেগি গাড়ি।"

শুনে শিহরিত হলো অনেকের অঙ্গ।

বন্ধনমোচন মন্ত্রের শেষ লাইনে নারাসা নাম শুনেই চমকে উঠলেন কয়েক-জন। ভক্তিময় আবেগে চীৎকার করে বলে উঠলেন, "ক্যা আপ্‌হী নারাসা হ্যায়, তক্‌মাওয়ালা সাঁই ?" অর্থাৎ আপনিই সেই নারাসা, যিনি তক্‌মাওয়ালা সাঁই নামে বিখ্যাত ?

দরবেশ হেসে বললেন, "হাঁ বেটা, ম্যায় হুঁ নারাসা। ম্যায় হুঁ তক্‌মাওয়ালা সাঁই।"

তখন বিস্মিত জনমণ্ডলীকে আরো বিস্মিত করে সেই মুগ্ধ কয়েকজন যা বলতে লাগলেন তার মানে হচ্ছে, "অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনার যাদু-খ্যাতি অনেক শুনেছি, কিন্তু চিনতে পারিনি আপনিই সেই অসাধারণ গুণিন, যাদু জগতের শাহেনশাহ নারাসা, তক্‌মাওয়ালা সাঁই।" অপরাধ ক্ষমা করলেন নারাসা তক্‌মাওয়ালা সাঁই। গার্ডের সঙ্গে চলে গেলেন গার্ডের কামরায়। হুইস্‌ল্

বাজিয়ে সবুজ নিশান উড়িয়ে দিলেন গার্ডসাহেব। দিয়ে প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করে রইলেন। বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হল না তাঁকে। একটু পরেই শোনা গেল ইঞ্জিনের কর্ণবিদারী সিটি, আর সেই সিটি থামবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল আওয়াজ : ঝিক্—ঝিক্—ঝিক্। ট্রেন চলতে শুরু করেছে !

কামরায় কামরায় জাগলো বিস্মিত আনন্দধ্বনি। গার্ডসাহেব তাঁর কামরায় উপবিষ্ট অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লোকটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "ওয়েল, আই অ্যাম ড্যাম্‌ড !" এটা তাঁর চরম বিস্ময়ের ভাষাগত প্রকাশ। প্রকাশও ঠিক নয়, প্রকাশের ক্ষীণ প্রচেষ্টা মাত্র। কোনো মানুষ মন্ত্রবলে রেলগাড়ির ইঞ্জিনকে হিপনোটাইজ করে ইঞ্জিনের চাকা আটকে রাখতে পারে, আবার ইচ্ছেমতো তাকে বন্ধনমুক্ত করে দিতে পারে, এ তিনি নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না।

শুধু গার্ডসাহেব নয়, আরো অনেকেই সেদিন যাদুকর নারাসা বা 'তক্‌মা-ওয়ালা সাঁই'য়ের অলৌকিক মন্ত্রশক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু মোটেই মুগ্ধ বা বিস্মিত হয়নি সেই ইঞ্জিন-ড্রাইভার, সেই ভ্রাম্যমাণ টিকেট চেকার এবং আরো দু-চারজন। এ নাটকে নিখুঁত অভিনয়ের জন্য এঁদের তক্‌মাওয়ালা সাঁইয়ের ভাণ্ডার থেকে গোপনে কিছু প্রাপ্তিযোগ ছিল।

পাঠক-পাঠিকারা আশা করি অনুমান করে নিতে পারবেন, প্রথম কাহিনীর ছেলে-হারানো বিধবা এবং গৃহস্থ ভদ্রলোক (সম্ভবত আরো কেউ কেউ) ঐ অলৌকিক ঘটনার আগে ও পরে যাদুকর তক্‌মাওয়ালার কাছ থেকে গোপনে কিছু নগদ বখশিশ পেয়েছিল।

খেয়ালী যাদুকর

"The more I see of men, the more I love my dog" অর্থাৎ "মানুষের পরিচয় যত বেশি পাই, আমার কুকুরটিকে আমি ততই বেশি ভালবাসি।" এই স্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন পাশ্চাত্য যাদুজগতের একজন অবিস্মরণীয় দিক্‌পাল – "লাফায়েৎ" (The Great Lafayette)। শেক্‌স্‌পীয়রের "টাইমন অভ এথেন্‌স্‌" নাটকের নায়ক টাইমনের মত যাদুকর লাফায়েৎও কি মানব চরিত্রের কদর্যতার পরিচয় পেতে পেতে ঘোর মানব-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন ? না এ উক্তিটি তাঁর একটি 'পাবলিসিটি স্টাণ্ট' বা প্রচার-কৌশল, অদ্ভুত কথার খোঁচায় চমক লাগিয়ে দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে নাম করবার চেষ্টা ? সে যাই হোক, লাফায়েৎ-এর বাড়ির দরজায় তাঁর প্রিয় কুকুর 'বিউটি'-র ছবির তলায় উক্ত খোঁচা-মারা উক্তিটি খোদাই করা ছিল এবং কলিংবেল টিপতে গেলেই চোখে পড়ত।

কুকুর-ভক্তিতে বোধ হয় যাদুকর লাফায়েৎকে চিরকালের চ্যাম্পিয়ন বলা যেতে পারে। তাঁর চেক, চিঠি লিখবার কাগজ, যাদুপ্রদর্শনের চুক্তিপত্র ইত্যাদির ওপর তাঁর প্রিয় কুকুর 'বিউটি'-র ছবি ছাপা থাকত। লাফায়েৎ-ভবনে বিউটির জন্যে আলাদাভাবে একটি চমৎকার শৌখিন স্নানাগার তৈরি হয়েছিল। শৌখিন অভিজাত হোটেলে যেমন খানা দেওয়া হয়, তেমনি খানা দেওয়া হত বিউটিকে। রীতিমত মানুষি কায়দায় চেয়ার-টেবিলে খানা খেত 'বিউটি'; খাবার সময় 'বাট্‌লার' (ভৃত্য) এসে বিউটির গলার সামনে রুমাল ঝুলিয়ে দিয়ে যেত। কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হলো, কিন্তু এ থেকেই লাফায়েৎ-এর সৃষ্টিছাড়া কুকুর-ভক্তি বা কুকুর পাগলামির রকম বোঝা যাবে। তিনি বলতেন, "বিউটি না থাকলে আমার জীবন শূন্য, অর্থহীন, বিফল। বিউটি বিহনে আমার বাঁচা অসম্ভব।" আশ্চর্যের বিষয়, বিউটি বিহনে বেশিদিন বাঁচেন নি লাফায়েৎ। বিউটির মৃত্যুর এক হপ্তার ভেতর তাঁর মৃত্যু হয় এবং সে মৃত্যু সাধারণ ভাবে হয়নি।

মৃত্যুর কথা পরে বলবো। আগে বলি তাঁর জীবনের কথা। "লাফায়েৎ" নামটি যাদুজগতের জন্যে বেছে নেওয়া তাঁর পেশাদারি ছদ্মনাম। ভদ্রলোকের আসল, অর্থাৎ পিতৃদত্ত নাম সিগমুণ্ড নয়বার্গার (**Sigmund Neuberger**)।

তিনি জাতিতে জার্মান, জন্ম ১৮৭২ সালে জার্মানির মিউনিক (Munchen) শহরে। বাল্যকাল থেকেই তিনি বিষণ্ণভাব, স্বল্পভাষী, অদ্ভুত রকম খেয়ালী। অল্প বয়সেই তিনি জার্মানি ছেড়ে চলে এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ছবি আঁকার হাত ছিল চমৎকার; জীবিকা অর্জনে সে হাত তিনি কাজে লাগালেন, হলেন দৃশ্যপট-শিল্পী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শৌখিন এবং সূক্ষ্ম চারুশিল্প টাকা আনবে না, শিল্পের সাহায্যে টাকা রোজগার করতে হলে সূক্ষ্মতা ছেড়ে শিল্পকে ব্যবসায়ে পরিণত করতে হবে। বিভিন্ন রঙ্গালয়ে দৃশ্যপট-শিল্পীর কাজে বেশ সাফল্য লাভ করে এবং বিভিন্ন যাদুকরের যাদুপ্রদর্শনী দেখে পেশা হিসেবে যাদুবিদ্যার অর্থকরী সম্ভাবনার কথাটা তাঁর মনে জাগলো। দৃশ্যপট আঁকার পেশা ছেড়ে পেশাদার যাদুকর হবেন, এই সিদ্ধান্ত করলেন তিনি। শোনা যায় তাঁর প্রথম খেলাটি তৈরি করে দিয়েছিলেন বিখ্যাত যাদুকর হোরেস গোল্ডিন।

যাদুর পেশা নিয়ে প্রথম কিছুদিন তিনি মার্কিন মুলুকেই কাটালেন ছোটো ছোটো শহরে যাদুপ্রদর্শন করে। হস্ত কৌশলের খেলার বদলে তিনি বড়ো বড়ো যাদুর খেলাই (যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'ইলিউশন') দেখিয়ে গেছেন; কারণ তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল দর্শকদের সামনে চোখজুড়ানো, চোখধাঁধানো, চমক-লাগান জমকাল প্রদর্শনী উপস্থাপিত করা, যাদুর খেলাটি উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রমোদপ্রিয় জনসাধারণ যারা রঙ্গালয়ে ভিড় করে, তাদের মুগ্ধ, আকৃষ্ট করবার সেরা উপায় হচ্ছে জমকাল দৃশ্য এবং সঙ্গীত দিয়ে তাদের চোখ আর কানকে খুশী করা। তিনি নিজে ছিলেন বিশিষ্ট দৃশ্যপটশিল্পী, বিভিন্ন রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে থেকে মঞ্চসজ্জা সম্বন্ধেও তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। এ অভিজ্ঞতা—বলাই বাহুল্য—তাঁর নিজের যাদুপ্রদর্শনীকে জমকাল করে তুলতে খুবই কাজে লেগেছিল। বিচিত্র, নয়নাভিরাম মঞ্চসজ্জা এবং দৃশ্যপটের সঙ্গে লাফায়েৎ যুক্ত করলেন তাঁর নিজস্ব অর্কেস্ট্রা, তাতে বহু বিচিত্র রকমের সঙ্গীতযন্ত্র এবং শব্দযন্ত্রের সমাবেশ।

দৃশ্যপটশিল্পী সিগমুণ্ড নয়বার্গার হয়ে গেলেন যাদুকর "লাফায়েৎ"। আমেরিকা ও ফ্রান্স দেশের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন বিখ্যাত ফরাসী সেনাধ্যক্ষ লাফায়েৎ (১৭৫৭—১৮৩৪) আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকানদের পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই নামটিই সিগমণ্ড নয়বার্গার বেছে নিয়েছিলেন তাঁর যাদুকর জীবনের পেশাদারি নাম হিসেবে।

মার্কিন মুলুকে প্রাথমিক যাদুপ্রদর্শনী সফরে লাফায়েৎ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারেননি, অর্থাৎ সোজা ভাষায় বলতে গেলে পসার জমাতে পারেননি। তা হলেও এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতায় খুব কাজ হয়েছিল ; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি ঠিক রাস্তা ধরেছেন এবং ঠিক ভাবেই অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি তাঁর যাদুপ্রদর্শনীর দৃশ্যপট এবং মঞ্চসজ্জা আরো বিচিত্র, আরো জমকাল করলেন, তাঁর অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতকেও আরো জোরাল করলেন। এমন বিরাট জাঁকজমক সারা ইউরোপে অন্য কোনো যাদুকরের যাদুপ্রদর্শনীতে দেখা যায়নি, এমনি প্রদর্শনী নিয়ে লাফায়েৎ এলেন ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডনে। এখানে এসেই তাঁর বরাত খুলে গেল। লণ্ডন হিপোড্রোম সার্কাসে যে খেলাটি দেখিয়ে তিনি বাজিমাত করলেন সেটি কিন্তু একটি অতি সাধারণ খেলা—একটি শূন্য সিলিণ্ডার বা চোঙা থেকে দুটি মানব শিশু বার করা। এই একটি খেলাই তাঁকে দ্রুত এগিয়ে দিল জয়যাত্রার পথে।

খেলাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করি। আলখাল্লা পরে রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হলেন যাদুকর লাফায়েৎ, একটা বেশ বড়ো রকমের সিলিণ্ডার অর্থাৎ চোঙা নিয়ে, যার দুমুখ খোলা। সেইটি খালি দেখিয়ে তিনি মাটির ওপর খাড়া করে রাখলেন। চোঙটির ভেতর কিছু নেই—কিন্তু কি আশ্চর্য! চোঙটি খাড়া ওপর দিকে তুলে নিতেই দেখা গেল একটি ছোটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। দর্শকগণ বিস্মিত। ছেলেটিকে ওপর দিক থেকে চোঙার ভেতর নামতে দেখা যায়নি। তলার মাটি থেকেও ছেলেটি ওঠেনি। তবে এলো কোথা থেকে, আর কোন পথে কেমন করে গেল চোঙার ভেতরে? ছেলেটির একটু দূরে মাটির ওপর চোঙাটি খাড়া করে রেখেছিলেন লাফায়েৎ। চোঙাটি আবার ওপর দিকে তুলে নিতেই দেখা গেল দাঁড়িয়ে হাসছে একটি ছোট্ট মেয়ে। কি আশ্চর্য! এই মেয়েটি এলো কোথা থেকে?

যদি কেউ আন্দাজ করে থাকেন এ দুটি রহস্যময় আগন্তুক লুকিয়েছিল যাদুকরের ঢিলেঢালা বিরাট আলখাল্লার তলায়, তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী অসামান্য সদয় হলেন লাফায়েৎ-এর প্রতি। প্রমোদপ্রিয় হুজুগভক্ত জনসাধারণ এমন জমকালো যাদুপ্রদর্শনী আর কখনো দেখেনি। যাদুকর লাফায়েৎ-এর খ্যাতি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। স্রোতের মতো টাকা আসতে লাগল তাঁর পকেটে। এই আশাতীত সাফল্যের ফলেই বোধ করি তাঁর স্বভাবগত খামখেয়ালি দ্রুতবেগে পাগলামির দিকে ছুটে চলল। তাঁর

দাবিও বেড়ে গেল। লণ্ডনের হবর্ন এম্পায়ার রঙ্গালয়ে যাদু-প্রদর্শনের আমন্ত্রণ এলে তিনি সাপ্তাহিক সাড়ে সাতশো পাউণ্ড দক্ষিণা এবং কমপক্ষে দু সপ্তাহের চুক্তি দাবি করলেন। রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে পাঁচশো পাউণ্ডের বেশি দিতে রাজী হলেন না, কিন্তু দু সপ্তাহের জন্য রঙ্গালয়টি লাফায়েৎ-এর হাতে এই শর্তে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন যে তিনি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কর্তৃপক্ষকে দেবেন, তারপর যত টাকা তিনি লাভ করতে পারেন করবেন। লাফায়েৎ-এর ছিল অসীম আত্মবিশ্বাস; দর্শকেরা কি চায় তা তিনি জানতেন, আর তাদের ঠিক পছন্দমতো জিনিসটি তিনি দিতে জানতেন। তিনি প্রচণ্ড আর্থিক ঝুঁকি সত্ত্বেও এই শর্তে রাজী হয়ে গেলেন। শুরু হলো হবর্ন এম্পায়ারে লাফায়েৎ-এর নিজস্ব পরিচালনায় তাঁর যাদু-প্রদর্শনী। চুক্তির মেয়াদের শেষে দেখা গেল লাফায়েৎ-এর মুনাফা হয়েছে ষোলো শো চল্লিশ পাউণ্ড, মোট দক্ষিণা তিনি যা চেয়েছিলেন তার চাইতে প্রায় দেড়শো পাউণ্ড বেশী! এর ফলে রঙ্গালয় জগতে তাঁর কদর বেড়ে গেল অসাধারণ ভাবে; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খামখেয়ালি দেমাকের দাপটও বেড়ে গেল। তাঁর সহকারীরা সবাই সামরিক কায়দায় পোশাক পরতে লাগল; সামরিক আদবকায়দায় রপ্ত হল; লাফায়েৎ যেন তাদের সেনাপতি, এইভাবে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সামরিক কায়দায় কুর্নিশ করতে লাগল। বলা বাহুল্য, এর পেছনে ছিল খেয়ালী যাদুকর লাফায়েৎ-এর নির্দেশ। এটা হয়তো অনেকের কাছেই বেশী রকম বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে, কিন্তু এক হিসেবে এই বাড়াবাড়িই ছিল তাঁর অসামান্য সাফল্যের মূল। তাছাড়া তিনি 'ডিসিপ্লিন' অর্থাৎ সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতায় একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন, এ তারই অভিব্যক্তি। অভূতপূর্ব জাঁকজমকের আবহাওয়ায় নিজেকে ঘিরে রেখে শিল্পী হিসেবে যাদু-করের মর্যাদা সাধারণের চোখে অনেক বাড়িয়ে দিলেন, শুধু তাই নয়, রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষদেরও লাফায়েৎই প্রথম সচেতন করে দিয়েছিলেন, যে একজন প্রথম শ্রেণীর যাদুকর মোটা দক্ষিণা দাবি করবার অধিকারী। সেরা যাদুকরদের মোটা দক্ষিণা প্রাপ্তির রাস্তা লাফায়েৎই সর্বপ্রথম খুলে দিয়েছিলেন, সেজন্য যাদুকর মহল তাঁর কাছে ঋণী। এমন কি পরে অদ্বিতীয় হ্যারি হুডিনি যে অসামান্য উঁচু হারে দক্ষিণা দাবি করেছেন এবং পেয়েছেন তা বোধ হয় সম্ভব হতো না, যদি তার আগে লাফায়েৎ এর পত্তন করে না যেতেন। তবু কিন্তু যাদুকর মহলে লাফায়েৎ ছিলেন অত্যন্ত অপ্রিয় পাত্র। এর কারণ তিনি অন্যান্য যাদুকরের প্রতি গভীর অবজ্ঞা প্রকাশ করে তাঁদের সংস্পর্শ পরম যত্নে এড়িয়ে চলতেন।

শুধু তিনজন অসামান্য যাদুকরের সঙ্গেই ছিল লাফায়েৎ-এর বিশেষ অন্তরঙ্গতা। তাঁরা হচ্ছেন আমেরিকার হ্যারি হুডিনি (Harry Houdini) ও হোরেস গোল্ডিন (Horace Goldin) এবং ইংল্যাণ্ডের জন নেভিল ম্যাস্কেলিন (John Nevil Maskelyne)।

লাফায়েৎ-এর আরেকটি বিশেষত্ব—বৃহৎ যাদু-প্রদর্শনীতে মানবেতর প্রাণী অর্থাৎ জানোয়ারের ব্যবহার তিনিই প্রথম করেন। তাঁর একটি জমকালো খেলায় একটি সাদা ঘোড়া মঞ্চে আবির্ভূত হতো। (কোনো কোনো মহলে একটি কিম্বদন্তী চালু আছে এই ঘোড়াটিই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। সে কাহিনী পরে বলছি।) এছাড়া কুকুর, বেড়াল প্রভৃতি অন্যান্য জানোয়ারও ব্যবহৃত হতো, যার ফলে লাফায়েৎ-এর যাদু-প্রদর্শনীটিকে প্রায় একটি ছোটোখাটো যাদু-সার্কাস বলা যেতে পারত।

লাফায়েৎ-এর প্রিয় কুকুরটির কথা আগেই বলেছি। এটি খুব বাচ্চা বয়সে তাঁর কাছে এসেছিল উপহার হিসেবে, যাদুকর হ্যারি হুডিনির কাছ থেকে। কুকুরটির 'বিউটি' অর্থাৎ সৌন্দর্য যে খুব ছিল তা নয়; কিন্তু কানা ছেলের পদ্মলোচন নামের মতোই লাফায়েৎ কুকুরটির নাম দিয়েছিলেন 'বিউটি'। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি অসামান্য 'বিউটি'-ভক্ত হয়ে উঠলেন সে কথাও বলেছি। তাঁর বিশ্বাস ছিল 'বিউটি' জগতের অদ্বিতীয় কুকুর, অমনটি আর কখনো হয়নি, হবে না, হতে পারে না। একবার একটি যুবক—লাফায়েৎ-এর মেজাজ সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল ছিল না—লাফায়েৎ-এর সামনেই 'বিউটি'র চেহারার বিরূপ সমালোচনা করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশর্মা লাফায়েৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বেয়াদব ছোকরাকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি লাফায়েৎ ছিলেন নেপথ্যবিলাসী, অমিশুক, অসামাজিক মানুষ। কিন্তু তাই বলে সুন্দরী নারীর সাহচর্য যে তিনি খুব অপছন্দ করতেন তা নয়। তাছাড়া অসামান্য যাদুকর লাফায়েৎ-এর যাদু-প্রদর্শনী দেখে যত, তার চাইতেও বেশী যাদুমঞ্চে তাঁর চেহারার এবং ব্যক্তিত্বের যাদুতে মুগ্ধ হবার মতো সুন্দরীর অভাব হয়নি। বহু রোমান্স-পিয়াসিনী সুন্দরীর চোখে তিনি ছিলেন অসামান্য সুপুরুষ, এমন অদ্বিতীয় পুরুষের সাহচর্যের জন্য অনেক সুন্দরীই লালায়িত ছিল।

একদিনের কাহিনী বলি। শিকাগো শহরের একটি অভিজাত রেস্তোরাঁ। সে শহরে তখন কয়েকদিন ধরে লাফায়েৎ-এর যাদু-প্রদর্শনী চলেছে; লাফায়েৎ-

-এর জয়জয়কার। রেস্তোরাঁয় এক টেবিলে মুখোমুখি বসে খানাপিনা এবং অন্তরঙ্গ রসালাপ করছেন যাদুকর লাফায়েৎ এবং শিকাগো শহরের একজন সুন্দরী সুবেশা তরুণী মহিলা। ভদ্রমহিলার সঙ্গে লাফায়েৎ-এর খাতির হয়েছে খুবই সম্প্রতি।

কি ছিল বিধাতার মনে, ঠিক এই সময়ে এই রেস্তোরাঁয় এসে হাজির হলেন ভদ্রমহিলার স্বামী। তিনি জানেন তাঁর স্ত্রী অন্যত্র গেছেন একটি ফ্যাশান প্রদর্শনীতে; ভদ্রমহিলা স্বামীকে ভাঁওতা দিয়ে সেখানে যাবার নাম করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। ভদ্রলোক যা দেখলেন তাতে প্রথমে চক্ষুস্থির, তারপরই মন অস্থির হয়ে উঠল। তিনি মনে মনে বললেন এইবার হাতে নাতে ধরে ফেলেছি। একটা বিহিত আজ করতেই হবে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তিনি টোকা দিলেন লাফায়েৎ-এর পিঠে। কঠোর কণ্ঠে বললেন, "মশায়ের কি জানা আছে এই ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী?"

"তাই নাকি?" বলে ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকিয়ে পরম তাচ্ছিল্যভরে চোখ ফিরিয়ে নিলেন লাফায়েৎ। যা করছিলেন তাই করতে লাগলেন, ভদ্রলোককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

ভয়ানক চটে গেলেন ভদ্রলোক। তাছাড়া আত্মসম্মানেও ঘা লাগাল তাঁর। তিনি বললেন, "আমার অনুমতি না নিয়েই আপনি আমার স্ত্রীকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় খেতে আসেন কোন সাহসে?"

লাফায়েৎ মুখে কোনো জবাব দিলেন না। জবাব দিল তার হাতের একটি প্রচণ্ড ঘুঁষি। জবাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভূমিশয্যায় শয়ান হয়ে পড়ে রইলেন ভদ্রলোক। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলেন তখন রেস্তোরাঁর একজন কর্মচারী এসে রুদ্রমূর্তিতে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "মহামান্য লাফায়েৎ আমাদের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক, আপনি আমাদের রেস্তোরাঁয় এসে তাঁর গায়ে হাত তুললেন কোন্ সাহসে?" ঘা-খাওয়া স্বামী বেচারারই তখন আসামী অবস্থা। হায় বেচারা স্বামী!

লাফায়েৎ-এর জীবনের কথা এই পর্যন্তই থাক। এবারে তাঁর মৃত্যুর কাহিনী বলি। শহর এডিনবরা (স্কটল্যাণ্ড)। তারিখ ৯ই মে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ। এম্পায়ার থিয়েটারে চলছে লাফায়েৎ-এর যাদু-প্রদর্শনী। স্টেজের সামনে ঝুলানো পর্দায় কি করে হঠাৎ আগুন লেগে গেলো সে রহস্যের সমাধান আজও হয়নি। দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়লো আগুন। সেই আগুনে পুড়ে মারা গেলেন লাফায়েৎ।

খবরের কাগজে আবেগপূর্ণ ভাষায় প্রকাশিত তাঁর মহা-মৃত্যুর কাহিনী পড়ে

পাঠক-পঠিকারা অনেকে অশ্রু-সংবরণ করতে পারলেন না। তাঁরা জানলেন সেই দাউ দাউ অগ্নিকুণ্ড থেকে বহু কষ্টে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন লাফায়েৎ। কিন্তু বেরিয়েই তাঁর মনে পড়ে গেলো তাঁর পরম স্নেহাস্পদ সাদা ঘোড়াটি, তাঁর যাদুজীবনের দীর্ঘকালের সাথী, ঐ অগ্নিকুণ্ডের ভেতরে আটকা পড়ে আছে। নিজের প্রাণের মায়া অনায়াসে ত্যাগ করে তিনি ছুটে ফিরে গেলেন সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের ভেতর, মৃত্যুর মুখ থেকে তার প্রিয় ঘোড়াটিকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে। কিন্তু সেই যে গেলেন, আর বেরিয়ে আসতে পারলেন না সেই আগুনের গোলোক-ধাঁধা থেকে। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আগুনে পুড়ে মরলেন।

লাফায়েৎ-এর মৃত্যুর প্রকৃত কাহিনীটি কিন্তু অতো রোমান্টিক নয়। অথবা হয়তো আরো বেশি রোমান্টিক। স্টেজের ভেতর দিকে একটি খিড়কি দরজা ছিল ওদিকে যাতায়াতের একমাত্র পথ। যাদু-প্রদর্শন চলতে থাকার সময় পাছে কেউ চুরি করে চুপি চুপি ঐ পথে ঢুকে পড়ে কোনো খেলার গুপ্ত কৌশল জেনে ফেলে, এই ভয়ে খুঁতখুঁতে খেয়ালী লাফায়েৎ ঐ দরজাটিকে তালাবন্ধ করে রাখতেন। সেদিনও দরজাটি তাঁর নির্দেশ মতো তালাবন্ধ ছিল। অগ্নিকুণ্ড থেকে ঐ পথে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন ওপর তালাবন্ধ; খুলবার উপায় নেই। ছুটে এলেন স্টেজের ভেতর। জলন্ত পর্দার দরুণ এদিকেও পালাবার পথ বন্ধ। ধোঁয়ার আগুনে দিশাহারা হয়ে পড়ে গেলেন অসহায়ভাবে। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তিনি নিজেই জেদ করে পিছনের দরজাটি তালাবন্ধ করিয়ে রেখেছিলেন। নিজের এই খুঁতখুঁতে খামখেয়ালির ফলেই অগ্নিকাণ্ডে তাঁর মৃত্যু হলো।

আগেই বলেছি, সাতদিনের ভেতর মৃত্যু হয়েছিল বিউটির আর লাফায়েৎ-এর, প্রভুভক্ত কুকুরের আর কুকুরভক্ত প্রভুর। এডিনবরায় দুজনের কবর পাশা-পাশি। মৃত্যুর অনেক আগেই লাফায়েৎ আগাম ইচ্ছা প্রকাশ করে রেখেছিলেন তাঁর সমাধির ওপর যেন তাঁর প্রিয় কুকুর 'বিউটির প্রতিকৃতি খোদাই করা থাকে। তাঁর সে ইচ্ছা রক্ষিত হয়েছে। 'মহান' লাফায়েৎ-এর (Great Lafayette) সমাধিতে এসে এখনো অনেক যাদুকর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যান।···

অন্য কোনো যাদুকরের কোনো উক্তিই এমন কায়েমি খ্যাতি লাভ করে নি, যেমন করেছে লাফায়েৎ-এর উক্তি :

"The more I see of men,
the more I love my dog."

আরেকটি চমৎকার উক্তি মনে পড়ছে :

"আপ্না দিল্ সাফ রাখ্না, ঔর দুসরেকী পাকিট সাফ করনা।"

অর্থাৎ—, "হরদম সাফ রেখে আপনার চিত্ত
পরের পকেট সাফ করে যাও নিত্য।"

উক্তিটি কলকাতার ইউসুফ ওস্তাদের। শুনেছি সাকরেদদের উদ্দেশে এই ছিল তার বাণী, তার নিজের জীবনের এই ছিল আদর্শ। বহু পকেট-সাফের মূলে ছিলো তার প্রতিভা, কিন্তু আপন চিত্তটিকে সে বরাবর মুক্ত রেখেছিল মালিন্যের স্পর্শ থেকে। (ব্র্যাকেটে বলে রাখি এ কাহিনী যাঁর কাছে শুনেছি, ইউসুফের আসল নাম তিনি আমাকে বলেন নি।)

হাত-সাফাইতে ইউসুফ ছিল অসাধারণ সিদ্ধহস্ত। টাকাপয়সা, বিড়ি, দিয়াশলাই, গুলি, বোতাম, আংটী প্রভৃতি ছোটোখাটো খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে শুধুমাত্র হাতের কায়দা আর ধোঁকাবাজির সাহায্যে সে এমন সব অদ্ভুত ভেলকি দেখাতো যে দর্শকেরা তাই দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকতো।

শোনা যেতো হাতসাফাইয়ের যাদুকর ইউসুফের সঙ্গে কলকাতার তখনকার নামকরা গুণ্ডাসর্দারদের খুব খাতির এবং কলকাতার একাধিক মহাবিদ্যার আখড়ায় ইউসুফ ওস্তাদ পকেটমারা এবং আনুষঙ্গিক হাতসাফাইয়ের তালিম দিয়ে থাকে। এই সন্দেহ-ভিত্তিক দুর্নামের জন্যই গুণী যাদুশিল্পী হিসেবে সুধীসমাজে প্রাপ্য সুনাম সে অর্জন করতে পারেনি। সেজন্য তার কোনো ক্ষোভ ছিলো না, কারণ এই সুনামের লোভও তার ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। হস্ত-কৌশল-প্রধান যাদুর খেলায় (sleight-of-hand conjuring) তার অসামান্য দক্ষতা থাকলেও যাদুবিদ্যাকে প্রত্যক্ষভাবে অর্থ উপার্জনের উপায়রূপে সে গ্রহণ করেনি, যাদুবিদ্যা ছিল নিতান্তই তার খেয়ালখুশি, হবি বা শখের ব্যাপার। এ হিসেবে তাকে বলা যেতো 'অ্যাম্যাটিউর ম্যাজিশিয়ান'।

ইউসুফের চরিত্র ছিল খামখেয়াল-প্রধান। আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি "না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়।" ইউসুফের মনে এ ধরণের ছোটো-খাটো সংকীর্ণতা ছিল না। তার প্রশান্ত চিত্তে এই বিশ্বাস ছিল যে পরের দ্রব্য নেবার সেরা উপায় হচ্ছে না-বলে নেওয়া ; কারণ বলে নিতে গেলেই বিভিন্ন রকমের বাধা, বিরোধ বা মনোমালিন্য আসতে পারে। না বলে এবং

না জানিয়ে পরের দ্রব্য পরম বেমালুমভাবে আপন করে নেবার জন্যে চাই পাকা হাতসাফাই ; আর সেইজন্যেই প্রয়োজন পাকা তালিমের।

ইউসুফ ওস্তাদের গোপন দান কিছু ছিল কিনা জানি না ; প্রকাশ্যে সে যে দান করতো সে দান যাদুক্রীড়ার ছদ্মবেশে। একবার এক বৃদ্ধা জরাজীর্ণা ছিন্নবসনপরিহিতা পথের ভিখারিনীকে কিছু অর্থ দেবার ইচ্ছা হলো যাদুশৌখিন ইউসুফের। ইউসুফ বললে, "বুড়ি মা, তোমার আঁচলে ও কি বাঁধা রয়েছে ?"

"কই, কিছুইতো নয় বাছা।" বললে ভিখারিনী। সত্যি কথাই, কিছু বাঁধা ছিল না বুড়ির আঁচলে।

দুহাত উল্‌টে পাল্‌টে খালি দেখিয়ে ওস্তাদ ইউসুফ বুড়ির আঁচল ধরে ধীরে ধীরে ঝাড়তেই মুদ্রাবৃষ্টি—পয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকি, আধুলি, টাকা। বুড়ির চক্ষু চড়কগাছ। একি ভূতুড়ে কাণ্ড ? না না, ভূতুড়ে কাণ্ড নয়, এ খোদ খোদার মেহেরবানি, বুড়িকে বোঝালে ইউসুফ। ঈশ্বরের আশীর্বাদী মুদ্রাগুলো বুড়ির ঝুলিতে ভরে দিলে আপন হাতে।

বুড়ি চলে গেলো ইউসুফকে আশীর্বাদ করতে করতে, খোদার অলৌকিক মেহেরবানিতে মুগ্ধ হয়ে ; বুঝলে না সে যা আঁচল ভরে নিয়ে গেলো, তার মূলে হয়তো খোদারই মেহেরবানি, কিন্তু তা এসেছে ইউসুফেরই পকেট থেকে।

এতিমখানার জন্যে চাঁদা দিতে হবে ? ওসব খয়রাতি ফয়রাত্তির ভেতর নেই ইউসুফ ওস্তাদ। ইউসুফের পকেটে পয়সার কিছু বাহুল্য ঘটে নি, আর পয়সা অতো শস্তা নয় যে দাও বললেই অমনি উপুড়হস্ত হওয়া যাবে। সুতরাং ইউসুফ করলে কি ? না, তুলে নিলে একফালি শাদা কাগজ, তাকে কাটলে দশ টাকার নোটের সাইজ করে। সেই সাইজ করে কাটা কাগজ ভাঁজ করে দুহাতে ঘষতে ঘষতে কি সব দুর্বোধ্য মন্ত্র পড়লে ইউসুফ, তার ফল হলো অদ্ভুত। কাগজখানার ভাঁজ খুলতেই দেখা গেলো শাদা কাগজের ফালিটি পরিণত হয়েছে একখানা আস্ত দশটাকার নোটে।

নোটখানা এতিমখানার চাঁদা-সংগ্রাহকের হাতে দিলে ইউসুফ ওস্তাদ। বিস্মিত মৌলভী সাহেব উল্‌টে পাল্‌টে দেখে আরো বিস্মিত হলেন। এ যে সত্যি দশ টাকার নোট। "হ্যা বাবা ইউসুফ, এ নোট ঠিক নোট তো ? ঠিক চলবে তো বাবা ?"

"বিল্‌কুল ঠিক। বিল্‌কুল চলবে মৌলভী সাহেব।" হেসে বললে ইউসুফ। সে হাসি অভয়দানের হাসি।

ইউসুফের জবানের ওপর অসীম আস্থা মৌলভী সাহেবের, যেমন আস্থা অন্য সবারই – যে কেউ এসেছে ইউসুফের সংস্পর্শে। এতিখানার ফাণ্ডে খাঁটি দশ টাকা জমা বাড়লো, এতে তাঁর আর সন্দেহ রইলো না। আর নিঃসন্দেহ হবার সঙ্গে সহসা একটা রঙীন, আশা-মধুর কল্পনায় ভরে উঠলো এতিমখানার বাপ-মা-হারা অনাথদের অন্যতম অভিভাবক মৌলভী সাহেবের মন। ইউসুফের হাতের অনেক অদ্ভুত খেলা দেখে অনেকবার তাক লেগেছে তাঁর, কিন্তু ইউসুফের হাতের যাদুতে যে শাদা কাগজের টুকরো অমন অনায়াসে দশ টাকার নোটে পরিণত হয়, এ তিনি প্রথম জানলেন। তাহলে আর এতিমখানার ফাণ্ডের জন্যে ভাবনা কি? সাইজ মতো কাগজ কেটে কেটে ইউসুফের হাতের যাদুতে নোটের পর নোট যতো খুশি বানিয়ে নিলেই তো হবে। আবেগে ইউসুফের হাত চেপে ধরলেন তিনি। বললেন, "আরো আরো আরো নোট, এমনি করে বানিয়ে দাও বাবা ইউসুফ। এতিমখানার কচি কাঁচাগুলোর একটু হাল ফেরাই, আর – "

ইউসুফ হাত জোড় করে বললে, "এ নোট তো সহজে তৈরি হয় না মৌলভী সাহেব, এক একটি নোট বানাতে আমার আধ সের রক্ত জল হয়ে যায়।"

অর্থাৎ আরো নোট বানাতে গেলে তার গায়ের আরো রক্ত জল হবে। তাতে ইউসুফের আপত্তি বোধ করা অসম্ভব বা অন্যায় নয়। সুতরাং তখনকার মতো ঐ একখানা দশটাকার নোট নিয়েই বিদায় হলেন এতিমখানার সেবাব্রতী মৌলভী সাহেব।

উনিশ শতকের শেষদিকের বিখ্যাত ইংরেজ যাদুকর চার্লস বারট্রামের (ব্যক্তিগত জীবনে জেমস্ ব্যাসেট) শখ বা খেয়াল ছিল নানারকমের ঠক এবং জুয়াড়িদের কার্যকলাপ এবং হস্তকৌশল পর্যবেক্ষণ করে সেগুলোকে যাদু-শিল্পের উপযোগী করে নেওয়া। লণ্ডন শহরের পার্কে এবং পথের ধারে তিনি পেশাদার জুয়াড়ি বা জুয়াচোরদের যে "তিন তাসের খেলা" দেখেছিলেন তার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। এ খেলাটি 'থ্রি কার্ড ট্রিক' (Three card trick), 'থ্রি কার্ড মণ্টি' (Three card monte) বা 'ফাইণ্ড দি লেডি' (Find the lady) নামে খ্যাত।

খেলাটি নির্দোষ শৌখিন বা পেশাদার যাদুকরের হাতে যেমন দর্শকদের বিস্ময় এবং আমোদ যোগাতে পারে, তেমনি হাতসাফাই-বিশারদ পেশাদার জুয়াড়িরা এই খেলাটির সাহায্যে লোক ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করে। বিশ্বের ঠকবাজদের

ভেতর হয়তো ভাবের আদান প্রদান আছে, অথবা ওদের চিন্তাধারায় আশ্চর্য রকমের মিল আছে। যাদুকর চার্লস বারট্রাম এবং চার্লস কার্টার ("কার্টার দি গ্রেট," যিনি এ শতাব্দীর দ্বিতীয় সিকি ভাগে এদেশে খেলা দেখিয়ে গেছেন) বর্ণিত এবং ব্যাখ্যায়িত এই তিন তাসের খেলা আমি কলকাতা শহরের ফুটপাথেও একাধিকবার দেখেছি।

এ-খেলায় ব্যবহৃত হয় তিনটি তাস—একটি বিবি এবং দুটি অন্য (ছবিহীন) তাস। মনে করে নেওয়া যাক জুয়াড়ি ফুটপাথে বসেছে খেলা দেখাতে। আপনাদের দেখিয়ে একটি একটি করে তিনটি তাস সে উপুড় করে পাশে পাশে এক সারিতে ফেলবে। আপনাদের কাজ হচ্ছে তিনটির ভেতর কোনটি বিবি সেটা ঠিক রাখা। মনে করা যাক আপনারা পরিষ্কার দেখলেন বিবি তাসটিকে রাখা হয়েছে অন্য দুটি তাসের মাঝখানে। আচ্ছা বেশ, এইবার খুব হুঁশিয়ার হয়ে লক্ষ্য রাখুন। জুয়াড়ি ধীরে ধীরে তিনটি তাসের জায়গা অদল বদল করবে। (বলা বাহুল্য, তিনটি তাসেরই পেছন দিকটি থাকবে ওপর দিকে।) কিছুক্ষণ পর বাজি ধরা হবে। জুয়াড়ি বলবে, "বলুন এবার, কোন তাসটা বিবি?"

"এইটে বিবি।" বলে কোনো দর্শক একটি তাসের ওপর কিছু টাকা রাখলে পর তাসটি উল্টে যদি দেখা যায় সেটি অন্য তাস, তাহলে দর্শকের রাখা ঐ টাকাটা বাজেয়াপ্ত হয়ে চলে যাবে জুয়াড়ির পকেটে। দর্শক বাজি হারলেন। আর যদি দেখা যায় তাসটি সত্যিই বিবি, তাহলে দর্শক বাজি জিতলেন। যতো টাকা বাজি রেখেছেন ঠিক ততো টাকা জুয়াড়ির পকেট থেকে আসবে দর্শকের পকেটে। কিন্তু সাধারণত প্রথমটাই হয়ে থাকে, কারণ তাস খেলার মধ্যে জুয়াড়ির যে সূক্ষ্ম হাতসাফাইয়ের কৌশল থাকে তাতে দর্শক ভ্রান্তিতে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত অন্য তাসকে বিবি বলে ভুল করেন।

এ খেলার মূল কৌশল বা চালাকিটুকু এইভাবে বুঝুন। প্রথমে বিবি তাসটিকে দেখিয়ে উপুড় করে ফেলুন। তার উপর ফেলুন অন্য একটি তাস, মনে করুন নওলা। এবারে একদিকে বুড়ো আঙ্গুল এবং অন্যদিকে তর্জনী এবং মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে দুটি তাস একসঙ্গে তুলে ফেলুন। এবার এই দুটি তাস একটির পর একটি আলাদা জায়গায় ফেললে সাধারণত নীচের তাস অর্থাৎ বিবি প্রথমে পড়বে, এবং দ্বিতীয়বারে পড়বে বাকি তাসটা। অর্থাৎ নওলা। স্বভাবতই মনে হবে আগে নীচের তাস না ফেলে ওপরের তাসটা ফেলবার উপায় নেই। প্রথমবার ঠিক তাই করে দেখিয়ে দিন প্রথমবার যে তাসটি পড়েছে সেইটি বিবি। তারপর নওলাটিকে আবার বিবির ওপর রেখে আবার একসঙ্গে তুলে নিন।

এই দ্বিতীয় বারেই হচ্ছে আসল চালাকি। নীচের তাসটিকে (অর্থাৎ বিবি) ধরুন বুড়ো আঙুল আর মধ্যমাঙ্গুলির ডগা দিয়ে, এবং ওপরের তাসটিকে (নওলা) ধরুন বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ডগা দিয়ে, তাহলেই দুটি তাস আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে নীচেকার বিবি তাসটি, এবং তর্জনী দিয়ে ওপরকার নওলা তাসটি। এ অবস্থায় আপনি ইচ্ছামতো যে কোনো তাস প্রথমে ফেলতে পারেন। ডান হাতটা ওপর থেকে নীচের দিকে দুলিয়ে মধ্যমাঙ্গুলিটি তুলে নিলেই নীচের বিবি তাসটি পড়বে। আর মধ্যমাঙ্গুলের চাপ ঠিক রেখে তর্জনীটি তুলে নিলেই ডান হাতের দোলায় ওপরের তাসটি (নওলা) আলগা হয়ে পড়ে যাবে। দর্শকদের মনে হবে নীচেকার তাসটি অর্থাৎ বিবিই প্রথমে পড়লো কিন্তু আসলে বিবিটি রয়ে গেলো আপনার হাতে। এটি আপনি দ্বিতীয় বারে ফেললেন। আপনার আসল কার্য সমাধা হয়ে গেল; দর্শক নওলা তাসটিকে বিবি বলে জানলেন। (অবশ্য এটি নিখুঁতভাবে করাটা প্রচুর অভ্যাস-সাপেক্ষ।) এরপর ধীরে ধীরে তাসগুলো আলাদাভাবে তুলে নিয়ে কয়েকবার জায়গা অদল বদল করুন, দর্শকদের বলুন তাঁদের দৃষ্টি বিবির ওপর রাখতে। তাঁরা নজর রাখবেন আসলে নওলাটির ওপর, কারণ ওটিকেই তাঁরা বিবি বলে ভুল করে বসে আছেন।

এই কৌশলটিই প্রধান ভিত্তি হলেও তিন তাসের বাজিতে আরো নানারকম কায়দা আছে, এবং পাকা অভিজ্ঞ জুয়াড়িরা কখন কোন কায়দা কাজে লাগাবে বা লাগাচ্ছে তা বোঝা সহজ নয়।

একটি ঘটনার কথা বলি। কলকাতা শহরের অভিজাত রাস্তার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অংশের ফুটপাথ। কাছাকাছি লাল পাগড়ি বা অনুরূপ কোনো আপদ উপস্থিত নেই, সুতরাং প্রায় নিরাপদেই বে-আইনী লোক-ঠকানোর ব্যবসা কিছু-ক্ষণ চালানো চলে। সেই পথে গল্প করতে করতে চলেছিলাম একজন বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুটি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, “ঐ দেখো।” দেখলাম। এবং বুঝলাম একটি তিন তাসের জুয়াড়ি তার তিন তাস নিয়ে বসেছে ফুটপাথের ওপর। সামনে ছোটো একটি ভিড়। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিলাম এই ‘প্রাথমিক’ ভিড়টি নিছক কৌতূহলী পথচারী দিয়েই গড়া নয়, এর ভেতর জুয়াড়ির নিজের লোকও রয়েছে। এই ‘প্রাথমিক’ ভিড় দেখে কৌতূহলী পথচারী দুজন একজন করে এসে ধীরে ধীরে ভিড় বাড়াতে লাগলো। আমার বন্ধুটি এবং আমিও গিয়ে ভিড় বাড়ালাম। জুয়াড়ি তার বাজীর শর্তটা বুঝিয়ে দিলে। লোভনীয় শর্ত।

পরিষ্কার বোঝা গেলো বিবি তাসটি রয়েছে মাঝখানে। ওটির ওপর বাজি ধরলেই জয়লাভ সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রথম ঝুঁকিটা কেউ নিতে চায় না। তখন এক ভদ্রলোক (?) পকেট থেকে মনিব্যাগ খুলে একখানা দশ টাকার নোট মাঝখানের তাসটির ওপর রেখেই তাসটি সঙ্গে সঙ্গে উল্টে দেখিয়ে দিলেন সেটিই বিবি। জুয়াড়ি তখন মুখটি কাঁচুমাচু করে (চমৎকার অভিনয় !) ফতুয়ার পকেট থেকে একখানা কড়কড়ে দশটাকার নোট বার করে বাজি বিজেতা ভদ্রলোকের (?) হাতে দিলে। (ভদ্রলোকটি জুয়াড়ির দলের লোক।) সরল আনাড়িরা জুয়াড়ির এই জব্দ হওয়ায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। ভদ্রলোক জুয়াড়িকে আবার তাস ফেলতে বাধ্য করলেন, এবং জুয়াড়ির অনুনয়ে নিজে আর বাজি ধরলেন না, উপস্থিত একজন ভদ্রলোককে (জুয়াড়ির দলের লোক নন) বললেন, "কত আছে আপনার মনিব্যাগে বার করুন শীগগীর।" যেন একটু দেরি হলেই মস্ত বড়ো একটা দাঁও হাতছাড়া হয়ে যাবে। দু নম্বর ভদ্রলোক এক নম্বরের ধমকে থতমত খেয়ে চার টাকা বার করে দিলেন। এক নম্বর 'ভদ্রলোক' ঐ চার টাকা ছোঁ মেরে একটি তাসের ওপর রেখেই তাসটি উল্টে দিলেন। দেখা গেল সেটি বিবি। "বার করো টাকা।" বলে এক নম্বর 'ভদ্রলোক' জুয়াড়ির কাছ থেকে চার টাকা আদায় করে দু নম্বর ভদ্রলোককে দিলেন। চার টাকা জিতে দু নম্বর ভদ্রলোক ভারি খুশী হয়ে তাকালেন এক নম্বরের মুখের দিকে. ভাবটা যেন 'আপনিই তো এটাকা জিতিয়ে দিলেন। আমি তো সাহসই পাচ্ছিলাম না।'

বাজির খেলা চালু করিয়ে দিয়ে এক নম্বর 'ভদ্রলোক' চলে গেলেন। তখন আবার তাস ফেলে ধীরে ধীরে তাদের জায়গা বদলালে জুয়াড়ি। পরিষ্কার (?) বোঝা গেলো ডান ধারের তাসটা বিবি। আমার সঙ্গী বন্ধুটি আমার হাঁ হাঁ করে বাধা দেবার চেষ্টা ব্যর্থ করে একখানা দশ টাকার নোট ডান ধারের তাসের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বললে, "এই বিবি।" জুয়াড়ি সঙ্গে সঙ্গে তাসটা উলটে দেখিয়ে দিলে সেটি অন্য তাস, আর সঙ্গে সঙ্গে দশটাকার নোটখানি পকেটস্থ করলে। কি ভেবে জানি না, জুয়াড়ি ঐ নোটখানা ফেরত দিয়ে দিয়েছিল একটু পরেই। হয়তো ভেবেছিল আমি ওর খেলার রহস্য সমস্তই জানি, অতএব এক হিসেবে ওর সম্প্রদায়ভুক্ত, সুতরাং আমার বন্ধুর পকেটমারাটা অধর্ম হবে।

তারপর আর একটু বলি। তিনটি তাস এক লাইনে উপুড় করে রেখে জুয়াড়ি থুথ্ ফেলবার অজুহাতে পিছন দিকে কিছুক্ষণের জন্য মুখ ফিরিয়ে রইলো। (এটি তার একটি মস্ত ভাঁওতা।) সেই ফাঁকে (?) একটি অতি-চালাক লোক

(বলা বাহুল্য, এটিও জুয়াড়ির দলের লোক) অন্যান্য সকলের দিকে চোখ ঠেরে করলে কি ? না, বিবি তাসটি তুলে নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে তার একটি কোণা ওপর দিকে উল্‌টে দিয়ে তাসটি আবার যথাস্থনে রেখে দিলে। দিয়ে আরেক-বার আমাদের সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসলো। (ভাবটা যেন, 'এইবার এই তিন তাসকে জুয়াড়ি যত খুশি এধার ওধার করুক না কেন, ঐ উল্‌টানো কোনা দেখেই বিবি তাসটিকে নির্ভুলভাবে চেনা যাবে।') থুথু ফেলা শেষ করে জুয়াড়ি আবার নিরীহভাবে তিন তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো, যেন এর ভেতর ওকে জব্দ করার জন্যে কি কৌশল করা হলো সে কিছুই বোঝে নি। কয়েকবার তাসগুলোর জায়গা বদল করে তারপর জুয়াড়ি বললে, "এইবার!" সবাই দেখলে কোণা ওলটানো তাসটি পড়ে আছে বাঁ ধারে। তিনজন লোভী ব্যক্তি লোভ সামলাতে না পেরে তাদের সঙ্গের যথাসর্বস্ব মনিব্যাগ থেকে বার করে রাখলে ঐ তাসের ওপর—মোট দাঁড়ালো ত্রিশ টাকার কাছাকাছি। জুয়াড়ি বেচারা প্রায় কাঁদোকাঁদো কণ্ঠে বললে, "এক সঙ্গে তিন তিনজনের বাজি চলবে ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আলবাৎ চলবে। এক সঙ্গে একজনার বেশি চলবে না এমনতো কথা ছিল না।" সমবেত কণ্ঠে জোর গলায় বলা হলো। এবারে আচ্ছা আটকানো আটকেছে লোকটা। আর রেহাই নেই।

"তাহলে এ বাজি সই, বলছেন আপনারা ?"

"আলবাৎ সই।"

"আপনারা হারলে আপনাদের এ সব টাকা আমি নিয়ে নিব।"

"নেবে।" বললেন তিনজন আশা-উৎফুল্ল বাজিধর। তাসটি উল্‌টে দেখেই তিনজন আশাবাদীর চোখ কপালে উঠে গেলো। বিবি নয়, নওলা! ব্যাপার কি ? (ব্যাপার আর কিছুই নয়, তাসগুলো হাতাবার সময় জুয়াড়ি সকলের অলক্ষ্যে বিবি তাসখানার উল্‌টানো কোণাটি চেপে সোজা করে দিয়ে নওলার একটি কোণ ঠিক ঐ রকম ছোটো করে উল্‌টে দিয়েছিলো।) এক বাজিতে টাকা ত্রিশেক তিনজনের পকেট থেকে চলে গেলো জুয়াড়ির পকেটে।

এই তিন তাসের বাজির প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে যাবার আগে তিন তাসের জুয়াড়ির আরেকটি সূক্ষ্ম চালাকির কথা বলি। মনে করা যাক, এক ভদ্রলোক ডান ধারের তাসটিকে নিজের দিকে তুলে (অপর কেউ যেন দেখতে না পারে সেটি প্রকৃতপক্ষে কি তাস) দেখে বলবে "বিবি"—যদিও আসলে সেটি বিবি নয়, অন্য তাস। দেখেই আবার যেমন ছিল তেমনি·উপুড় করে রেখে দেবে তাস-

টিকে, এবং বাজি হেরে (অর্থাৎ হারার ভান করে') বাজির টাকাটা দিয়ে দেবে। এতে দর্শকদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হবে ঐ তাসটিই নিশ্চয় বিবি, তা নইলে লোকটা বাজির টাকা পকেট থেকে বার করে দিয়ে দিলো কেন? এর পর জুয়াড়ি ঐ তাস তিনটির জায়গা বদল করবে এতো ধীরে ধীরে যেন সবাই নির্ভুলভাবে খেয়াল রাখতে পারেন শেষ পর্যন্ত বিবি তাসটি (?) কোথায় থাকছে। এইবার একজন (অথবা একাধিক জন) বেশি টাকার বাজি ধরবেন, কারণ ভাববেন বাজি জেতা সুনিশ্চিত। কিন্তু এবার জুয়াড়ির জিত। উল্‌টে দেখা যাবে বিবি নয়, অন্য তাস। বাজি জিতে টাকাটা পকেটস্থ করবে জুয়াড়ি। অতএব এ প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে বলি: পেশাদার জুয়াড়িদের সঙ্গে জুয়ায় ভাগ্য পরীক্ষা বা বাজি ধরে চালাকির লড়াই করতে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

উনিশ শতকের শেষ দিকের বিখ্যাত মার্কিন যাদুকর আলেক্‌জাণ্ডার হার্‌ম্যান (Alexander Hermann) যেমন ছিলেন অসাধারণ যাদুশিল্পী, তেমনি ছিলেন চূড়ান্ত খামখেয়ালি। (ইনি 'হারম্যান দি গ্রেট' নামে অসামান্য খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ৫৩ বছর বয়সে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।) শুধু মঞ্চে খেলা দেখাবার সময় নয়, যখন তখন যেখানে-সেখানে তিনি ভোজবাজি শুরু করতেন। একদিন বাজারে গিয়ে এক বুড়ির কাছ থেকে কয়েকটি ডিম কিনে প্রত্যেকটির ভেতর থেকে একটি করে সোনার মোহর বার করে বুড়িকে বললেন, "ভারি আশ্চর্য ডিম তো। বাকি ডিমগুলোও আমি কিনে নেবো।" বুড়ি তখন ঐ ক'টি ডিম বিক্রি করে ফেলেই পস্তাচ্ছিল, আর একটিও ডিম বেচতে রাজী হলো না। তখন মহা বিষণ্ণতার ভান করে চলে গেলেন যাদুকর হারম্যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখেন বুড়ি তার ঝুড়ির অনেকগুলো ডিম ভেঙে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে। বেচারা ভেবেছিল ডিমগুলো ভেঙে একগাদা মোহর পেয়ে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যাবে, কিন্তু ডিম-ভাঙা লোকসানই সার হলো। হারম্যান তখন বুড়িকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি বুড়ির সঙ্গে একটু তামাশা করে যাদুর খেলা দেখিয়েছিলেন মাত্র। আর ডিম ভাঙতে মানা করে তাকে সবগুলো ডিমের দাম দিয়ে গেলেন তিনি। বুড়ি খুশী হয়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেলো খামখেয়ালি যাদুকর 'হারম্যান দি গ্রেট'-এর এই তামাশা আর সহৃদয়তার কথা। ফলে অতি কম খরচে অতি মূল্যবান বিজ্ঞাপন হয়ে গেলো তাঁর। সেই শহরেই এক থিয়েটার হলে তিনি যাদু দেখাচ্ছিলেন। লোকে লোকারণ্য হতে লাগলো এই খেয়ালী যাদুকরের যাদু দেখতে।

অসাধারণ যাদুকর আলেকজাণ্ডার হারম্যান এক হিসেবে অসাধারণ সৌভাগ্য-বানও ছিলেন। তিনি তাঁর সহকারীরূপে পেয়েছিলেন অসামান্য যাদু প্রতিভাধর উইলিয়ম রবিনসনকে। (এই রবিনসনই পরে হয়েছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুকর চুং লিং সু"।) হারম্যান নিজে ছিলেন যেমন অসাধারণ প্রতিভাধর অভিনেতা, তেমনি তালিম দিয়ে রূপসজ্জা এবং অভিনয়ে অসামান্য সুদক্ষ করে তুলেছিলেন সহকারী রবিনসনকে। অবশ্য রবিনসনের নিজের অসাধারণ প্রতিভা ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। হারম্যানের চলাফেরা, হাবভাব, কথাবার্তা এবং যাদুপ্রদর্শনের ভঙ্গীগুলো রবিনসন এমনভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন যে তিনি যখন হারম্যান সেজে মঞ্চে খেলা দেখাতেন, তখন দর্শকরা টের পেতেন না তিনি আসল হারম্যান নন।

মঞ্চে হারম্যান যে সব অদ্ভুত খেলা দেখাতেন তা দেখে অনেকেরই মনে বিশ্বাস ছিল হারম্যানের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা আছে। এমনও গুজব রটেছিল যে একই সময় তিনি দু জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারেন। এটি হয়েছিল কি ভাবে তাই বলি। হারম্যান ছিলেন ঘোড়দৌড়-ভক্ত। ভালো ঘোড়দৌড় থাকলে তিনি দেখতে যাবার সুযোগ পারতপক্ষে ছাড়তেন না।

এমনও হতে পারে যে স্বামীরা যখন ঘোড়দৌড়ের মাঠ জলজ্যান্ত হারম্যানকে দেখে তাঁর সঙ্গে রীতিমতো আলাপ আলোচনা করে বাড়ি ফিরছেন তখন স্ত্রীরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ম্যাটিনী শো-তে জলজ্যান্ত হারম্যানের ম্যাজিক দেখে ফিরেছেন। স্বামী-স্ত্রীরা হিসেব করে দেখলেন হারম্যান যে সময় ঘোড়দৌড়ের মাঠে হাজির ছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি থিয়েটার হলের মঞ্চে যাদুক্রীড়াও দেখাচ্ছিলেন! স্বামীরা জোরগলায় বলে, "নিজের চোখে দেখে এসেছি, নিজের কানে শুনে এসেছি।" স্ত্রীরাও জোর গলায় ঠিক তাই বলেন। সুতরাং একই সময় রহস্যময় হারম্যান দু জায়গায় উপস্থিত ছিলেন। খোদ হারম্যানকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুধু একটু রহস্যময় হাসি হাসতেন, এর ভেতর সত্যিই কিছু অলৌকিক ব্যাপার রয়েছে! বলতেন না, গিন্নীরা ম্যাটিনী শো-তে যে "হারম্যান"কে ম্যাজিক দেখাতে দেখে এসেছেন, সে হারম্যান আসল হারম্যান নয়, হারম্যানের নিখুঁত ছদ্মবেশে তাঁর সহকারী উইলিয়ম রবিনসন।

বেকায়দায় যাদুকর

যাদুকর রাজা বোসের মুখে শোনা একটি গল্প বলি। বিখ্যাত যাদুকর নিকোলা একবার একা তাঁর মোটরগাড়ি চালিয়ে চলেছিলেন শহর থেকে দূরে এক পল্লী অঞ্চলের কাঁচা রাস্তা দিয়ে। ঋতুটা ছিল বর্ষা, আর এক পশলা বর্ষণও হয়ে গিয়েছিল একটু আগেই। তারই ফলে স্বভাবনরম রাস্তা হয়ে উঠেছিল আরো নরম।

পাকা যাদুকর নিকোলা এমনিতে খুবই হুঁশিয়ার লোক—তাঁর চোখ, কান, মন সব কিছু অত্যন্ত সজাগ। অমন না হলে পাকা যাদুকর হওয়াও যায় না; তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তীক্ষ্ণশ্রবণ আর প্রত্যুৎপন্নমতি (সোজা ভাষায় উপস্থিত বুদ্ধি) না হলে এক সঙ্গে হলসুদ্ধ লোককে বোকা বানিয়ে যাদুর খেলা দেখাবেন কি করে? কিন্তু সেদিনকার নিকোলা—পল্লী অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা দেখে বিমুগ্ধ নিকোলা, খেয়ালী-আপনভোলা নিকোলা, ছুটির মেজাজে মন এলিয়ে দেওয়া নিকোলা। নিরালা কাঁচা নরম রাস্তা বেয়ে এগিয়ে চলেছে নিকোলার হাওয়া-গাড়ি, যার চালন-চক্রে বিশ্রাম করছে নিকোলার যাদুদক্ষ হাত।

কিন্তু একি? এগিয়ে যেতে যেতে গাড়ি হঠাৎ থেমে গেলো কেন? স্বপ্নলোক থেকে হঠাৎ যেন এক ধাক্কা খেয়ে বাস্তবে নেমে এলেন যাদুকর নিকোলা। দেখলেন গাড়ির সামনের একটি চাকা কাদায় ডুবে আটকে গেছে, ঐ কাদা থেকে চাকা তুলতে না পারলে গাড়ি আর এগোবে না। গাড়ির নিজস্ব শক্তি এখানে ব্যর্থ, বাইরের শক্তি অত্যাবশ্যক। কিন্তু নিকোলা এতো বড়ো পালোয়ান নন যে ঐ কাদা থেকে গাড়ির চাকা ঠেলে তুলতে পারবেন।

বিজন পথ। কাছাকাছি কেউ নেই যার কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে। আচ্ছা বিপত্তিতেই পড়া গেলো, এখন কি করা যায়? গাড়িটাও এ অবস্থাতেই ফেলে রেখে পদব্রজে শহরে ফিরে গিয়ে সাহায্যকারী সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন? সেটা কি গাড়ির পক্ষে নিরাপদ হবে? তাছাড়া শহরও এখান থেকে অনেকটা পথ, আর পদব্রজটা নিকোলার তেমন রপ্ত নেই। সুতরাং তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন কি করা যায়।

কিছুক্ষণ বাদে সেই পথে এলো কয়েকজন পথিক। তারা শহরে যায় বটে,

কিন্তু শহুরে নয়, পল্লী অঞ্চলের মজবুত বাসিন্দা। এদের যে কোনো একজন তিনজন নিকোলার চাইতে বেশি শক্তিশালী। নিকোলা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে এদের বললেন, "ভাই, আমি বড়ো বিপদে পড়েছি, তোমরা আমায় বাঁচাও।"

"কি বিপদ ?"

"আমার গাড়ির এই চাকাটা কাদায় আটকে গেছে। তোমরা একটু ঠেলে তুলে দেবে ?"

"এ আর বেশি কথা কি ? নিশ্চয় দেবো।" বলে সেই তাগড়া পালোয়ানেরা আস্তিন গুটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চাকায় হাত লাগায় আর কি !

কিন্তু না, হাত লাগালো না তারা। তাদের একজন যাদুকরের মুখের দিকে তাকিয়েই তাঁকে চিনে ফেলে শুধালো, "আপনি যাদুকর নিকোলা নন ?"

নিকোলা একটু গর্ববোধ করলেন মনে মনে ; রঙ্গালয়ের বাইরেও লোকটি তাঁকে চিনতে পেরেছে। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমিই যাদুকর নিকোলা।"

শুনে সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়ে ওরা সবাই গুটানো আস্তিন নামিয়ে ফেলল। রঙ্গালয়ে মহাযাদুকর নিকোলার বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখে এরা অনেকবার মুগ্ধ হয়েছে। যাদুমন্ত্রে তাঁকে মঞ্চের ওপর থেকে চোখের পলকে জলজ্যান্ত মোটরগাড়িকে উড়িয়ে দিতে অনেক দেখেছে তারা। একটা ফুসমন্তর, আর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া-গাড়ি বেমালুম হাওয়া। সেই হাওয়া-গাড়ির মাত্র একটা চাকা কাদা থেকে তুলবার জন্যে কিনা তাদের সাহায্য ভিক্ষা করছেন এই অলৌকিক শক্তিমান যাদুকর! নিশ্চয় তিনি তাদের সঙ্গে তামাসা করছেন, কারণ তিনি ইচ্ছে করলেই এক যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে এক মুহূর্তে গাড়ির চাকা কাদা থেকে তুলে নিতে পারেন। সুতরাং এখন তাঁকে সাহায্য করতে গেলেই হয়তো বোকা বনতে হবে, যাদুর খেলার সময় যাদুকর যেমন অনেক চালাক দর্শককে বোকা বানান।

ধৃষ্টতার জন্যে ক্ষমা চেয়ে লজ্জিত মুখে ওরা ফিরে যাচ্ছিল। তখন বিপন্ন যাদুকর বাধ্য হয়ে ওদের বুঝিয়ে দিলেন তিনি সত্যিই বিপন্ন, ওরা সাহায্য করে কাদা থেকে চাকা তুলে না দিলে তাঁকে এখানেই আটকে থাকতে হবে, মঞ্চের যাদু এখানে তাঁকে কোনো সাহায্যই করতে পারবে না।

ওরা তখন চাকা তুলে দিল কাদা থেকে, যাদুমন্ত্রে নয়, গায়ের জোরে। ওদের ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন কৃতজ্ঞ যাদুকর। ওরা বিস্মিত

হয়ে ভাবতে ভাবতে গেলো, যাদুর জোরে যিনি গোটা গাড়ি উড়িয়ে দিতে পারেন, তিনি গাড়ির একটা চাকা কাদা থেকে যাদুর জোরে ওঠাতে পারলেন না কেন!

*　　*　　*　　*

একজন যাদুকর ঘড়ির খেলা দেখাতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েছিলেন। কোনো এক মফঃস্বল শহরের একটি ছোটো হলে খেলা দেখাচ্ছিলেন যাদুকর ভদ্রলোক। হলের সামনের দিকে একটি দরজার ধারে যাদুকর দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন তাঁর দলের একজন পাকা লোককে, লোকটির হাতে একটি ছোটো ঘড়ি। যাদু দর্শনার্থীরা ঐ দরজা দিয়ে যখন হলের ভেতর প্রবেশ করছিলেন, ঐ লোকটি পাকা হাতে তাঁদের একজনের পকেটে ঐ ঘড়িটি এমনভাবে ফেলে দিলেন যেন ভদ্রলোক টের না পান। তারপর লক্ষ্য করলেন তিনি কোথায় বসেন। খেলা যখন শুরু হলো তখন তিনি ইশারায় যাদুকরকে জানিয়ে দিলেন কোন ভদ্রলোকের পকেটে ঘড়িটি গোপনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যাদুকরও চিনে রাখলেন ভদ্রলোককে।

ঘড়ির খেলা শুরু করলেন যাদুকর। যে ঘড়িটি ঐ ভদ্রলোকের পকেটে গোপনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক সেই রকম একটি ঘড়ি হাতে নিয়ে তাই দিয়ে দু-তিনটি চমৎকার হাত-সাফাইয়ের খেলা দেখিয়ে তারপর যাদুকর সেটিকে তাঁর ম্যাজিক পিস্তলে পুরলেন। তারপর 'হোকাস পোকাস' জাতীয় কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই ভদ্রলোকের দিকে লক্ষ্য করে পিস্তলের ঘোড়া টিপলেন। আওয়াজ হলো। ধোঁয়া উঠলো। যাদুকর বললেন 'ঐ যে ঘড়িটি হাওয়ার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো, গিয়ে ঢুকলো ঐ ভদ্রলোকের পকেটে' বলে পিস্তলটি মঞ্চে টেবিলের ওপর রেখে তিনি নেমে দর্শকদের ভেতর এগিয়ে গিয়ে সেই ভদ্রলোককে বললেন, "দেখুন তো ঘড়িটি ঠিকমতো এসে আপনার পকেটে পৌঁছেছে কিনা।"

ভদ্রলোক মহা আপত্তিতে মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, "না না না, সে কি কথা মশাই? ঘড়ি আমার পকেটে আসবে কি করে? ঘড়ি-টড়ি নেই আমার পকেটে।" তাঁর ঘোর আপত্তি এবং জোর মাথা নাড়ার বহর দেখে অনেকেই হেসে উঠলেন। যাদুকরও হেসে উঠলেন। যাদুকরও হেসে বললেন, "পকেটে হাত দিয়ে একবার দেখুনই না।"

পকেটে হাত দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের আশ্চর্য ভাবান্তর ঘটলো।

পকেটে ঢুকানো হাত পকেটেই ঢুকে রইলো, ভদ্রলোক নিশ্চল নিস্পন্দ নীরব পাথরের মূর্তির মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ঘড়িটি পকেট থেকে হাতের মুঠোয় লুকিয়ে বার করে এনে ভীষণ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "তাই তো! এ যে আস্তো জলজ্যান্ত ঘড়ি। আমার পকেটে পাঠালেন কি করে মশাই ?"

যাদুকর রহস্যমাখানো হাসি হেসে বললেন, "ঐটেই তো আমার যাদুর রহস্য।"

সেই 'বিস্মিত' ভদ্রলোক তখন তাঁর ডান হাতের মুঠোয় লুকানো ঘড়িটা দুহাতের তালু দিয়ে ঢেকে রগড়াতে রগড়াতে বললেন, "তাহলে আমিও একটু যাদুর খেলা দেখাই। এক-দো-তিন, চলা যাও, চলা যাও, চলা যাও। ফুঃ! ঐ চলে যাচ্ছে—যাচ্ছে—যাচ্ছে, চলে গেল ঐ ভদ্রলোকের পকেটে।" বলে অদূরের এক ভদ্রলোকের দিকে দুহাত ঝেড়ে দেখিয়ে দিলেন যে ঘড়িটা এইমাত্র পকেট থেকে বার করেছিলেন সেটি সত্যিই তাঁর হাত থেকে বেমালুম উড়ে গেছে!

এই প্রথম ভদ্রলোক ঐ দ্বিতীয় ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "দেখুন তো ঘড়িটা আপনার পকেটে ঠিকমতো পাঠাতে পেরেছি কিনা ?"

দু নম্বর ভদ্রলোক পকেটে হাত দিয়ে ঘড়ি বার করে নিজে যেমন বিস্মিত হলেন, তেমনি অনেককে বিস্মিত করলেন।

যাদুকর বিস্মিত হয়ে পয়লা নম্বর ভদ্রলোককে বললেন, "আশ্চর্য! কি করে করলেন ?"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "ঐ তো আমার যাদু।"

আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম। যাদুকরের গোপন সহকারীটি ঐ প্রথম ভদ্রলোকের পকেটে গোপনে ঘড়িটি ফেলে দেবার অল্প পরেই দৈবাৎ পকেটে হাত দিয়ে ভদ্রলোক চমকে উঠে ভেবেছিলেন, 'একি ? আমার পকেটে ঘড়ি এলো কোথা থেকে ? নিশ্চয় কেউ হাত সাফাইয়ের জোরে চালিয়ে দিয়েছে, আমায় বেকায়দায় ফেলবার বা বোকা বানাবার জন্য। তাড়াতাড়ি এক ফাঁকে এটিকে পকেটান্তরিত করে ফেলতে হচ্চে।'

এবং তিনিও প্রথম সুযোগে হাতসাফাই করে তাঁর পকেট থেকে ঘড়িটিকে দু নম্বর ভদ্রলোকের পকেটে চালান করে দিয়েছিলেন।...

একবার কৌতুক আর করুণরসে মেশানো বেকায়দায় পড়েছিলেন যাদুকর মৃণাল রায়। তাঁর সেই বেকায়দার কাহিনী বলি।

একদিন তিনি কোনো একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়িতে ঘরোয়া আসরে কয়েকটি যাদুর খেলা দেখান। তাদের ভেতর একটি খেলা ছিল পুরানো খবরের কাগজ ছিঁড়ে সিল্কের কাপড়ে পরিণত করা। খেলাগুলো—বিশেষ করে এই সিল্কের কাপড় তৈরির সহজ উপায়টি—সব চেয়ে বেশি মুগ্ধ করলো সে বাড়ির বৃদ্ধা দিদিমাকে। খেলাটি দেখাবার সময় যাদুকর গল্পচ্ছলে বলেছিলেন পুরানো কাগজ ছিঁড়ে তাই থেকে খাঁটি সিল্কের কাপড় তৈরি করা খুবই সহজ। এই নির্জলা মিথ্যেটিকে বৃদ্ধা বিশ্বাস করেছিলেন নির্ভেজাল সত্য বলে। খেলার শেষে আড়ালে ডেকে নিয়ে বৃদ্ধা তাঁকে বললেন, "বাছা, দেখছো তো আমাদের অবস্থা? দুবেলা দুমুঠো খোরাকও ঠিকমতো জোটে না। কাগজ থেকে রেশমি কাপড় বানাবার কায়দাটা যদি দয়া করে শিখিয়ে দাও, তাহলে এ পরিবারের পোড়া কপালটাকে একটু ফেরাতে পারি।"

সেদিনকার মতো ছাড়া পাবার জন্যে যাদুকর বললেন, "আজ আসি দিদিমা। কিছু খবরের কাগজ জোগাড় করে রাখবেন, পরে আসব'খন একদিন।"

দিন-পনেরো বাদে দিদিমা লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেলেন যাদুকরকে। গিয়ে যা দেখলেন তাতে যাদুকরের চক্ষুস্থির। অত্যন্ত গরীব, অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন পরিবার। বহু দুঃখে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে দিদিমা প্রায় আধ মণ পুরানো খবরের কাগজ চড়া দাম দিযেই কিনে লুকিয়ে রেখেছেন। স্বপ্ন দেখছেন এই আধ মণ কাগজ যাদুকরের কৌশলে পরিণত হবে আধ মণ সিল্কের কাপড়ে; সে কাপড় বাজার দরের আধা দামে বিক্রি করে দিলেও পরিবারের হাল ফিরে যাবে. ছেলে-মেয়েগুলো দুধ, মাছ, মাংস খেতে পারবে, তাদের গায়ে উঠবে ভাল কাপড় জামা।

"এই কাগজগুলোকে রেশমী কাপড় বানিয়ে দাও বাবা।" বললেন দিদিমা। তাঁর কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠলো যাদুকরের যাদুতে অসীম বিশ্বাস; দুই চোখে ফুটে উঠলো আসন্ন মধুর ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

যাদুকরের মনে হলো এমন বেকায়দায় তিনি আর কখনো পড়েন নি। হয় এতগুলো কাগজকে রেশমী কাপড় বানিয়ে দিতে হবে, অথবা ভেঙে দিতে হবে বৃদ্ধার স্বপ্ন। প্রথমটি সম্ভব নয়, সুতরাং বৃদ্ধার স্বপ্নই ভেঙে দিতে হলো: তাঁকে বলতেই হলো কাগজকে কাপড় বানানো যায় না, তিনি যা দেখেছিলেন তা তাঁর চোখের ভুল আর যাদুকরের হাতসাফাই।

বৃদ্ধার অনেক কষ্টের টাকায় কেনা কাগজগুলো কম দামে লোকসানে বেচে দিয়ে বৃদ্ধাকে পুরো দামই দিয়ে দিলেন যাদুকর। মনে মনে বললেন, 'বৃদ্ধার

টাকার লোকসানটা বাঁচালাম। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা এঁকে ভোলাবো কোন যাদুতে ?

*   *   *   *

বাংলার উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীত-রসিক সমাজে জ্ঞানী ও গুণী সেতারী রূপে শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী (কচিবাবু) সুপরিচিত এবং বিশেষ সম্মানের অধিকারী। কিন্তু বাংলাদেশে যাদু চর্চার ইতিহাসেও যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এ সংবাদ হয়তো অনেকে রাখেন না। সংগীতচর্চা এবং সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত গৌরীপুরের (মৈমনসিং) রায়চৌধুরী পরিবারে সংগীতের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন তিনি, ভারতবিখ্যাত বহু ওস্তাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছেন এবং তার সদ্ব্যবহার করেছেন, সেতারে তালিম পেয়েছেন তখনকার সেরা সেতারী ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ সাহেবের কাছে। তাঁর প্রথম-প্রেম সংগীত, দ্বিতীয়-প্রেম যাদুবিদ্যা। শৈশবে বারাণসীধামে যাদুকর "ডিভারো"-র (Devarro) যাদুর খেলা দেখে তাঁর যাদুকর হবার ঝোঁক চেপেছিল। ধনী পরিবারের ছেলে তিনি, শখ মেটাবার জন্য অর্থের অভাব হয়নি। যাদু চর্চায় তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

দুই নায়ে পা দিয়ে থাকা অসুবিধাজনক বিবেচনা করে বিমলাকান্ত সংগীতে একান্ত হবার জন্য শেষ পর্যন্ত যাদু থেকে বিদায় নিলেন। সেই বিদায় নেবার বহুদিন বাদেও তাঁর হাতে কয়েকটি যাদুর খেলা এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে দেখেছি, যাতে মনে হয় তিনি যাদুজগতে থাকলে এখন নিঃসন্দেহে তাঁকে প্রথম সারিতে দেখতে পেতাম। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম যাদুকর জীবনে তিনি কখনো বেকায়দায় পড়েছিলেন কিনা। জবাব পেয়েছিলাম তিনি নিখুঁত ভাবে তৈরি না হয়ে কখনো খেলা দেখাতেন না বলে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো বেকায়দায় তাঁকে কখনোই পড়তে হয়নি। হ্যাঁ, একবার যে অবস্থায় তিনি পড়েছিলেন তাকে ইচ্ছে করলে বেকায়দা বলা চলে, কিন্তু সেজন্যে তিনি দায়ী ছিলেন না। ঘটনাটা এইরকম :

কোনো একটি বিশেষ উপলক্ষ্যে কলকাতার একটি বিখ্যাত হলে 'ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম' অর্থাৎ বিচিত্র অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেই অনুষ্ঠানে বিমলাকান্তও যাদুর খেলা দেখাবেন। তিনি কয়েকটা বাছাই খেলা ঠিক করে রেখেছেন, প্রথম খেলাটিতেই আসর মাত করে ফেলবেন, সে বিষয়ে তাঁর মনে একটি ফোঁটাও সন্দেহ নেই। প্রথম খেলাটি তাঁর নিজের তৈরি। খেলাটির নাম "Look !" অর্থাৎ "চেয়ে

দেখুন !" দ্রুতবেগে পোশাক পরিবর্তনের খেলা। খেলাটির আসল মজাই হচ্ছে দ্রুত, অপ্রত্যাশিত বিস্ময়, যাকে ইংরেজিতে বলে 'সারপ্রাইজ' (surprise)।

প্রোগ্রামে বিমলাকান্তের ঠিক আগেই ছিল একজন প্রবীণ যাদুকরের খেলা। বিমলাকান্তকে তিনি অনুজ স্থানীয় মনে করে স্নেহ করতেন। তাঁর পালা শেষ হলো, এইবার শুরু হবে তরুণ যাদুকর বিমলাকান্তের খেলা দেখানো। প্রবীণ ভদ্রলোক স্নেহ ভরে ভাবলেন তাঁর যাদুজগতের কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে একটু পরিচিত করে দেওয়াই তাঁর পক্ষে অগ্রজের উপযুক্ত কাজ হবে। সুতরাং তিনি পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দর্শকদের উদ্দেশে বললেন, "এইবার আপনারা আমার পরম স্নেহাস্পদ যাদুকর শ্রীমান বিমলাকান্তর অত্যাশ্চর্য যাদুর খেলা দেখবেন। সর্বপ্রথম এঁর যে খেলাটি আপনারা দেখবেন, সেটি দেখে আপনাদের তাক লেগে যাবে। প্রথম যখন বিমল এখানে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন দেখবেন সে ধুতি পাঞ্জাবি-পরা পুরোপুরি বাঙালী। তারপর স্টেজের পেছনে এই যে এধার থেকে ওধারে নিচু পর্দা ঝুলছে, এর পেছন দিয়ে বিমল একবার মাত্র হেঁটে যাবে আপনাদের চোখের সুমুখ দিয়ে। তার পা, আর কাঁধের ওপর থেকে মাথা পর্যন্ত আপনারা সব সময় দেখতে পাবেন। তারপর পর্দার এদিক দিয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেই আপনারা দেখে অবাক হবেন—কোথায় গেলো ধুতি পাঞ্জাবি ? তার জায়গায় কোট প্যাণ্ট পরে বিমল পুরো দস্তর সাহেব। এমন আশ্চর্য খেলা আপনারা আর দেখেন নি।"

এভাবে দর্শকদের খেলা দেখবার জন্য প্রস্তুত করে তিনি মঞ্চের নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়লেন, "বিমল, চলে এসো।

বেচারা বিমলাকান্তর মহা বেকায়দা অবস্থা। আচমকা বিস্ময় যে খেলার মজা, পরম স্নেহে আগে সমস্তই বলে দিয়ে সেই বিস্ময়ের গোড়া মেরে রেখেছেন অগ্রজোপম যাদুকর। আগে থেকে বলে যে খেলা এভাবে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সেই খেলা দেখাবার জন্যই মঞ্চে প্রবেশ করতে হবে। হায় দুর্ভাগা ! কিন্তু উপায় কি ? যেতেই হলো। খেলাটি একেবারে ব্যর্থ হলো না। কিন্তু যতটা হাততালি অর্জন করতে পারতো ততটা করলো না, সে কথা বলাই বাহুল্য। শুভাকাঙ্ক্ষীরা অনেক সময়ে ভালো করতে গিয়ে উল্টে বেকায়দায় ফেলেন, এ কাহিনীটি তারই একটি ভালো উদাহরণ।

যাদুকর রয় দি মিষ্টিক-এর মুখে শোনা কয়েকটি বিচিত্র কাহিনী বলি।

প্রথমে বলি ১৯১৫ কি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের কথা। রয় দি মিষ্টিক তখন সাদাসিধে যতীন রায়, যাদুবিদ্যার উৎসাহী সাধক, মুঙ্গেরের একটি স্বাস্থ্যকর জায়গায় গেছেন সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত গৃহে গৃহশিক্ষক হয়ে। উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যোন্নতি এবং নিরিবিলিতে হাতেকলমে সাধনা করে যাদুবিদ্যায় কার্যকরী দক্ষতা অর্জন করা। বাড়ির ছেলেদের পড়াতেন আর ইংরেজী বইয়ের উপদেশ অনুযায়ী যাদুর কৌশল আর 'ভেনট্রিলোকুইজম' অভ্যাস করতেন। গোপনেই করতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চারধারে জানাজানি হয়ে গেলো 'মাস্টার সাহেব' অলৌকিক শক্তির অধিকারী যাদুকর, ভূতের সঙ্গেও কথা বলেন। ভূতের সঙ্গে কথা কওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য 'ভেনট্রিলোকুইজম' (স্বরক্ষেপণ)। একদিন ছেলেদের পড়াচ্ছেন, এমন সময় পাশের গ্রাম থেকে একদল গ্রামবাসী এসে হাজির ; তারা যাদু ওস্তাদকে চায়। ব্যাপার কি ? দুদিন হলো তাদের একটি ছেলে কেউটের কামড়ে মরেছে। ওঝা বদ্যি কিছু করতে পারেনি : এখানকার হাসপাতালে তাকে আনা হয়েছে, হাসপাতালও কিছু করতে পারেনি। যাদুকরের খবর পেয়ে তারা এসেছে তাঁর শরণ নিতে ; সাপের কামড়ে মরা ছেলেটিকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে যাদুর জোরে।

নাছোড়বান্দাদের সরাসরি বিদায় করা অসম্ভব হলো। ওরা এক রকম জোর করেই তাঁকে টেনে নিয়ে গেলো। গিয়ে তিনি দেখলেন, হাসপাতালের একটি গাছের তলায় মৃত ছেলেটিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে তিনি বললেন : "যাদুকর মরা মানুষ বাঁচাতে পারে না সে কথা এরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ; ভাববে আপনি ইচ্ছে করেই ছেলেটিকে বাঁচাচ্ছেন না। তখন এদের হাতে আপনার প্রাণসংশয় হবে। সুতরাং আপনাকে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন আপনি ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করছেন, কিন্তু এদেরই দোষে বাঁচাতে পারলেন না।"

অর্থাৎ পাকা অভিনয় করে সবটা দোষ ওদের ওপর চাপিয়ে দিতে না পারলে রক্ষা নেই। প্রাণের দায়ে তা-ই অভিনয় করতে হলো যাদুকরকে। যাদুকরোচিত রহস্য-গম্ভীরভাবে মৃতদেহের বুকের ওপর রুমাল রেখে তার ওপর কান রেখে কি যেন শোনবার ভঙ্গি করে তারপর মৃতদেহের আচ্ছাদন তুলে দেখলেন সেটি বেশ ফুলে উঠেছে। মৃতদেহের দিকে, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ, স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তারপর গভীর হতাশা, গভীর বিরক্তি, গভীর বেদনার ভান করে আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, "হায় হায় ! তোমরা করেছো কি ?

ছেলেটাকে বাসি করে, পচিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসেছো? আগে আনতে পারো নি? ছেলেটির পবিত্র আত্মা এখন এই পচা ফুলে ওঠা দেহে ফিরে আসতে চাইছে না। যাদু দিয়ে জোর করে তাকে এই পচা গলা দেহে ঢোকাতে গেলে সে ভয়ানক চটে যাবে; এমন কি সে ভূত হয়ে তোমাদের কারও ঘাড়েও চাপতে পারে। সাপে কাটা মড়া টাটকা হলে নিশ্চয়ই বাঁচানো যেতো; এখন আর উপায় নেই। অবিলম্বে গিয়ে এর সৎকার করো, নইলে এর আত্মার মুক্তি হবে না, তোমাদের মহাপাপ হবে।"

অমার্জনীয় অন্যায় করে ফেলেছে ভেবেই হোক, বা ভূতের ভয়েই হোক, তারা মৃতদেহটিকে নিয়ে চলে গেলো। বিষম বেকায়দা থেকে সে যাত্রা বেঁচে গেলেন যাদুকর রায়। এর পর আর বেশিদিন সে অঞ্চলে থাকা তিনি নিরাপদ বিবেচনা করলেন না। কে জানে ওরা কবে টাটকা মড়া নিয়ে এসে হাজির হবে?

দ্বিতীয় কাহিনীটি ১৯১৯ কি ১৯২০ খৃষ্টাব্দের। মহাত্মাজীর বাণী 'চরকা দিয়েই স্বরাজ মিলবে'; ঘরে ঘরে তাই চরকার ঘর্‌ঘর্‌। চারিদিকে খদ্দর আর গান্ধীটুপির জয়জয়কার।

এমনি সময়ে যাদুকর রায়কে মীর্জাপুর (বর্তমান উত্তরপ্রদেশে) যেতে হয়েছিল রেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউট হলে ইংরেজ দর্শকদের যাদুর খেলা দেখাতে। ইন্‌স্টিটিউট হলটি স্টেশনের ধারেই। যাদু প্রদর্শন শুরু করবার তখনো কিছু দেরি আছে; স্টেশনের সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমের এক পাশে যাদুকর রায় খাওয়ার পাট সেরে নিচ্ছেন, পরনে ইউরোপীয়ান পোশাক। এমন সময় খদ্দরপরিহিত এবং গান্ধীটুপি মাথায় একদল দেশপ্রেমিকের প্রবেশ। তাঁরা দল বেঁধে কোনো এক কনফারেন্সে যাচ্ছেন, ট্রেন আসবার একটু দেরি আছে বলে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করবেন। তাঁদের দেখে বোঝা গেলো তাঁরা উত্তরপ্রদেশেরই সম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন লোক। পুরো স্বদেশী হুজুগের সময়ে একজন ভারতীয়কে পুরো বিদেশী পোশাকে দেখে তাঁরা প্রায় মারমুখো হয়ে উঠলেন। এতোগুলো ক্ষ্যাপা লোকের মাঝখানে একা পড়ে অসহায় বোধ করতে লাগলেন যাদুকর রায়। চাঁদা করে এরা যদি উত্তম মধ্যম লাগায়, তাহলেও কিছু করবার উপায় নেই। সুতরাং এঁদের ভালোভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতেই হবে।

বললেন, "বিদেশী বর্জন করে আমাদের টাকা বিদেশীর পকেটে যাওয়া বন্ধ করা যায়, কিন্তু বিদেশীর পকেট থেকে আমাদের পকেটে আনা যায় না। বিদেশী

পোশাক পরে যদি বিদেশীর পকেট থেকে টাকা আনা যায় তাহলে আমার এই বিদেশী পোশাকে নিশ্চয়ই আপনাদের আপত্তি থাকবে না ?"

শুনে তাঁরা উৎসাহিত হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই থাকবে না। কিন্তু টাকা আপনি আনবেন কি করে ?"

যাদুকর বললেন, "আমি একজন বাঙালী যাদুকর। ইংরেজ মহলে এই ইংরেজি পোশাকে যাদু দেখিয়ে বেড়াই। তাঁরা আমার যাদুর খেলা দেখে খুশী হয়ে টাকা দিয়ে আমার পকেট বোঝাই করে দেন। ইংরেজরা আমাদের নানা-ভাবে শোষণ করে ; আমি এইভাবে তাদের শোষণ করি। এই পোশাক ছাড়া এ কাজ হয় না বলেই এই পোশাকের মায়া এখনো ছাড়তে পারি নি। এখন বুঝতে পারছেন কেন আমার বিদেশী পোশাক পরা ?"

বিদেশী পোশাকের সাহায্যে বিদেশীর পকেট মারার পরিকল্পনাটা স্বদেশী-ওয়ালাদের খুবই মনঃপূত হল। তাঁরা মহা উল্লাসে সাবাশ দিয়ে উঠলেন। আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেল। যাঁরা দল বেঁধে মারামুখো হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের সবারই যেন বহুদিনের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন যাদুকর রায়। বেকায়দা থেকে তিনি চমৎকারভাবে রেহাই পেয়ে গেলেন যাদুকরোচিত উপস্থিতবুদ্ধির জোরে।

১৯২৩ খৃস্টাব্দ। রংপুরের টাউন হলে 'রয় দি মিষ্টিক'-এর যাদুর খেলা চলছে। প্রদর্শনীর তৃতীয় দিনে বেকায়দায় পড়ে গেলেন যাদুকর। এদিকে তাঁর ভীষণ জ্বর, মাথা তুলতে পারেন না ; ওদিকে দর্শক সমাগম হয়েছে ভালো, খেলা না দেখালে এতো লোককে ফেরাতে হবে। বেকায়দায় পড়ে ১০০ ডিগ্রি জ্বর নিয়েই যাদুর খেলা দেখাতে স্টেজে উঠলেন। দেখাতে দেখাতে তন্ময় হয়ে ভুলে গেলেন অসুস্থতার কথা। দর্শকরা অবশ্য জানেন অসুস্থ শরীর নিয়েই যাদুকর খেলা দেখাচ্ছেন।

এলো শেষ খেলা : "শূন্যে ভাসমানা বালিকা"। বালিকাকে হিপনোটাইজ্ (সম্মোহন) করার অভিনয় করে শূন্যে ভাসিয়ে রেখে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে যাদুকর তাঁদের হর্ষধ্বনি এবং করতালির অভিনন্দন গ্রহণ করছেন, এমন সময় ঐ পাঁচ ছয় ফুট উঁচু থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ করে বালিকাটি স্টেজের ওপর পড়ে গেল। সম্ভবত অনবধানবশতঃ যান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি ছিল।

তাড়াতাড়ি সামনের পর্দা ফেলে দেওয়া হল। দর্শকমহলে গভীর উৎকণ্ঠা : মেয়েটি কি ভীষণ রকম আহত হয়েছে ? মরে যায়নি তো ? অসুস্থ, শ্রান্ত যাদুকরও তাই ভেবে ভীত হলেন। তাঁর ভাগ্য ভালো, বালিকাটির কিছু হয়নি।

পরদিন দেখা গেল শহরময় রটে গেছে যাদুকর অসুস্থতার দরুনই মেয়েটিকে অন্যান্য দিনের মতো নিখুঁতভাবে হিপ্‌নোটাইজ করতে পারেননি ; তাই সেই অসম্পূর্ণ সম্মোহন বালিকাকে বেশিক্ষণ শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে পারেনি। তবু সম্মোহিত ছিল বলেই বালিকাটি অতো উঁচু থেকে পড়েও আঘাত পায়নি।

'হিতে বিপরীত' বলে একটা কথা শোনা যায়। এ ক্ষেত্রে যাদুকর 'রয় দি মিষ্টিক'-এর পক্ষে 'বিপরীতে হিত' হলো। লোকমুখে প্রচারিত হয়ে গেল বালিকাটিকে সত্যি সত্যিই হিপনোটিজম্ বা সম্মোহন শক্তির সাহায্যে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা হয়, অর্থাৎ হিপনোটিজম দ্বারাই মাধ্যাকর্ষণকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হয়, এর ভেতর কোনো ফাঁকি বা চালাকি নেই। এর ফলে তাঁর যাদু-প্রদর্শনীতে লোকসমাগম বৃদ্ধি পেতে লাগল।

কয়েকটি যাদু-খেলার কথা

আজকাল উল্লেখযোগ্য মঞ্চ-যাদুকরদের ভেতর প্রায় সবাই দেখিয়ে থাকেন একটি রোমাঞ্চকর খেলা : Sawing a woman in half, অর্থাৎ একটি রমণীকে করাত দিয়ে দু-টুকরো করা (এবং পরে আবার আস্তো করা)। খেলাটির অবশ্য বিভিন্ন রকম এবং পদ্ধতি আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিরই মূল কথা হচ্ছে একটি জলজ্যান্ত রমণীকে দর্শকদের চোখের সামনে কেটে আবার আস্তো করা।

ফরাসী যাদুসম্রাট রবেয়ার উদ্যাঁর (১৮০৫-১৮৭১) "আত্মস্মৃতি" গ্রন্থে এভাবে মানুষ কেটে আস্তো করা খেলার কথা প্রথম পাওয়া যায়। উদ্যাঁ লিখেছেন তাঁর গুরুস্থানীয় ফরাসী যাদুকর টরিনি কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ শহরে তুর্কি সুলতানের প্রাসাদে এ খেলা দেখিয়েছিলেন উনিশ শতকের প্রথম দিকে। উদ্যাঁর বর্ণনা থেকে যা জানা যায় তা সংক্ষেপে এই রকম :

খেলা দেখাবার সময় টরিনি সুলতানের কাছ থেকে একটি দামী মুক্তার হার চেয়ে নিয়ে সেটি তাঁর (টরিনির) দলের একটি মেয়ের হাতে দিলেন, দিয়ে বিভিন্ন যাদুর খেলা দেখাতে লাগলেন। খেলার শেষে মেয়েটির কাছে মুক্তার হারটি চাইতেই দেখা গেলো সেটি তার কাছে নেই। সুলতান পরিবারের মুক্তাহার হারিয়েছে মেয়েটা! ভীষণ চটে উঠে তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন যাদুকর টরিনি। আনালেন একটা কাঠের বাক্সো। তার ভেতরে জোর করে মেয়েটিকে পুরে দিয়ে বাক্সো বন্ধ করে দিলেন। প্রাণের ভয়ে মেয়েটির সে কি ছটফটানি আর চীৎকার! কিন্তু ক্রুদ্ধ যাদুকরের মন গললো না তাতে। তিনি লম্বা একটা করাত নিয়ে তাই দিয়ে বাক্সোটিকে ঠিক মাঝামাঝি কেটে দুভাগ করতে লাগলেন। যাদুকর নির্মম হাতে করাত চালাচ্ছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বাক্সোর ভেতর থেকে চীৎকার করছে অসহায়া মেয়েটি। জ্যান্ত মানুষকে অমন ভাবে করাত দিয়ে চেরা হতে থাকলে সে বেচারা চেঁচাবে বইকি!

সুলতানের হারেমের অসূর্যম্পশ্যা মহিলারা যাদুকর টরিনির খেলা দেখছিলেন চিকের আড়ালে অদৃশ্য থেকে, অভিভূত হচ্ছিলেন বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে। তাঁরা এই অমানুষিক বীভৎস ব্যাপার দেখে আতঙ্কে আর সহানুভূতিতে চীৎকার করে উঠলেন। যাদুকর বললেন, "আপনারা ভয় পাবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বলে করাত চালানোর কাজ শেষ করলেন, তারপর সেই কাটা বাক্সোর আধখানা একধারে আর আধখানা অন্যধারে উপুড় করে রেখে দিলেন, যেন এধারে আধা বাক্সের তলায় ঢাকা রইলো সেই মেয়েটির আধখানা, আর ওধারে আধা বাক্সোর তলায় ঢাকা রইলো মেয়েটির বাকি আধখানা। তারপর সেই দুটি ঢাকা তুলে বেরিয়ে এলো—দুটি আধা মেয়ে নয়, একরকম চেহারার দুটি আস্ত মেয়ে! তারা দুজনে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গিয়ে সুলতানের হাতে ফিরিয়ে দিল তাঁর মুক্তার মালা।

উদ্যাঁর "আত্মস্মৃতি" গ্রন্থে লিখিত এই কাহিনীটিই সম্ভবত উদ্বুদ্ধ করেছিল একটি তরুণীকে করাত দিয়ে কেটে দু টুকরো করে আলাদা করে ফেলে আবার তাকেই আস্ত বানানোর খেলার (Sawing a woman in half) সর্বপ্রথম উদ্ভাবক-প্রদর্শক ইংরাজ যাদুকর 'সেলবিট'-কে (Selbit)। 'সলবিট'-এর আসল নাম ছিল পার্সি টিব্‌ল্‌স্ (Percy Tibbles); নিজের পদবিটি উল্টে বানান করে তিনি পেশাদারি নামটি পেয়েছিলেন।

সেল্‌বিট তাঁর উদ্ভাবিত এই খেলাটি সর্বপ্রথম দেখিয়েছিলেন লণ্ডনের রঙ্গালয়ে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। খেলাটি যে অভূতপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল সাধারণ দর্শক-মহলে তা তো বটেই, এমন কি যাদুকর মহলেও, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ এ খেলাটি এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুর খেলা।

সেল্‌বিটের খেলাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করি। মেয়েটিকে সটান শোয়ানো হলো তারই সমান লম্বা একটি কাঠের বাক্সের ভেতর। বাক্সোটি অতি সাধারণ, তার ভেতর কোনোরকম চাতুরি নেই। মেয়েটি লম্বা হয়ে শুয়ে রইলো দুটি হাত গুটিয়ে দু হাতের কব্জি দুটি কাঁধের কাছাকাছি রেখে। বাক্সোটির লম্বার দুধারে দুটি দুটি করে মোট চারটি ছ্যাঁদা রয়েছে দড়ি গলাবার মতো—দুটি ছ্যাঁদা মেয়েটির দুটি পায়ের গোড়ালির কাছাকাছি, বাকি দুটি তার কাঁধের কাছাকাছি। পাঁচ নম্বর ছ্যাঁদাটি বাক্সোটির পিছন দিকে, মেয়েটির গলার কাছাকাছি।

বাক্সোটিকে রাখা হয়েছে দুপাশে রাখা দুটি টুলের ওপর, যাতে বাক্সের তলা দিয়েও পরিষ্কার দেখা যায়। একটুকরো দড়ির এক মাথা মেয়েটির গলায় জড়িয়ে শক্ত গেরো বেঁধে দড়ির অন্য মাথাটা পিছনের ছ্যাঁদা দিয়ে বার করে দেওয়া হলো। আরো চার টুকরো দড়ি দিয়ে মেয়েটির দুপায়ের আর দুহাতের কব্জি কষে বেঁধে দড়ির খোলা মাথা চারটি যথাক্রমে চারটি ছ্যাঁদার মধ্য দিয়ে গলিয়ে বাইরে বার করে দেওয়া হলো। দর্শকদের ভেতর থেকে পাঁচজন মঞ্চের ওপর উঠে এসেছেন।

এঁরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দর্শক, যাদুকরের সঙ্গে এঁদের কোনোরকম যোগাযোগ নেই। এঁরা বাইরে থেকে পাঁচটি দড়ির পাঁচ মাথা এমনভাবে টেনে ধরে রইলেন, যে এঁরা এভাবে দড়ি ধরে বসে থাকলে বাক্সোর ভেতর মেয়েটির হাত, পা বা মাথা নাড়াবার উপায় নেই—অসহায় ভাবে চিৎ হয়ে তাকে শুয়ে থাকতে হবে। বাক্সোটির ডালা বন্ধ করে দেবার আগে মঞ্চে আমন্ত্রিত পাঁচজন ভদ্রলোকই ভালো করে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নিলেন মেয়েটি সত্যিই হাত পা আর মাথা দড়ি দিয়ে আটকানো অবস্থায় অসহায়া বন্দিনী, এঁরা পাঁচজন দড়ি টেনে রাখলে তার নড়াচড়া করার উপায় নেই। এই অবস্থায় বাক্সোটির ডালা বন্ধ করে দেওয়া হলো, এবং সেই পাঁচজন নিরপেক্ষ দর্শক বাইরে থেকে দড়ি টেনে ধরে রইলেন, এক মুহূর্তের জন্যেও দড়ির টান এতটুকু আল্‌গা হতে দিলেন না।

সেই অবস্থাতেই যাদুকর বাক্সের ঠিক মাঝখানে হাত-করাত চালিয়ে বাক্সোটিকে কেটে দুভাগ করে দুটি দিক চৌকো চাক্তি দিয়ে ঢেকে বাক্সের দুটি ভাগ দুদিকে সরিয়ে দিয়ে মাঝখান দিয়ে হেঁটে দেখালেন দুটি ভাগ সত্যিই বিচ্ছিন্ন। তারপর আবার বাক্সের দুটি ভাগ মুখোমুখি করে চৌকো চাক্তি দুটি তুলে নেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের ডালা খুলে দেখা গেলো মেয়েটি তেমনি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বাক্সের ভেতর; তার হাত, পা আর গলা তেমনি দড়ির বাঁধনে বাঁধা, পাঁচজন ভদ্রলোক এক মুহূর্তের জন্যেও দড়ির টান আল্‌গা করেননি এতটুকু। বন্দিনী মেয়েটির হাত, পা আর গলা থেকে দড়ির বাঁধন কেটে দেওয়া হলো, মেয়েটি সম্পূর্ণ অক্ষতদেহে নেমে এলো বাক্সোর ভেতর থেকে।

অসাধারণ বিস্ময়কর খেলা। একাধিক যাদুরসিকের মতে এই জাতীয় খেলার ভেতর সেল্‌বিট-এর এই খেলাটিই বিস্ময় সৃষ্টির দিক দিয়ে এবং প্রদর্শকের কৃতিত্বের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমেরিকায় এ খেলার বর্ণনা শুনলেন অসাধারণ যাদুকর হোরেস্ গোলডিন। সেল্‌বিট-এর এই খেলাটিকে একটা যেন চ্যালেঞ্জের মতো মনে হলো তাঁর। মাথা খাটিয়ে তিনিও এ খেলা দেখাবার নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন, সেলবিট-এর পদ্ধতি থেকে আলাদা ধরনের। সেল্‌বিট-এর কয়েক মাস পরেই, ১৯২১ সালের জুলাই মাসে, গোলডিনের করাতের সাহায্যে তরুণী-কর্তন খেলাটি বিভিন্ন শহরে দেখানো হতে লাগল। সেল্‌বিট-এর চাইতে অনেক বেশী উদ্যোগী, দ্রুতকর্মী এবং করিৎকর্মা ছিলেন গোলডিন। তাই সেল্‌বিটের চাইতে অনেক বেশি সাড়া জাগিয়ে অনেক বেশি পরিমাণে এবং অনেক বেশি এলাকায় খ্যাতি (এবং অর্থ) অর্জন করলেন তিনি।

সেল্‌বিটের খেলা থেকে বিভিন্নতা বোঝাবার জন্তে গোলডিনের খেলাটির খুব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছি। একটি টেবিলের ওপর একটি বাক্স রয়েছে। বাক্সটি খুলে নিঃসন্দেহে খালি দেখিয়ে দেওয়া হলো। মেয়েটি (যাকে করাত দিয়ে কাটা হবে) সেই খালি বাক্সের ভেতর ঢুকে শুয়ে পড়ল, কিন্তু বাক্সটি লম্বায় মেয়েটির চাইতে কম বলে তার দুটি পা একদিকে আর মাথা অন্য দিকে বেরিয়ে রইল। (পা এবং মাথা বাইরে গলিয়ে দেবার জন্য বাক্সের দুধারে গোলাকার ফাঁকের ব্যবস্থা আছে।) এ অবস্থায় টেবিলসুদ্ধ বাক্সটিকে চারধারে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল কোথাও কোনো চালাকি নেই। দর্শকদের ভেতর থেকে দুজন (বা ততোধিক) প্রতিনিধি এসে পা এবং মাথার দিকে রইলেন; তাঁরা পা এবং মাথা ধরে থাকতেও পারেন। দর্শকরাও সবাই একই সময়ে মেয়েটির পা এবং মাথা বাক্সর দুধার দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। এ অবস্থায় বাক্সটিকে করাত দিয়ে কেটে দুভাগ করে টেবিলের দুপাশে সরিয়ে দেওয়া হল, দর্শকেরা সভয়ে দেখলেন বাক্সের দুটি বিচ্ছিন্ন অর্ধাংশের মাঝখানে একহাত ফাঁক। অবশ্য দুটি ভাগ দুপাশে সরিয়ে নেবার আগে বাক্সের কাটা মুখ দুটো ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।

তারপর বাক্সটির কাটা মুখ দুটো আবার মুখোমুখি লাগিয়ে দিয়ে পরে মেয়েটিকে আস্তো এবং অক্ষত দেহেই বাক্সের বাইরে আনা হল। বাক্সের দুধারে বেরিয়ে থাকা পা দুটি এবং মাথা সব সময়ে দর্শকদের নজরে ছিল, বাক্সটির দ্বিখণ্ডিত অবস্থাতেও। তাহলে কাটা মেয়েটি আবার আস্ত হল কি করে?

বিস্ময়কর খেলা, সন্দেহ নেই। পরে বিখ্যাত মার্কিন যাদুকর হাউয়ার্ড থার্সটন (Howard Thurston) এবং ডেনমার্ক-দেশীয় যাদুকর 'দান্তের'-র (Harry A. Jansen) যাদু প্রদর্শনীতেও এ খেলাটি ছিল অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এঁরা অবশ্য নিজেরাও কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এখানেই থেমে রইলেন না হোরেস গোল্‌ডিন। দশ বছর পরে, ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে লণ্ডন প্যালাডিয়ামে (Palladium) তিনি সর্বপ্রথম দেখালেন খোলা টেবিলের ওপর শায়িতা তরুণীকে কোনোরকম আবরণ বা আড়াল ব্যবহার না করে বিদ্যুৎ- চালিত চক্র-করাত (electric circular saw) দিয়ে দুটুকরো করে কেটে আবার আস্ত বানাবার রোমাঞ্চকর খেলা। এ খেলাটিতে বৈদ্যুতিক সুইচ টিপবার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বেগে ঘূর্ণায়মান চক্র-করাতটি যখন ভীষণ শোঁ

শোঁ শব্দ করতে করতে টেবিলের ওপর ছদ্ম মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিতা সুন্দরীর দেহ-মধ্যভাগ লক্ষ্য করে মৃত্যু-দূতের মতো নেমে আসতো, তখন দর্শক মহলে আতঙ্কের শিহরণ জাগা স্বাভাবিক।

এই খেলাটিই পরে বিখ্যাত যাদুকর "ফু মাঞ্চু" (Fu Manchu) তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে একটু নতুন এবং শিহরণময় রূপে দেখাতে শুরু করলেন বৈদ্যুতিক চক্র-করাতের বদলে স্টেজের ওপর থেকে দোলানো একটি বিরাট পেণ্ডিউলাম (Pendulum) ব্যবহার করে। দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডিউলামের মতো এটিও দুলতো স্টেজের এদিক থেকে ওদিকে, আবার ওদিক থেকে এদিকে, আর ধীরে ধীরে নেমে আসতো। পেণ্ডিউলামের তলায় ঝুলানো একটি ইস্পাতের তৈরি ভারি ধারালো চাক্তি (circular steel blade)। স্টেজে টেবিলের ওপর শায়িতা একটি তরুণী, টেবিলের সঙ্গে বাঁধা; তাকেই তার দেহের মাঝামাঝি জায়গায় দুভাগ করে কেটে ফেলতো (?) পেণ্ডিউলামের সেই ধারালো চাক্তিটা। বলা বাহুল্য দ্বিখণ্ডিতা তরুণীটি পুনরায় আস্তো তরুণীতে পরিণত হতেন। এ খেলার পরিকল্পনাও 'ফু মাঞ্চু' সম্ভবত পেয়েছিলেন মার্কিন লেখক এডগার অ্যালান পো-র (Edgar Allan Poe) বিখ্যাত লোমহর্ষক "দ্য পিট অ্যাণ্ড দ্য পেণ্ডিউলাম" (The Pit and the Pendulum) থেকে। এবং খেলাটি বিচ্ছিন্নভাবে একটি যাদুর খেলা হিসেবে না দেখিয়ে তিনি দেখাতেন একটি নাটকীয় নক্শা অভিনয়ে কাহিনীর অঙ্গ হিসেবে।

এখানে বলা অবান্তর হবে না, 'ফু মাঞ্চু'-র আসল নাম ডেভিড ব্যামবার্গ (David Bamberg)। ইনি বিখ্যাত ওলন্দাজ যাদুকর 'ওকিতো' (Okito) অর্থাৎ থিও (Theo) ব্যামবার্গের পুত্র। ওকিতো-র পিতাও ছিলেন হল্যাণ্ডের রাজসভার যাদুকর।

উপরিবর্ণিত বৈদ্যুতিক চক্র-করাতের খেলাটি ভারতীয় যাদুকরদের ভেতর সর্বপ্রথম দেখান পি. সি. সরকার। জনৈক বিশিষ্ট ইংরেজ যাদু-সাহিত্যিক লিখেছেন, "Sorcar, the Indian illusionist, performed it with such zest when he brought his show in London that the audience thought he had sawn the girl in half."

অর্থাৎ "ভারতীয় যাদুকর সরকার যখন তাঁর যাদু প্রদর্শনী নিয়ে লণ্ডনে এসেছিলেন, তখন এই খেলাটি এমন তীব্র উৎসাহের সঙ্গে দেখিয়েছিলেন যে, দর্শকেরা ভেবেছিলেন তিনি মেয়েটিকে সত্যিই দুটুকরো করে কেটে ফেলেছেন।" এ

খেলাটি তারপর দেখান "দেবকুমার", ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত, জি কুমার, এ. সি. সরকার (A. C. Sorcar) প্রমুখ একাধিক যাদুকর। সাম্প্রতিককালে এ খেলাটি যাঁরা দেখাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে আছেন যাদুকর কে. লাল (কান্তিলাল গিরধরলাল ভোরা)।

এ খেলায় যাদুকর ডি. সি. দত্ত খোলা টেবিলের ওপর বৈদ্যুতিক করাতের বদলে হাত-করাত ব্যবহার করেন।

'সেল্‌বিট (Selbit)-প্রবর্তিত খেলাটি (সর্বপ্রথম যেটি বর্ণনা করেছি) সুন্দর-ভাবে দেখান যাদুকর মৃণাল রায়।

এই সঙ্গে বাংলার যাদু-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর আরেকটি অসাধারণ কৃতিত্বের কথা বলা অবান্তর হবে না, যাতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার আগে বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন যাদুকর "ভার্জিল"-এর (Virgil) বিরাট যাদু-প্রদর্শনীর অন্তর্গত একটি খেলার কথা বলা দরকার। ভার্জিলের খেলার ফর্দে এ খেলাটির নাম "মনের রহস্য" (Mysteries of the mind)। এটি তিনি কলকাতার নিউ এম্পায়ার হলে তাঁর যাদু-প্রদর্শনীতে দেখিয়ে গেছেন ১৯৫৪ সালে। তারপর ১৯৫৬ সালে ইংলণ্ড সফর কালে ১৫ই মে তারিখে ব্রাডফোর্ড (Bradford) শহরের আলহামরা থিয়েটারে (The Alhambra Theature) ভার্জিলের যে যাদু-প্রদর্শনী হয়েছিল, একজন বিশিষ্ট যাদু-সমালোচক তার বিবরণীতে এ খেলাটির নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন :

ভার্জিল প্রথমেই মঞ্চে তার যাদুসঙ্গিনী জুলি-কে (Julie) উপস্থিত করে বলে নেন এটি কোনো চালাকির খেলা নয় (not a trick), স্মৃতিশক্তির বাহাদুরি মাত্র। স্টেজের ওপর একটি কালো বোর্ডের বুকে দর্শকমহল থেকে আমন্ত্রিত যে কেউ এসে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত সংখ্যা পর পর লিখে ফেলেন। তারপর বিভিন্ন জিনিসের নাম করা হতে থাকে (বিভিন্ন দর্শকদের দ্বারা, তাঁদের খুশিমতো এলোমেলো ভাবে), আর সেই জিনিসগুলোর নাম এক একটি সংখ্যার পাশে (এলোমেলো-ভাবে, যাঁরা জিনিসের নাম বলছেন তাঁদের খেয়ালখুশি মতো) লেখা হতে থাকে। ভার্জিলের যাদু-সঙ্গিনী জুলি তখন চোখ বাঁধা অবস্থায় স্টেজের একধারে বোর্ডের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। এভাবে কুড়িটি বিভিন্ন জিনিসের নাম কুড়িটি সংখ্যার পাশে লেখা হয়ে যায়। তখন বোর্ডে লেখা যে কোনো জিনিসের নাম বললেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সংখ্যার পাশে লেখা সংখ্যাটি বলে দেন। সর্বশেষে জুলি দ্রুতবেগে সবগুলি জিনিসের নাম পর পর বলে যান এবং দর্শকবৃন্দের (এই আশ্চর্য খেলা দেখে) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেন।

কুড়িটি জিনিসের নাম ওভাবে মনে রাখা এবং চটপট বলা বাহাদুরি বটে। কিন্তু কুড়ির বদলে সংখ্যাটি যদি হয় ষাট, এবং শুধু জিনিসের নাম না বলে দর্শকরা যদি পৃথিবীর যে কোন ভাষার যে কোনো শব্দ, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি বলার স্বাধীনতা পান, তাহলে খেলাটি আরো অনেক বেশি কঠিন হয়ে প্রায় অসাধ্য সাধনের পর্যায়েই পড়ে না কি ? এই 'অসাধ্য সাধন'-ই করে দেখিয়েছেন যাদুকর মৃণাল রায়, এবং তাঁরই শিক্ষায় তৈরি তাঁর দুই কিশোরী ছাত্রী দীপ্তি দত্ত এবং মৈত্রেয়ী ঘোষ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্মৃতিশক্তির এই বিস্ময়কর খেলা দেখিয়ে এঁরা বহুজনকে বিস্মিত এবং মুগ্ধ করেছেন। সম্প্রতি স্কুলের ছাত্রী কুমারী দীপ্তি দাঁ মৃণাল রায়ের শিক্ষাধীনে পঁচিশ সংখ্যা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় যাদুকর মৃণাল রায় বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন যাদুকর ভার্জিল-কে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছেন।

* * *

ফরাসী যাদুসম্রাট উদ্যাঁ প্রসঙ্গে প্রথমেই (পৃষ্ঠা ১৫০) যে খেলাটির বর্ণনা করেছি—একটি খাড়া ডাণ্ডার মাথায় শুধু এক হাতের কনুই ঠেকিয়ে কাউকে হাওয়ায় (অথবা শূন্যে) ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে লম্বালম্বি শুইয়ে রাখা—সে খেলাটি যাদুজগতে 'ইথারিয়্যাল বা এরিয়্যাল সাসপেনশন' (Ethereal or Aerial Suspension) নামে পরিচিত।

খেলাটি উদ্যাঁ লণ্ডনে দেখিয়েছিলেন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। লণ্ডনেই তাঁর কাছাকাছি সময়ে এই খেলাটি দেখিয়েছিলেন আরো দুজন বিচক্ষণ যাদুকর : জন হেনরি অ্যাণ্ডারসন বা 'উইজার্ড অভ দ্য নর্থ' (উত্তর দেশের যাদুকর) এবং কম্পার্স হারম্যান (Compars Herrmann)। যাদুকর হ্যারি হুডিনি লিখেছেন, ঠিক সেই সময়েই এই খেলাটি মার্কিন মুলুকে দেখাচ্ছিলেন 'আলেক্জাণ্ডার' নামে একজন বিশিষ্ট যাদুকর। তিনি জাতিতে জার্মান, পুরো নাম আলেক্জাণ্ডার হাইমবুর্গার (Alexander Heimburgher)। তাঁর বিভিন্ন কাগজপত্রাদির মধ্যে এক জায়গায় তাঁর প্রদর্শিত শূন্যে মানুষ ভাসিয়ে রাখার (Suspension) খেলাটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"আমি এ খেলাটি দেখাতে শুরু করেছিলাম ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে, ভারতে প্রকাশিত এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্মচারী দ্বারা সম্পাদিত একটি বার্ষিকীতে একজন ফকিরের (যাদুকরের) যাদু-খেলার বর্ণনা পড়বার পর। এই ফকিরটি একটি বাঁশের লাঠি ব্যবহার করে তাঁর এক সঙ্গীকে হাওয়ার (শূন্যের) ওপর বসিয়ে রাখতেন।…"

উনিশ শতকের শেষের দিকের একজন ইংরেজ লেখক উদ্যার খেলাটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তার সারমর্ম এই : উদ্যা ভান করতেন 'ঘনীভূত ইথার'-এর সাহায্যেই তিনি ছেলেকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখছেন। এ খেলাটা একটু অন্যভাবে বহু বছর আগে থেকেই দেখিয়ে আসছিলেন ভারতের যাদুকরেরা, (এবং তাঁদের কৌশলটিই উদ্যা কাজে লাগিয়েছিলেন), কিন্তু সে সময়ে 'মেস্‌মেরিজম্‌'-এর হিড়িক বা হুজুগ এমন চালু ছিল, যে কোনো রকম যান্ত্রিক গুপ্ত কৌশল ছাড়াই একটা খাড়া ডাণ্ডার ডগায় কনুই ঠেকিয়ে উদ্যার ছেলেটি শূন্যে ভাসছে, একথা লোকে সহজেই বিশ্বাস করে নিয়েছিল. খেলাটির ভিত্তিতে যে যান্ত্রিক কৌশল রয়েছে সে সন্দেহ কারও মনে জাগেনি, জাগবার সুযোগ পায়নি।

এই খেলার আলোচনায় যাদুকর হ্যারি হুডিনি একজন ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করেছেন. উনিশ শতকের শেষ দিকভাগে প্রকাশিত একজন ইংরেজ লেখকের গ্রন্থ থেকে। ১৮৩২ সালে এই ব্রাহ্মণটি মাদ্রাজে দেখিয়েছিলেন শূন্যে বসে থাকার (Suspension) খেলা। তাঁর সরঞ্জামের ভেতর ছিল চার-পায়াওয়ালা একটি তক্তা, তার এক ধারে একটি গর্ত (socket)। এই গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে একটা বাঁশের লাঠি খাড়া করে রাখতেন তিনি। এই বাঁশের লাঠির সঙ্গে আটকে দিতেন আরেকটা ছোট ডাণ্ডা, বাঁশের লাঠির সমকোণে অর্থাৎ ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে। অল্প কিছুক্ষণের জন্য তার সামনে একটা পর্দা কাপড়ের আড়াল দেওয়া হতো। আড়াল সরিয়ে নিলেই দেখা যেতো ব্রাহ্মণ হাওয়ার ওপর বসে মাটি থেকে গজ দেড়েক উঁচুতে, ডান হাতের কব্জির কাছাকাছি আলগাভাবে ভর করে আছেন ছোটো ডাণ্ডাটির ওপর, আর সেই হাতেই জপের মালা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাম জপ করছেন, বা হাতটা ওপর দিকে তুলে রেখে। তারপর আবার একটু আড়াল দিয়ে সে আড়াল সরিয়ে নিতেই দেখা যেতো যাদুকর ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন মাটির ওপর।

উক্ত ইংরেজ লেখক টমাস্ ফ্রস্ট (Thomas Frost) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লিখেছেন :

"While the conjuring art seemed to be declining in Europe, Indian conjurers were exhibiting in their own land the marvels which have since attracted wondering crowds to the temples of magic which their imitators have set up in the capitals of the West. The aerial suspension was performed half a century ago at Madras by an old Brahmin, with no better apparatus than a

piece of plank which, with four legs, he formed into an oblong stool; and upon which, in a little brass socket, he placed, in a perpendicular position, a hollow bamboo, from which projected a kind of crutch, covered with a piece of common hide...”

ভাবার্থ : “ইউরোপে যখন যাদু ঝিমিয়ে পড়বার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো, তখন ভারতীয় যাদুকরেরা তাদের নিজের দেশে নানা রকম বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখাচ্ছিলেন। ভারতীয় যাদুকরদের সেই সব খেলার নকল করেই তারপর পাশ্চাত্য দেশের রাজধানীগুলোতে পাশ্চাত্য যাদুকরেরা তাদের যাদু-মন্দিরে ঝাঁকে ঝাঁকে বিস্মিত দর্শকদের আকর্ষণ করেছিলেন। মানুষকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখার খেলা আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী আগে মাদ্রাজে দেখিয়েছিলেন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।...” ইত্যাদি।

উদ্দা-প্রদর্শিত ধরনে ‘শূন্যে শয়ন’ (aerial suspension) খেলাটি ভারতে সর্বপ্রথম কে দেখিয়েছিলেন জানি না। আমি সর্বপ্রথম দেখেছিলাম ১৯২৬ সালে, ঢাকা রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে, যাদুকর “রয় দ্য মিস্টিক”-এর যাদু প্রদর্শনীতে। তিনি যাঁর যাদু প্রদর্শনীতে এই খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাদুকর বৃত্তি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তিনি সেকালের বিশিষ্ট যাদুকর এমনি গুরাবর্দি।

খেলাটি এর পরে আমাদের দেশের যাদুকরদের মধ্যে যারা দেখিয়েছেন অথবা দেখিয়ে থাকেন, তাদের মধ্যে আছেন পি. সি. সরকার, যতীন সাহা, জি. কুমার, এ. সি. সরকার, ‘গোগিয়া পাশা’ (ধনরাজ গোগিয়া) প্রভৃতি।

*   *   *

রবেয়ার উদ্দা তাঁর শূন্যে মানুষ ভাসিয়ে রাখার খেলা (ethereal বা aerial suspension) দেখিয়ে যাবার পর লণ্ডনে সিলভেস্টার (Sylvester) নামে এক ভদ্রলোক “উলু-র ফকির” (Fakir of Oolu) নামে যাদু-প্রদর্শন করতেন। উদ্দার খেলাটিকে তিনি মাথা খাটিয়ে আরো চমকপ্রদ বানালেন। উদ্দার কায়দাতেই তিনি তাঁর যাদু-সহকারিণী সুন্দরীকে একটি-মাত্র লাঠির ডগায় কনুই ভর করিয়ে শূন্যে শুইয়ে রাখতেন, তারপর তাঁর কনুইয়ের তলা থেকে সেই এক-মাত্র লাঠিটিও সরিয়ে নিয়ে যেতেন, সুন্দরীকে সম্পূর্ণ শূন্যে ভাসিয়ে রেখে।

এই শূন্যে ভাসিয়ে রাখা (Suspension) খেলাটির আরেক ধাপ ওপরে উঠলেন ১৮৬৭ সালে যাদুকর জন নেভিল ম্যাসকেলিন (John Nevil Maskelyne)। লণ্ডনের এক বিশিষ্ট রঙ্গালয়ে যাদু-প্রদর্শনীতে তাঁর যাদু-সহকারিণী হলেন তাঁর

স্ত্রী। শ্রীমতী ম্যাসকেলিনকে সম্মোহিতা করে একটি বেদীর ওপর শোয়ানো হলো। যাদুকরের আদেশে শ্রীমতী ম্যাসকেলিনের সুপ্তদেহ ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে গেলো, তারপর আবার ধীরে ধীরে যথাস্থানে নেমে এলো। এ খেলার নাম 'লেভিটেশন' (levitation) অর্থাৎ 'শূন্যে উত্থান'। 'আগা' (Aga) নামেও এ খেলাটি পরিচিত। এই খেলাটিই (সম্ভবতঃ আবিষ্কারক ম্যাসকেলিনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেই) আমেরিকায় দেখাতে লাগলেন বিখ্যাত যাদুকর হ্যারি কেলার (Harry Kellar); তিনি এই খেলাটির নাম দিয়েছিলেন "Levitation of Princess Karnac" বা "রাজকুমারী কর্ণাকের শূন্যে উত্থান"। কেলার ছিলেন রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়। এ খেলাটি তাঁর পরিবেশনে প্রাচীন মিশরী রহস্যের আবহাওয়া এনে অপরূপ মায়াজালের সৃষ্টি করতো। কেলারের পর তাঁর এই খেলাটি দেখাতে থাকেন তাঁর উত্তর সাধক স্বনামধন্য যাদুকর হাওয়ার্ড থার্সটন। এ খেলাটি ১৯০৬ সালে এসে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে দেখিয়ে সাড়া জাগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শূন্যে ভেসেছিলেন সুন্দরী শ্রীমতী থার্সটন। ম্যাসকেলিন-আবিষ্কৃত এই শূন্যে উত্থানের খেলাটিতে আরেকটি হঠাৎ বিস্ময় যোগ করেছিলেন বিখ্যাত বেলজিয়ান যাদুকর সার্ভে লে-রয় (Servais Le Roy), ইংল্যাণ্ডের অন্যতম সেরা যাদুকর ডেভিড ডেভাণ্ট-এর (David Devant) প্রথম শিক্ষা-গুরু। এ খেলায় মেয়েটিকে সম্মোহিতা করে শুইয়ে দিয়ে একটি রেশমী চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। চাদর ঢাকা মেয়েটি ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে যেতে থাকে। তারপর যাদুকরের আদেশ মাত্রেই চাদরটির তলা থেকে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় এবং শূন্য চাদরটি পড়ে যায়, অথবা সহসা চাদরটির এক কোণ ধরে টানতেই দেখা যায় যাদুকরের হাতে শুধু চাদরটি আছে, মেয়েটি রহস্যজনক-ভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এ খেলাটিই 'আস্রা' (Asrah) নামে বিখ্যাত।

* * *

ইংরেজ লেখক টমাস ফ্রস্ট Thomas Frost বিখ্যাত "ভারতীয় ঝুড়ির খেলা"-র (The Indian Basket Trick) একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন পাদ্রী হোবার্ট কণ্টার-এর (Reverend Hobart Caunter) লেখা থেকে। পাদ্রী কণ্টার ঐ ১৮৩২ সালেরই কাছাকাছি কোনো সময়ে ভারত ভ্রমণ করেছিলেন কয়েকজন বন্ধু সহ। মাদ্রাজ শহর থেকে বারো মাইল দূরে খোলা মাঠে খেলাটি দেখে খেলাটিকে যাদুর ইতিহাসে অভূতপূর্ব বলে মনে হয়েছিল তাঁর। তিনি বলেছেন :

"একজন মোটাসোটা ভীষণ চেহারার মানুষ এগিয়ে এলো একটা অতি সাধারণ বেতের ঝুড়ি নিয়ে। তারই অনুরোধে আমরা ঝুড়িটাকে খুব ভালো-ভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম। লোকটি একটি বছর আটেক বয়সের মেয়েকে ঐ ঝুড়িটা দিয়ে ঢেকে রেখে কিছুক্ষণ ঐ ঝুড়ি-ঢাকা মেয়েটির সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে কথা-বার্তা বললো। আমাদের মাত্র কয়েক ফুট দূরে ঝুড়ির তলা থেকে মেয়েটির কণ্ঠস্বর এমন পরিষ্কার শোনা গেল যে মেয়েটি যে ঐ ঝুড়ির তলাতেই রয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহই রইলো না।

"অল্প কিছুক্ষণ ধরে তাদের কথাবার্তা চলল। তারপর সেই যাদুকর হঠাৎ ক্ষেপে উঠে বলতে লাগল মেয়েটিকে সে হত্যা করবে। মেয়েটি কাতর স্বরে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগল। যাদুকর এক পা দিয়ে বেতের ঝুড়িটাকে চেপে রেখে হাতে একটা তলোয়ারের ডগা দিয়ে বারবার ঝুড়ির ভেতর খোঁচা মারতে লাগল। এসময়ে তার চোখে মুখে ভীষণ অমানুষিক ভাব ফুটে উঠল। ঝুড়ির তলায় বন্দিনী মেয়েটার চীৎকার এতো বাস্তব, যে কিছুক্ষণের জন্যে আমার শরীরের সব রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল। ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে শয়তান লোকটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই—কিন্তু লোকটার হাতে তলোয়ার, আর আমি নিরস্ত্র। আমি আমার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁরা ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।...

"ঝুড়ির তলা থেকে রক্তের স্রোত বেরিয়ে আসতে লাগল। ঝুড়ির তলায় মেয়েটির ছটফটানি আর যন্ত্রণার আর্তনাদ আঘাত করতে লাগল আমাদের মর্মে এসে। ধীরে ধীরে থেমে গেল ছটফটানি আর আর্তনাদ, মনে হল যেন মেয়েটির নিষ্পাপ আত্মা তার রক্তাক্ত দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে গেল। তারপরই আমাদের অবর্ণনীয় বিস্ময় আর স্বস্তির পালা। যাদুকর ঝুড়িটা তুলে নিতেই দেখা গেল মেয়েটি অদৃশ্য! জায়গাটা অবশ্য রক্তে লাল, কিন্তু দেহের এতোটুকু অংশ পর্যন্ত নেই। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখলাম সেই মেয়েটিই ভিড়ের ভেতর থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বকশিশ চাইছে। খুশী হয়েই আমরা তা দিলাম। ওরাও আশাতীত মোটা বকশিশ পেয়ে খুশী হয়ে চলে গেল। এ খেলায় সব চেয়ে বেশি বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল এই যে যাদুকর লোকটি সব সময়ে দর্শকমণ্ডলী থেকে তফাতে ছিল, তার কয়েক ফুটের মধ্যেও কেউ ছিল না।"

পাদ্রী কণ্টার যেমনটি দেখেছিলেন হুবহু তেমনটিই বর্ণনা করতে পেরেছেন, না স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়ে বাস্তব থেকে তাঁর কিঞ্চিৎ বিচ্যুতি ঘটেছে জানি না, কিন্তু ভারতীয় ভ্রাম্যমাণ যাদুকরদের প্রদর্শিত এই বিখ্যাত খেলাটির প্রচলিত

সাধারণ রূপ এ থেকে একটু আলাদা। বরং রবেয়ার উদ্যা-র ভ্রম দেখাতে গিয়ে যাদুকর হ্যারি হুডিনি খেলাটির যেরূপ বর্ণনা দিয়েছেন সেটি সত্যের কাছাকাছি। সেটি খুব সংক্ষেপে এই :

ঝুড়িটি মাটির ওপর চিৎ করে পাতা আছে। ঝুড়িটির মুখের বেড় তলার বেড়ের চাইতে কিছু ছোটো। একটি ছেলেকে ঝুড়ির ভেতর জোর করে চেপে বসিয়ে দেওয়া হল। দর্শকরা দেখেছেন ঝুড়িটা পুরো ছেলেটির পক্ষে একটু ছোট ; ছেলেটি উপুড় হয়ে ঝুড়ির ভেতর ঢুকতে পারছে না, তার পিঠটা উঁচু হয়ে রয়েছে। ঝুড়ির ঢাকাটা ছেলেটির পিঠের ওপর চাপা দিয়ে সবার ওপর একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল।

এইবার যাদুকর সেই চাদর-ঢাকা ঝুড়ির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে লাফিয়ে নানা-রকম চীৎকার করে সেই ঝুড়িটির গায়ে নানাভাবে আঘাত করতে লাগল। ধীরে ধীরে ঝুড়ির ঢাকাটা নেমে গেল, শেষ পর্যন্ত মনে হল ঝুড়িটা খালি হয়ে গেছে। যাদুকর তখন চাদরটা ঠিক রেখে তার তলা থেকে ঝুড়ির ঢাকাটা সরিয়ে ফেলে চাদরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়ল ঝুড়ির ভেতর, আর তার ভেতর ঘুরে ঘুরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দেখিয়ে দিল। ঝুড়ি খালি হয়ে গেছে। তারপর ঝুড়ির ভেতরটা জুড়ে বসে পড়ল যাদুকর, কোনো রকমে ঝুড়িটির ভেতর আঁটসাঁট হয়ে। আশ্চর্য, কোন ফাঁকে কোথায় কেমন করে পালিয়ে গেল ছেলেটা ?

যাদুকর এইবার শূন্য ঝুড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুড়ির মুখের ওপর আবার ঢাকাটা চাপিয়ে দিয়ে সরিয়ে নিল চাদরটা। তারপর সেই মুখ-বন্ধ ঝুড়িটার ভেতর এলোমেলো ভাবে তলোয়ারের খোঁচা এমনভাবে চালাতে লাগল যে ভেতরে কেউ থাকলে তার আর নিস্তার নেই।

তারপর কিছুক্ষণ ধরে সেই মুখবন্ধ ঝুড়িটিকে ঘিরে আবার যাদুকরের লম্ফ-ঝম্ফ, চীৎকার, বাজনা, শীস ইত্যাদি। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল ঝুড়িটা দুলতে আরম্ভ করেছে, তারপর ঢাকাটা ওপর দিকে ঠেলে উঠেছে সেই ছেলেটি। আশ্চর্য ! উধাও হয়ে চলে গিয়েছিল, আবার ফিরে এল কি করে ?

কখনো কখনো খেলার শেষটা অন্যরকম হয়। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ছেলেটি আবার ঝুড়ির ভেতর থেকেই বেরিয়ে না এসে দূর থেকে ছুটে আসে।

এ খেলাটি সম্বন্ধে হ্যারি হুডিনি বলেছেন, "The trick is a marvellous deception, but only a Hindoo can do it with success." অর্থাৎ যাদুর খেলা হিসেবে এ খেলাটি অসাধারণ চাতুর্যপূর্ণ, কিন্তু এ খেলাটিকে সফল-

ভাবে দেখানো একমাত্র হিন্দু যাদুকরের পক্ষেই সম্ভব। হিন্দু বলতে অবশ্য হুডিনি 'ভারতীয়' বোঝাচ্ছেন।

হুডিনির এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন কয়েক বছর আগে (১৯৫৪) বিখ্যাত মার্কিন যাদুকর ভার্জিল এবং তাঁর যাদু-সঙ্গিনী জুলি (Virgil & Julie), কলকাতার খোলা ময়দানে ভারতীয় 'মাদারি'দের এই ঝুড়ির খেলা দেখে, তাদের প্রদর্শন-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে।

এখানে বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না, উনিশ শতকের মাঝামাঝি অ্যালফ্রেড স্টোডেয়ার (Alfred Stodare) নামে একজন উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ফরাসি যাদুকর এই ভারতীয় খেলাটির অনুকরণ করেই 'ভারতীয় ঝুড়ির খেলা' (Indian Basket Trick) নামে একটি মঞ্চোপযোগী খেলা লণ্ডনের ইজিপ্শিয়ান হলে দেখিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

এ খেলাটির একটি রূপ মঞ্চে দেখিয়ে থাকেন যাদুকর 'গোগিয়া পাশা' (ধনরাজ গোগিয়া)।

*　　　*　　　*

যাদুর যে খেলাটি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত, সে খেলাটি বোধ হয় কেউ কখনো দেখেননি, দেখবেনও না। খেলাটি "ভারতীয় দড়ির খেলা" (The Indian Rope Trick) নামে খ্যাত। কিম্বদন্তীতে যেরূপ শোনা যায়, তাতে খেলাটির বর্ণনা মোটামুটি এই রকম :

কোনো একটি খোলা ময়দান। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, চারধারে গোল করে ঘিরে রয়েছে দর্শকমণ্ডলী। সেই ফাঁকা জায়গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাদুকর লম্বা একগাছা দড়ি ছুঁড়ে দিলেন আকাশের দিকে। দড়িটি—কি আশ্চর্য! —পড়ে না গিয়ে লম্বা লাঠির মতো সোজা খাড়া হয়ে রইলো। সেই দড়ি বেয়ে যাদুকরের দলের একটি বাচ্চা ছেলে উঠে গেলো, আর দড়ির ডগায় পৌঁছেই বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল। যাদুকরও একটি বড় ধারালো ছুরি মুখে নিয়ে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে মুখ থেকে ছুরিটা ডান হাতে নিয়ে মাথার ওপর চালাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই অদৃশ্য ছেলেটির কাটা হাত, পা, মাথা এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃশ্য হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল। যাদুকর তখন দড়ি বেয়ে মাটিতে নেমে এসে দড়িটা টেনে নীচে এনে গুটিয়ে ফেলে ছেলেটির ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তুলে তুলে একসঙ্গে একটি থলের ভেতর পুরে একটি বাক্সোর ভেতর রেখে দিলেন। কিছুক্ষণ বাদেই বাক্সোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ আস্তো ছেলেটি!

রাজা পঞ্চম জর্জ যখন ১৯০২ সালে যুবরাজরূপে ভারতে এসেছিলেন—যাদু বিদ্যায় তাঁর পিতার মতো তাঁরও উৎসাহ এবং ঔৎসুক্য ছিল—তখন সারা ভারতে অনুসন্ধান করা হয়েছিল কোনো যাদুকর তাঁকে এই খেলাটি দেখাতে পারেন কিনা। কিন্তু মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা সত্ত্বেও এ খেলা দেখাতে সক্ষম কোনো যাদুকর পাওয়া যায়নি। এই শতকের প্রথম দিকে লেফটেনাণ্ট ব্রান্‌সন (Lieutenant L. H. Branson) নামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন নিজেও একজন যাদুকর এবং লণ্ডনের যাদুকর সমিতির বিশিষ্ট সভ্য। ভারতীয় যাদু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি ভারতের নানাস্থানে ঘুরে বহু ভারতীয় যাদুকরদের সঙ্গ করেছিলেন। তাঁরও চেষ্টা এবং মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা ব্যর্থ হয়েছিল। কোনো যাদুকর তাঁকে এ খেলা দেখাতে পারেনি ; এ খেলা স্বচক্ষে দেখেছেন, কিংবা 'প্রত্যক্ষদর্শী'র মুখে এ খেলার বর্ণনা শুনেছেন, এমন কোনো ব্যক্তিরও তিনি সাক্ষাৎ পাননি। বিখ্যাত ইংরাজ যাদুকর এবং যাদু-রঙ্গালয় 'সেইণ্ট জর্জেস হল' (St. George's Hall)-পরিচালক জন নেভিল ম্যাস্‌কেলিন (১৮৩৯-১৯১৭) ঘোষণা করেছিলেন এ খেলাটি দেখাতে পারেন এমন যাদুকর পেলে—তিনি ভারতীয়ই হন বা অভারতীয় হন—তিনি তাঁর এই খেলা প্রদর্শনের জন্য তাঁকে দক্ষিণা দেবেন প্রতি মাসে এক হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ পনেরো হাজার টাকা। এমন একজন যাদুকরের জন্য ম্যাস্‌কেলিন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে ভারতব্যাপী অনুসন্ধান হয়েছিলো, কিন্তু বৃথা।

তা যাই হোক, কিম্বদন্তীটি এখনো মরেনি ; কিম্বদন্তী সহজে মরে না। কিম্বদন্তীটি প্রথমে কি ভাবে শুরু হয়েছিলো তা অনুমান করা বোধ হয় খুব শক্ত নয়। গুজব কিভাবে ছড়ায় এবং তিল থেকে শুরু হয়ে শেষকালে কিভাবে তালে পরিণত হয়, তার উদাহরণ তো আমরা অনেক পেয়েছি।

এই প্রসঙ্গে যাদুকর এ. সি. সরকার সম্পর্কে বছর খানেক আগে শোনা একটি মজার গল্প মনে পড়ছে। ম্যাজিক দেখাতে দেখাতে তিনি নাকি পুরো একটি গীটার গিলে ফেলেছিলেন! "গীটার-কণ্ঠ যাদুকর" এ. সি. সরকার শুধু মাত্র কণ্ঠের সাহায্যে (অবশ্য মাঝে মাঝে ঠোঁটে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টোকা মেরে) চমৎকার গীটার বাজনা শোনানো এবং নানারকম যাদুর খেলা দেখিয়ে তাক লাগানো জানতাম। অনুরোধে ঢেঁকি গেলার গল্পও শুনেছি, কিন্তু যাদুকর এ. সি সরকার পুরো একখানা গীটার গিলেছেন এ গল্প গেলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

গল্পটি এক ভদ্রলোককে শুনিয়ে মন্তব্য করলাম, "এ গল্প যিনি আমাকে বলেছিলেন তিনি বোধ হয় বলবার সময়ে তরল পদার্থের নেশায় আচ্ছন্ন ছিলেন।"

তিনি বললেন, "না, সত্যিই এ. সি. সরকার পুরো গীটার গিলেছিলেন।" তারপর আমার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে যোগ করে দিলেন, "কিন্তু কঠিন (solid) রূপে নয়, তরল রূপে।"

"কি রকম ?"

"গীটারের বাক্সো হাতে স্টেজে এলেন তিনি, গীটারটি হাতে নিয়ে ট্রং টাং করে রেখে দিলেন বাক্সোর ভেতর। বাক্সোর একধারে জলের কলের মুখ লাগানো। তার তলায় একটা কাঁচের গ্লাস ধরে কলের মাথার প্যাচ খুলে দিতেই বাক্সোর ভেতর থেকে কলের মুখ দিয়ে রঙীন পানীয় এসে গ্লাসটা ভরে ফেলল। এক চুমুকে পান করে ফেললেন যাদুকর। একটু পরে বাক্সো খুলতেই দেখা গেলো ভেতর থেকে গীটার অদৃশ্য হয়ে গেছে। অর্থাৎ তরল হয়ে চলে গেছে যাদুকর এ. সি. সরকারের পেটে।"

"তারপর ?"

"ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, তেমনি গীটার তাঁর পেটে গিয়েও বাজতে শুরু করলো। অর্থাৎ গীটার-কণ্ঠ যাদুকর কণ্ঠে গীটার বাজিয়ে শোনালেন।"

এইবার এ. সি. সরকারের গীটার গেলার রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেলো। 'তিনি পুরো একটি গীটার "তরল করে" গিলেছেন,' এ কথাটাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল 'তিনি পুরো একটি গীটার গিলেছেন' এই কথায়।

যাদু-খেলা সম্পর্কে এ ধরনের অনেক গুজব রটে, তার কিছু কিছু উদাহরণ আগেও দিয়েছি। "ভারতীয় দড়ির খেলা" সম্পর্কিত কিম্বদন্তীটি সম্ভবতঃ এই ধরনেরই গুজবের ক্রম-রূপান্তরিত পরিণতি।

"ভারতীয় দড়ির খেলা"টি বিভিন্ন 'নকল' রূপে রঙ্গালয়ের মঞ্চে (খোলা ময়দানে নয়) দেখিয়েছেন একাধিক বিশিষ্ট বিদেশী যাদুকর—হোরেস গোল্‌ডিন, সেসিল লাইল (Cecil Lyle), ম্যাসোনি ("The Great Masoni") প্রভৃতি। কলকাতার একটি মিশ্র অনুষ্ঠানে যাদুকর ডাক্তার ৺কালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ খেলাটি মঞ্চে দেখিয়েছিলেন।

এ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে "হিন্দু যাদুকর" (Hindoo Illusionist) রাজা বোস সেখানকার রঙ্গমঞ্চে জনৈক মার্কিন যাদুকরের প্রদর্শনীর অন্তর্গত "নীল মুক্তা অপহরণ" ("Theft of the Blue Pearl") নামে একটি

ভারতীয় নাট্য-নকশায় (Indian fantasy) 'ভারতীয় দড়ির খেলা'-র মঞ্চ-রূপায়ণে সহায়তা করেছিলেন।

কিন্তু এ খেলাটি খোলা ময়দানে দেখানো আর মঞ্চে দেখানোর ভেতরে লক্ষ মাইলের তফাত। মঞ্চে অনেক অদ্ভুত বিস্ময়ের সৃষ্টি সহজেই করা যায়, মঞ্চের বাইরে যা অসম্ভব।

* * *

সম্প্রতি একদিন কলকাতার একটি ছোটো রাস্তা দিয়ে চলছিলাম—দেশপ্রিয় পার্কের অনতিদূরে। চলছিলাম কি একটা কাজের কথা ভাবতে ভাবতে। দেখলাম, ফুটপাথের ওপর ভিড় জমেছে এক জায়গায়। কৌতূহল হলো। ভিড়ের ভেতর না ঢুকে ভিড়ের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় ভিড়ের অন্য সকলের মাথা আমার চাইতে নিচু হওয়ায় সহজেই দেখতে পেলাম ভিড় জমেছে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ঘিরে। সেই ফাঁকা জায়গার মাঝামাঝি এক বছর-আটেকের ছোট্টো ছেলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর ফাঁকা জায়গার একধারে ভিড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এক ছোকরা মাদারি, অর্থাৎ পথে পথে ভ্রাম্যমাণ যাদুকর। ছোকরা যাদুকরের বয়স মনে হলো আঠারো কি উনিশ, বড় জোর কুড়ি। তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা কাপড়ের থলি—মাদারিদের যেমন থাকে—, যাদুর খেলার কিছু বিচিত্র সরঞ্জাম, সহৃদয় দর্শকবৃন্দের কাছ থেকে দর্শনী সংগ্রহ করবার জন্যে একটি থালা এবং একটি ডুগডুগি। শেষোক্তটি বাজিয়ে ভিড় জমাতে সুবিধে হয়, এটি হচ্ছে মাদারিদের ভিড় জমানো বাদ্যযন্ত্র। ভিড় জমে গেলেও কখনো কখনো ডুগডুগি বাজানো হয়ে থাকে রহস্য-উত্তেজনা বাড়াবার জন্য।

আমি যখন গেলাম, তার আগেই বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কিছু কিছু খেলা দেখিয়ে ফেলেছে ছোকরা যাদুকর। এবার শুরু হলো নতুন খেলা, এ খেলা হাত সাফাইয়ের খেলা বা কোনো রকম যান্ত্রিক কৌশলের খেলা নয়।

খেলার আসরের মাঝখানে চিৎ-শয়ান বালকটির চোখের ওপর পুরু কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো, কিছু যেন সে দেখতে না পায়। ছোকরা যাদুকর তারপর বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে একটির পর একটি বিভিন্ন রকমের জিনিস নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো, আর চোখ ঢাকা ঐ বাচ্চা ছেলেটা চোখে কিছু না দেখেই প্রত্যেকটি জিনিস নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে যেতে লাগলো। শুধু ভেতরে দাঁড়িয়েই নয়, ভিড়ের বাইরে এসেও ছোকরা যাদুকর কয়েকজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে ফাউন্টেন পেন, নোট বই, রুমাল, পেন্সিল ইত্যাদি নিয়ে চেঁচিয়ে

প্রশ্ন করতেই ভিড়ের আড়ালে শয়ান ছেলেটি প্রত্যেকটি জিনিসের এবং তার মালিকের চমৎকার বর্ণনা দিয়ে যেতে লাগল। তরুণ যাদুকরের প্রশ্ন এবং তার ঐ বাচ্চা সহকারীর জবাব অনেকটা এই ধরণের :

"এটা কি ?"

"লিখবার জিনিস।"

"কি জিনিস ?"

"ফাউণ্টেন পেন।"

"কি রং ?"

"লাল।"

"এই বাবু কি রকম ?"

"এ বাবু বহুত বঢ়িয়া। ছোটোখাটো, ফরসা।"

"আর ?"

"চোখে চশমা।"

"বাবু কি পোশাক পরে আছেন ?"

"ধুতি। পাঞ্জাবি। পায়ে স্যাণ্ডেল।"

"এ বাবুর পকেট থেকে কি নিলাম ?"

"নোট বই। নীল মলাটের নোটবই।"

প্রশ্নোত্তরগুলি অবশ্য হিন্দীভাষায় হয়েছিল ; আমি বাংলায় তর্জমা করে দিয়েছি। খেলাটি দেখে উৎসাহিত হয়ে আমি বেশ কিছুক্ষণ রয়ে গেলাম সেখানে। বাচ্চা ছেলেটির প্রতিটি জবাব নির্ভুল। সে যে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলো না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে প্রশ্ন শোনামাত্রই অমন নির্ভুল জবাব দিচ্ছিলো কোন যাদুমন্ত্র বলে ?

ব্যাপারটা বিস্ময় উৎপাদন করারই মতো, কিন্তু তেমন বিস্মিত হতে দেখলাম না কাউকে। এ খেলায় দুটি ছেলেরই—তরুণ যাদুকরের এবং তার ঐ বাচ্চা সহকারীর যে কৃতিত্ব অসাধারণ, সেটা বুঝবার মতো সমঝদার সেই ভিড়ের ভেতর কেউ ছিল না। সব সস্তা তামাসা-দর্শকের দল।

অথচ এই ধরনের খেলা দেখিয়েই অসামান্য খ্যাতি এবং অসামান্য পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে গেছেন পাশ্চাত্য যাদু-জগতে বিখ্যাত জ্যান্‌সিগ (Zancig) দম্পতি—জুলিয়াস জ্যান্‌সিগ এবং অ্যাগ্নিস (Agnes) জ্যান্‌সিগ। এঁদের জীবন-কাহিনী চমৎকার রোমাণ্টিক।

জুলিয়াস জ্যান্‌সিগ ডেনমার্কের লোক। গরীব পরিবারে তাঁর জন্ম। অন্ত কোনো ভালো পেশায় বা ব্যবসায়ে যাবার মতো সঙ্গতি না থাকায় জুলিয়াস লোহা গলাবার আর ঢালাই করবার কাজ শেখেন। কাজ শেখা হয়ে গেলে পর তিনি চলে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে; স্বদেশ ডেনমার্কের চাইতে যেখানে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা অনেক বেশী।

মার্কিন দেশে গিয়ে জুলিয়াস দেখলেন ডেনমার্কের অনেক ভাগ্যান্বেষীর ভিড় সেখানে। এদেরই এক সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি একটি বিকলাঙ্গ তরুণীকে দেখেই চমকে উঠলেন। মেয়েটি বিকলাঙ্গ, চেহারাও তার তাকিয়ে দেখবার মতো নয়, কিন্তু তবু যেন কি কারণে তার দিকে মন আকৃষ্ট হচ্ছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনেক বছর আগে ডেনমার্কে দেখা একটি মেয়ের মুখ। সে মেয়েটির নাম ছিল অ্যাগ্নিস। খুব ছোট বয়সে ভাব জমেছিল জুলিয়াস আর আগ্নিসের ভেতর, তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। অ্যাগ্নিস মুছেও গিয়েছিল জুলিয়াসের মন থেকে। বহুদিন পর বিদেশে এসে এই মেয়েটিকে দেখে হঠাৎ খুব যেন চেনা চেনা লাগল।

জুলিয়াস বললো, "অ্যাগ্নিস না?"

মেয়েটি বললো, "হ্যাঁ, আমি অ্যাগ্নিস।"

"আমি জুলিয়াস। মনে আছে আমার কথা?"

"আছে বইকি। তোমাকে আমি দেখেই চিনেছিলাম।"

বিকলাঙ্গ, বিষণ্ণ মেয়ে অ্যাগ্নিস। রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়বার মতো মেয়ে নয়। কিন্তু জুলিয়াসের শৈশবের প্রিয়া অ্যাগ্নিস। হারিয়ে দূরে সরে গিয়েছিল তার কাছ থেকে, আবার কাছে এসেছে বিধাতারই বিধানে। জুলিয়াস দেখলেন নিদারুণ দারিদ্র্যে দুরবস্থায় দিন কাটছে অ্যাগ্নিসের। একা, বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ অ্যাগ্নিস। কোনো আকর্ষণ তার নেই, কে আসবে তার সঙ্গী হতে? অ্যাগ্নিসের প্রতি গভীর মমতায় ভরে উঠলো জুলিয়াস জ্যান্‌সিগের বুক, বহুদিন ভুলে থাকা পুরাতন প্রেম জেগে উঠলো নতুন করে। অ্যাগ্নিসের পাণি প্রার্থনা করলেন জুলিয়াস। মঞ্জুর হলো প্রার্থনা। জুলিয়াস এবং অ্যাগ্নিস হলেন জ্যান্‌সিগ-দম্পতি।

একবার একটি সাহায্য-অনুষ্ঠানে তাঁদের যোগ দেবার অনুরোধ এলো। গাইতেও জানেন না, বাজাতেও জানেন না। কি করবেন? তখন জুলিয়াসের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি ভাবলেন গান-বাজনা, নৃত্য, বক্তৃতা—

এসব তো মামুলি ব্যাপার ; একটা নতুন কিছু দেখাতে হবে, যাতে বেশ একটু সাড়া পড়ে যায়। ভেবে ঠিক করলেন, "চিন্তা পরিচালনা"র (thought transference) খেলা দেখিয়ে চমক লাগাতে হবে। দুজনে মিলে গোপনে অভ্যাস করা চললো।

তাঁদের প্রথম প্রদর্শিত খেলা খুবই সাধারণ হলেও অভিনবত্বের জন্যেই বেশ চিত্তাকর্ষক হলো। আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁরা "চিন্তা পরিচালনা"র খেলা দেখালেন। দর্শকদের দেওয়া এক একটি জিনিস হাতে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করেন জুলিয়াস, জুলিয়াসের মগজ থেকে সে চিন্তা পরিচালিত হয়—যেন বেতার তরঙ্গে—দূরে চোখ বাঁধা অবস্থায় অ্যাগ্নিসের মগজে। আর প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকটি জিনিস বর্ণনা করে দেন অ্যাগ্নিস।

খেলাটি জনপ্রিয় করে তুললো এঁদের দুজনকে। কিন্তু তখনো তাঁরা এটা পেশারূপে গ্রহণ করবার কথা ভাবেননি। জুলিয়াস তখন কাজ করছেন এক লোহা ঢালাইয়ের কারখানায়। বিধাতা যাঁকে টেনে এনে বিখ্যাত করবেন যাদুজগতে, লোহা ঢালাইয়ের জগতে অখ্যাত হয়ে থাকতে তিনি পারবেন কেন? একদিন কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটলো, গলানো লোহা হাতে পড়ে ভীষণ রকম আহত হলেন জুলিয়াস। বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে থেকে সেরে ওঠার পর ঠিক করলেন কারখানার ঐ বিপজ্জনক কাজে আর ফিরে যাবেন না। তার চাইতে অ্যাগ্নিসকে নিয়ে যে "চিন্তা পরিচালনা"র খেলা দেখাতেন, সেটাকেই দুজনে মিলে পেশারূপে গ্রহণ করবেন।

তাই করলেন। আরো মাথা খাটিয়ে তাঁদের প্রদর্শন-পদ্ধতিটিকে আরো ব্যাপক, আরো উন্নত করে তুললেন। চলে গেলেন কোনি আইল্যাণ্ড (Coney Island)। এই দ্বীপটি আমেরিকার একটি জনপ্রিয় আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র। এখানে সামান্য দর্শনীতে তাঁরা প্রতিদিন অনেকবার খেলা দেখাতেন। এখানেও বিধাতার লীলা। এখানেই একদিন তাঁদের খেলা দেখলেন বিখ্যাত যাদুকর হোরেস গোল্ডিন (Horace Goldin)। অভিজ্ঞ, দূরদর্শী যাদুকর গোল্ডিন সঙ্গে সঙ্গে যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন জ্যান্‌সিগ-দম্পতির এই খেলার অসামান্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। তিনি উদ্যোগী হয়ে একদিন জ্যান্‌সিগ-দম্পতির খেলা দেখাতে নিয়ে এলেন নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত রঙ্গালয়-পরিচালক এবং প্রমোদ ব্যবস্থাপক হ্যামারস্টেইনকে (Hammerstein)। ফলে হ্যামার-স্টেইনের উইন্টার

গার্ডেন থিয়েটারে কয়েকমাস খেলা দেখাবার সুযোগ পেলেন জ্যান্‌সিগ-দম্পতি। এতে আয় বাড়লো, খ্যাতি বাড়লো, কিন্তু তবু মন ভরলো না। যাদু জগতের তীর্থক্ষেত্র লণ্ডনের আসর মাৎ না করা পর্যন্ত তাঁদের তৃপ্তি হবে না। রওনা হয়ে গেলেন লণ্ডনে।

লণ্ডনের অভিজাত 'আলহামরা' (Alhambra) রঙ্গালয়ে হলো তাঁদের প্রথম প্রদর্শনী। এতে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'ডেইলি মেল'-এর মালিক লর্ড নর্থক্লিফ (Lord Northcliffe) এবং বিখ্যাত 'রিভিউ অভ রিভিউজ' (Review of Reviews) মাসিক পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক উইকহ্যাম স্টেড। অভিভূত হলেন দুজনেই। দুজনেই নিঃসন্দেহ হলেন, জ্যান্‌সিগ-দম্পতি সত্যি সত্যিই 'সাইকিক' (Psychic) বা আত্মিক ক্ষমতার অধিকারী—এ ক্ষমতা তাঁদের ঈশ্বরদত্ত। এতে ছল, চাতুরি বা কৌশল কিছু নেই; সত্যি সত্যিই এঁদের দুটি মগজের চিন্তাপ্রবাহে সূক্ষ্ম আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরদিনই বহুল-প্রচারিত "ডেইলি মেল" কাগজে বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হলো অসাধারণ আত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন জ্যান্‌সিগ-দম্পতির বিপুল প্রশস্তি। সারা ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়ে গেল "এই অসাধারণ দম্পতি"-র খ্যাতি। নিশ্চিত হয়ে গেল তাঁদের অসামান্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, এই অসামান্য মূল্যবান প্রচারের ফলে।

জুলিয়াস জ্যান্‌সিগ আমেরিকায় মারা যান ১৯২৯ সালে। তার আগে সস্ত্রীক এই 'আত্মিক' শক্তির খেলা দেখিয়ে তিনি বহুলক্ষপতি হয়েছিলেন।

লর্ড নর্থক্লিফের মতো বিরাট প্রভাবশালী ব্যক্তি জ্যান্‌সিগের এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে খাঁটি 'আত্মিক' (psychic) শক্তি বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন এবং তার বহুলপ্রচারিত খবরের কাগজের মারফত জ্যান্‌সিগের খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন চারিদিকে। জ্যান্‌সিগ স্বীকার করতেন তার বিপুল সাফল্যের মূলে লর্ড নর্থক্লিফের এই মহামূল্যবান সহায়তা।

আসলে কিন্তু জ্যান্‌সিগ-দম্পতির ক্ষমতা ঠিক অলৌকিক বা আত্মিক ছিল না—অবশ্য অসাধারণ স্মরণশক্তিকে যদি 'সাইকিক' (psychic) বা অলৌকিক আত্মিকশক্তি বলা না হয়। জুলিয়াস এবং অ্যাগ্নিসের ভেতর এমন ব্যাপক 'কোড' (code) বা গুপ্ত সংকেত-ব্যবস্থা ছিল, যার সাহায্যে জুলিয়াস সংকেতের দ্বারা প্রায় যে কোনো জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ চোখ-বাঁধা অ্যাগ্নিসকে জানিয়ে দিতেন। চোখ দিয়ে দেখা অ্যাগ্নিসেরই দরকারই হতো না, গুপ্ত সংকেতে জুলিয়াস তাঁকে যে বিবরণ দিতেন, তা থেকেই অতি সহজে প্রত্যেকটি জিনিসের

খুঁটিনাটি বর্ণনা করে গেছেন তিনি। সুতরাং এ খেলায় কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রয়োজন হয়নি—যদিও লর্ড নর্থক্লিফ এবং আরো অনেকে এঁদের অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী বলেই ভুল করেছিলেন, অন্য কোনো ভাবে এর ব্যাখ্যা সম্ভব নয় ভেবে। এ খেলার প্রয়োজন হয়েছিল শুধু বেশ ব্যাপক এবং জটিল একটি সংকেত-পদ্ধতি, সেই পদ্ধতির অগুনতি সংকেতের প্রত্যেকটি নিখুঁতভাবে মনে রাখবার মতো অসামান্য স্মরণশক্তি। তার ওপর চমৎকার অভিনয়-ক্ষমতা এবং উপস্থিত-বুদ্ধি।

লণ্ডনের বিখ্যাত, জনপ্রিয়, হাল্কা ধরনের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় দেড় হাজার পাউণ্ড দক্ষিণার বিনিময়ে জুলিয়াস জ্যান্সিগ তাঁর গুপ্ত সংকেত-পদ্ধতিটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এভাবে রহস্য ভেদ করে দেবার পরও জ্যান্সিগ-দম্পতির এই প্রদর্শনীর জনপ্রিয়তা বা সাফল্য কিছুমাত্র কমেনি। সম্ভবত সাপ্তাহিক পত্রিকাটিতে ("Answers") যখন জ্যান্সিগ দম্পতির গুপ্ত সংকেতের পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, তার আগে থেকেই তাঁরা সেই পুরোনো পদ্ধতি বাতিল করে দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা নতুন পদ্ধতিতে খেলা দেখানো শুরু করেছিলেন।

এক মন থেকে অন্য মনে অতীন্দ্রিয়ভাবে (অর্থাৎ কোনোরকম ভাষা বা ইঙ্গিত ব্যবহার না করে একেবারে সরাসরি) চিন্তা পাঠানো বা সঞ্চারিত করে দেওয়ার নাম 'মেণ্টাল টেলিপ্যাথি' (Mental telepathy)। জ্যানসিগ-দম্পতির অদ্ভুত কৃতিত্বে হাজার হাজার লোকের মনে বিশ্বাস হলো 'টেলিপ্যাথি' সত্যি সত্যিই সম্ভব। তাদের সংকেত-পদ্ধতি প্রকাশিত এবং আলোচিত হবার পরও অনেকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাননি যে, তাঁদের প্রদর্শিত 'টেলিপ্যাথি' খাঁটি অতীন্দ্রিয় টেলিপ্যাথি নয়, নিতান্তই লৌকিক গুপ্ত কৌশলের খেলা এবং আধুনিক যাদু-ক্রীড়ায় পর্যায়ে পড়ে।

এ ধরনের খেলা বর্তমান যাদু-জগতে—অন্যদিক থেকে বিচার করে—'সেকেণ্ড সাইট' (Second Sight) বা 'দ্বিতীয় দৃষ্টি' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় দৃষ্টির অর্থ হচ্ছে দিব্য-দৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, অর্থাৎ চর্মচক্ষুর সাহায্য ছাড়াই দেখা। ভাবটা যেন—চোখ বাঁধা অবস্থায় যাদুকরের সহকারী বা সহকারিণী তাঁর 'দ্বিতীয়' অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়দৃষ্টির সাহায্যেই বিভিন্ন জিনিসগুলো দেখছেন এবং বর্ণনা করছেন।

প্রথমা পত্নী অ্যাগ্নিস মারা যাওয়ার ফলে জুলিয়াস জ্যান্সিগ বেশ একটু দমে গেলেন। কিন্তু দমে থাকবার পাত্র নন জুলিয়াস। অ্যাগ্নিসের শূন্য স্থান পূর্ণ

করবার জন্য পেলেন 'আডা' (Ada) নাম্নী একটি মহিলাকে। আডা রাজী হলেন জুলিয়াসের জীবন-সঙ্গিনী এবং যাদু-সঙ্গিনী হতে। জুলিয়াস কিছুদিনের মধ্যে তালিম দিয়ে আডাকে তৈরি করে নিলেন। আবার শুরু হল জ্যান্‌সিগ দম্পতির মানসিক যাদু-প্রদর্শন। সাফল্য এল বটে, কিন্তু আগের মত নয়, কারণ জুলিয়াসের দ্বিতীয়া পত্নী আডা ব্যক্তিত্বে, উপস্থিতবুদ্ধিতে এবং অভিনয়-ক্ষমতায় অ্যাগ্নিসের কাছাকাছিও যেতে পারেননি।

জুলিয়াস জ্যান্‌সিগের অসামান্য সাফল্যের মূলে তাঁর নিজের সাধনা ছিল, একথা অস্বীকার না করেও বলা যায়, সৌভাগ্য এবং যোগাযোগই তাঁর বরাত খুলে দিয়েছিল। সে সময়কার সেরা যাদুকর হোরেস গোল্‌ডিনের, এবং তাঁর মাধ্যমে প্রমোদ-জগতের বিখ্যাত প্রযোজক হ্যামারস্টেইনের এবং পরে বহুল প্রচারিত 'ডেইলি মেল' পত্রিকার মালিক লর্ড নর্থক্লিফের নেকনজরে না পড়লে তিনি এত খ্যাতি, এত জনপ্রিয়তা এত অর্থ লাভ করতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ নিশ্চয়ই করা যায়।

এ প্রসঙ্গে আবার মনে পড়ছে একটু আগেই যাদের কথা বললাম, কলকাতার রাজপথের সেই কিশোর যাদুকর আর তার বালক সহকারীর কথা, যারা ফুটপাথে এই 'টেলিপ্যাথি' বা 'সেকেণ্ড সাইট'-এর খেলাই অতি চমৎকার দেখাচ্ছিল, নিতান্তই বেরসিক অসমঝদার জনতার সামনে। ওরা ছিল নিরক্ষর, গরীব, যাযাবর, নিতান্তই সাদাসিধে, সস্তা। ওদের কৃতিত্বে কেউ মুগ্ধ হচ্ছিল না, বিনা পয়সার তামাশা দেখছিল সবাই। কিন্তু মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ওদের সেই খেলাই জমকালো, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত পরিবেশে কোনো প্রখ্যাত প্রমোদ-পরিবেশকের প্রযোজনায় এবং পরিচালনায় প্রদর্শিত হলে তার কদর এবং আদর হতো সম্পূর্ণ অন্য রকম।

বিখ্যাত জ্যান্‌সিগ-দম্পতির খেলাও প্রথমে খুব সামান্য ধরনেরই ছিল। সেই সামান্য শুরুতেই উৎসাহ পেয়ে তাঁরা তাঁদের সংকেতের পুঁজি বাড়িয়ে বাড়িয়ে অসামান্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, উক্ত কিশোর যাদুকর তেমন উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তার ঐ বালক সহকারীর সহযোগিতায় ঐ সামান্য খেলাটিকেই আরো বাড়িয়ে তুলে অসামান্য করে তুলতে পারতো। ওর ভেতরে যে জুলিয়াস জ্যান্‌সিগের সম্ভাবনা সুপ্ত ছিল না, কে বলতে পারে?

কয়েকটি কথা

এবারের মতো মুখ বন্ধ করার আগে আগে-বলা কথার পুনরুক্তি যথাসাধ্য এড়িয়ে কয়েকটি কথা এলোমেলোভাবে বলি।

কিংবদন্তীতে বাঙালী যাদুকর আত্মারাম সরকারের নাম শোনা যায়। তিনি নাকি অলৌকিক শক্তিধর ভূতসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, ভূত দিয়ে নিজের পাল্কি বওয়াতেন এবং শেষকালে ভূতের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয় অলৌকিক যাদু নয়, লৌকিক যাদু—যাতে অতিপ্রাকৃত কোনো ব্যাপার নেই। তাই শুরু করি মার্কিন যাদুকর হাওয়ার্ড থার্স্টন-এর (Howard Thurston) ১৯০৬ সালে কলকাতায় যাদু-প্রদর্শন থেকে। থার্স্টন এসেছিলেন তাঁর বিরাট দল এবং যাদু-প্রদর্শনী নিয়ে ভারত সফরে। চেহারা, ব্যক্তিত্ব, যাদুদক্ষতা, জাঁকজমক প্রভৃতি সব দিক দিয়েই থার্স-টন ছিলেন অতুলনীয়। বাংলার যাদু-উৎসাহীদের যাদু-উৎসাহ বহুগুণ বেড়ে গেল পৃথিবীর অন্যতম সেরা যাদুকরের খেলা দেখে। তাঁর তাসের খেলা এবং "শূন্যে ভাসমানা সুন্দরী" (Floating Lady) যাদুরসিকদের সব চেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছিল। প্রমথ গাঙ্গুলি ছিলেন তখন কলকাতার বিশিষ্ট শৌখীন যাদুকর, "প্রফেসর লী" (Prof. Lee) নামে যাদুরসিক মহলে সুপরিচিতা বিশিষ্ট অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারে মানুষ প্রমথ গাঙ্গুলি ছিলেন দামী পাথর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরূপে কলকাতার এক বিশিষ্ট মণিকার (Jeweller) প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। তিনি তাঁর বাড়িতে একদিন যাদুকর থার্স্টন এবং তাঁর দলের সবাইকে একটি পার্টি দিয়েছিলেন। "তাসের খেলার রাজা" (King of Cards) থার্স্টন প্রফেসর লী-র তাসের খেলায় দক্ষতা দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁর নিজস্ব বিশিষ্ট কতক-গুলো তাসের খেলার ক্রমপদ্ধতি (routine) দেখিয়ে দিয়ে যান। প্রফেসর লী পরে তাঁর যে সব যাদু-শিষ্যদের এই থার্স্টনী তালিম দিয়েছিলেন তাঁদের ভেতর আমি পরিচিত হয়েছি প্রবীণ এবং যাদুমঞ্চ থেকে অবসর নেওয়া যাদুকর বাঁশরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। হাতের দুদিক বারবার এদিক ওদিক উলটে পালটে সম্পূর্ণ খালি দেখিয়ে শূন্য থেকে তাসের পর তাস ধরা, চোখের পলকে হাতের তাস হাওয়ায় বিলীন করে দেওয়া, দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে, এক হাতের তাস চোখের

পলকে বায়ুপথে অদৃশ্যভাবে অপর হাতে চালান করা—এ হলো থার্সটনের পুরো খেলার বা রুটিনের খানিক অংশ মাত্র। বাঁশরিবাবুর বহুদিন অনভ্যস্ত হাতেও এরই রূপায়ণ দেখে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিলাম তাহলে স্বয়ং থার্সটনের হাতে পুরো খেলাটা কি অবিশ্বাস্য বিস্ময়েরই না সৃষ্টি করতো! আশ্চর্য থার্সটনের উদ্ভাবনী শক্তি! কোনো অলৌকিক মন্ত্র নেই, কোনোরকম যন্ত্রপাতির ব্যবহার নেই, নিছক হস্তকৌশলের সাহায্যে এ কি বিচিত্র বিস্ময় সৃষ্টি! থার্সটন (১৮৬৯-১৯৩৬) পাদ্রী হবেন বলেই ঠিক ছিল, কিন্তু আলেকজাণ্ডার হারম্যানের বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখে তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল (১৮৯৩), তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছিল অদ্বিতীয় অবিস্মরণীয় যাদুকর হওয়া। এবং তাই-ই তিনি হয়েছিলেন।

থার্সটন আসবার অনেক আগে থেকেই অবশ্য বাংলা দেশে—প্রধানতঃ কলকাতায়—যাদুর চর্চা চালু ছিল। উনিশ শতকের শেষ বছরে ফরাসী দেশের রাজধানীতে একটি প্রদর্শনীতে বাঙালী যাদুকর সত্যচরণ ঘোষ যাদু প্রদর্শন করেও এসেছিলেন এবং বিদেশ থেকে কিছু মূল্যবান যাদু-যন্ত্রপাতিও আনিয়েছিলেন। তার আগে কলকাতার দর্জিপাড়া অঞ্চলে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তখনকার বিশিষ্ট যাদুকর নবীনচন্দ্র মান্না এবং অম্বিকাচরণ পাঠকের উদ্যোগে উইজার্ডস্ ক্লাব (The Wizards' Club) নামে একটি যাদুকর সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। সে সময়ে বাংলায় যাদু-চর্চা সামান্যই হতো, যাদুকরদের সংখ্যাও ছিল খুবই কম। উইজার্ডস্ ক্লাবের প্রচেষ্টায় যাদুচর্চার কিছু কিছু প্রসার হতে থাকে। প্রতিষ্ঠাতা দুজনের মৃত্যুর পর যাদুকর নারায়ণচন্দ্র মান্না উইজার্ডস ক্লাবের ভার নেন। নারায়ণচন্দ্র মান্নার পুত্র, যাদুকর রাসবিহারী মান্না ("মান্না দি গ্রেট") এবং অম্বিকাচরণ পাঠকের ভ্রাতা গোকুলচন্দ পাঠক ১৯২১ সালে উইজার্ডস্ ক্লাবে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করলেন। বিশিষ্ট যাদুকর প্রফেসর "রেনন" (রণেন দত্ত) ১৯২২ সালে হলেন এই ক্লাবের সর্বপ্রথম নির্বাচিত সভাপতি। সে সময়ে উইজার্ডস্ ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে ছিলেন গণপতি (তখনকার দিনে 'যাদু সম্রাট' নামে সম্মানিত), বিমল গুপ্ত (একাধারে অসাধরণ যাদুশিল্পী, ভেনট্রিলোকুইস্ট, কৌতুক অভিনেতা, সংগীত শিল্পী এবং সংগীত শিক্ষক—একসঙ্গে এত বিভিন্ন গুণের সমাবেশ বিরল), 'ওসাক রে' (অশোক রায়), গোলোকবিহারী ধর, 'গসেন' (নন্তবাবু) প্রমুখ বাংলার বিশিষ্ট যাদুকরবৃন্দ। যাদুকর রাজা বোসও পরে এ ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর জীবনের শেষ বছরে (১৯৪৮) এর সভা-

পতি ছিলেন। সে বছর ২২শে মার্চ সন্ধ্যায় উইজার্ডস্ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় কলকাতার রঙমহল রঙ্গমঞ্চে যাদুকর রাজা বোসের পরিচালনায় যে যাদু-প্রধান বিচিত্রানুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে বিশিষ্ট যাদুক্রীড়া প্রদর্শকদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর বেন (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য), মেদিনীপুরের যাদুকর অমিয়কৃষ্ণ দত্তের প্রিয় শিষ্য সাংবাদিক যাদুকর নরেন বোস, চিত্র-শিল্পী যাদুকর দুর্গাপদ পাল, হস্তকৌশল-প্রধান ঘরোয়া খেলায় এবং টাকার খেলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী—টাকার খেলার জন্যই ভারতের নেলসন ডাউন্স্ (Nelson Downs, King of Coins) নামে খ্যাত—'দুর্গাপতি', অর্থাৎ ৺দুর্গাপদ দাস ওরফে ৺ডি. পি. দাস, যাদুকর গণপতির স্নেহভাজন শিষ্য ভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, "মান্না দি গ্রেট" এবং সর্বশেষ স্বনামধন্য রাজা বোস। সেই তাঁর সর্বশেষ মঞ্চে আবির্ভাব। সে বছরই তিনি বিদায় নিলেন ইহ-জীবনের মঞ্চ থেকে। তাঁর মৃত্যুর পরই উইজার্ডস্ ক্লাব ভেঙে পড়ল বলা চলে।

বাংলায় যাদু-চর্চার ইতিহাসে উইজার্ডস্ ক্লাবের স্থান উচ্চ সম্মানের। এই ক্লাবের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ যাদুকরবৃন্দ। এ ক্লাবের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য নরেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক এখনো "ভোম্যাক" (Vomaque) নামে যাদু প্রদর্শন করে বেড়ান। তিনি মঞ্চের বড় খেলা (stage illusions) এবং ছোটখাট ঘরোয়া হস্তকৌশলপ্রধান খেলা (conjuring), উভয়েই পারদর্শী। এ ক্লাবের আরেকজন বিশিষ্ট সভ্য প্রফেসর 'কুমার' (গীতেন্দ্রনাথ কুমার)—১৯৩১ সালের যাদু কুম্ভ মেলা প্রসঙ্গে যাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সুদক্ষ যাদুকর, যাদু বিশেষজ্ঞ, যাদু-যন্ত্রপাতির নির্মাতা এবং যাদু-শিক্ষক। বৃহদায়তন মঞ্চ-যাদু-প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে যাদুকর "কে. লাল" সম্প্রতি যে সাফল্য এবং জনপ্রিয়তার রাজ-পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, প্রোঃ কুমারের শিক্ষায় এবং পরিচালনায়ই তা সম্ভব হয়েছে।

যাদুকর সমিতি প্রসঙ্গে মনে পড়ছে স্বর্গীয় ডাঃ কালীকিংকর ব্যানার্জী, বি. এস-সি. এম. বি. প্রতিষ্ঠিত "আকর্ষণী"-র কথা। ডাঃ ব্যানার্জী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু ও দন্ত বিভাগে বহুদিন কাজ করে পরে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্-এ মেডিক্যাল অফিসার রূপে যোগ দেন এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করতে থাকেন। কলকাতায় কলেজ স্ট্রীটে তাঁর ব্যানার্জী ক্লিনিকে সন্ধ্যায় রোগী দেখা শেষ হবার পর শৌখীন এবং পেশাদার যাদু-রসিকদের বৈঠক এবং আলোচনা হতো। 'আকর্ষণী'র বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে ছিলেন বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী (বর্তমানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেতার-শিল্পী 'কচি

বাবু') এবং ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত (সে সময়ে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র)। 'আকর্ষণী'র মুখপত্র রূপে ডাঃ ব্যানার্জী ঐ নামেই (The Akarshani) যাদু-সংক্রান্ত একটি ইংরাজি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে ১৯৩৯ সালে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় দুটিরই অবলুপ্তি ঘটে। তাঁর উত্তরসাধক রূপে বাংলার বিশিষ্ট শৌখীন যাদুশিল্পী ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত বিভিন্ন সাহায্য-অনুষ্ঠানে (charity show) ডাঃ ব্যানার্জী উদ্ভাবিত কৌশল অবলম্বনে কয়েকটি খেলা নিয়মিত প্রদর্শন করেন। ডাঃ দাসগুপ্ত যাদুতে প্রথম উৎসাহিত হন পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট যাদুকর ৺গঙ্গানারায়ণ সেনগুপ্তের যাদুর খেলা দেখে। ৺গঙ্গা-বাবুর পুত্র কে. এন. সেনগুপ্ত বর্তমান বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট শৌখীন যাদুকর। ডাক্তার যাদুকর ব্যানার্জীর মতোই ডাক্তার যাদুকর দাসগুপ্তও প্রধানতঃ সাহায্য অনুষ্ঠানেই যাদু প্রদর্শন করে থাকেন। বঙ্গভঙ্গের পর ১৯৫০ সালে বাস্তুহারা-দের সাহায্যার্থে কলকাতা নিউ এম্পায়ার হলে তাঁর পূর্ণাঙ্গ যাদুপ্রদর্শনী যাদুরসিক মহলে বিশেষ উৎসাহের আলোড়ন এনেছিল। নাড়ীর গতি রুদ্ধ করে মানুষের জিভ কেটে জোড়া লাগাবার খেলা তিনি তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে দেখিয়েছিলেন ১৯৪২ সালে মেডিক্যাল কলেজের একটি অনুষ্ঠানে। ডাঃ দাসগুপ্ত তাঁর যাদু-খেলাগুলিকে প্রধানতঃ প্রচারধর্মী নাটকাকারে পরিবেশন করেন। ডাঃ দাস-গুপ্তের ভগ্নী ও শিষ্যা শ্রীমতী উমা দাসগুপ্তা, বি-এ, একজন বিশিষ্ট শৌখীন যাদুশিল্পী।

ডাক্তার যাদুকর প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙালী যাদুকর ডাক্তার প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা। যাদু-জগতে ইনি 'কার্ডো' (Cardo) নামে খ্যাত। ১৯০৭ সালে বারাণসী ধামে এঁর জন্ম। পাঁচ বছর বয়সে একজন গুজরাটি যাদুকরের খেলা দেখে তিনি যাদুবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর কাছে রুমালের রং বদলাবার খেলা শেখেন। পরে তাঁর বাবা লণ্ডনের বিখ্যাত গ্যামাজ কোম্পানী থেকে কিছু কিছু যাদুখেলার সরঞ্জাম আনিয়ে দেন। নয় বছর বয়সে তিনি সর্বপ্রথম যাদু প্রদর্শন করেন তাঁর স্কুলে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে। ১৬ বছর বয়সে তিনি ডাক্তারি পড়তে ইংলণ্ডে যান, এবং সেখানে বিশিষ্ট যাদুকরদের সংস্পর্শে আসেন। বিলিয়ার্ড বলের খেলায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা দেখে হোরেস গোল্ডিন প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত যাদুকর মুগ্ধ হন। পরে তিনি সাত বছর ধরে যাদুকর ম্যাসকেলিন ও ডেভান্ট-পরিচালিত বিখ্যাত যাদু-রঙ্গালয় ইজিপ-শিয়ান হলের সঙ্গে (Egyptian Hall) সম্পর্কিত থাকেন। শেফিল্ড শহরে তাঁর

যাদুপ্রদর্শন দেখে মুগ্ধ হয়ে ইংলণ্ডের যাদুরসিক যুবরাজ (পরবর্তী অষ্টম এডোয়ার্ড) তাঁকে একটি সিগারেট কেস উপহার দেন। ১৯৩২ সালে ভারতে ফিরে এসে ডাক্তার রূপে তিনি ভারতীয় সেনা বিভাগে যোগ দেন। সেখানে ডাক্তারি ছাড়া যাদুপ্রদর্শন করে চিত্তবিনোদন করাও তাঁর একটা বড় কাজ হয়ে দাঁড়ালো। গত যুদ্ধের সময়ে (১৯৩৯ – ১৯৪৫) তিনি বিভিন্ন সামরিক হাসপাতালে পীড়িত এবং আহত সৈনিকদের যাদু দেখিয়ে মুগ্ধ করে তাদের দুঃখ ভুলিয়ে রাখতেন। ১৯৫২ সালে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় আবার ভারত ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পৃথিবীর নানা স্থানে যাদু দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। ভারতীয় জীবনধারার বৈশিষ্ট্য যাদু খেলার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য।

প্রবাসী বাঙালী যাদুকর প্রসঙ্গে মনে পড়েছে অমৃতবাজার পত্রিকার 'প্যাটার' (patter) খ্যাত রস-সাহিত্যিক শ্রীআশু দে-র (Asude) কথা। তিনি তাঁর কর্মজীবন কাটিয়ে এসেছেন বিহারে। পরে দিল্লীতে। যাদুবিদ্যা তাঁর শখের ব্যাপার হলেও তাঁর যাদুর নেশা ছিল প্রচণ্ড, এবং প্রথম শ্রেণীর যাদুকর হিসেবে সারা বিহারে তিনি খ্যাত ছিলেন। বর্তমানে তিনি আর প্রবাসী নন, কলকাতাবাসী। দীর্ঘদিন যাদু প্রদর্শন থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু যাদু সম্পর্কিত আলোচনায় উৎসাহ তাঁর এখনো অসীম। কৌতুকরস-মধুর যাদু-প্রদর্শনে তিনি ছিলেন অনন্য। বাঙালীর যাদু-চর্চার ইতিহাসে আশু দে একটি স্মরণীয় নাম।

হাউয়ার্ড থার্স্টন প্রসঙ্গে শৌখীন বাঙালী যাদুকর প্রফেসর লী-র (প্রমথ গাঙ্গুলি) কথা বলেছিলাম। প্রফেসর লী-র অন্যতম যাদু-শিষ্য পুলকেশ চক্রবর্তী "পুলক্স" (Pullocks) নামে যাদুর খেলা দেখিয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল যাদু থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর শিষ্য যাদুকর সুশীল মুখোপাধ্যায় ছোটোখাটো হাতের খেলায় (Conjuring) পারদর্শী এবং বহুদিন ধরে বিভিন্ন মাদারি অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ ভেল্‌কিওয়ালাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে তাঁদের যাদু-পদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছেন। যাদুকর তকমাওয়ালা সাঁই-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁর কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখে নেবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

বাঙালী যাদুকরদের মধ্যে আরেকটি বিশিষ্ট নাম যতীন সাহা। যাদুকর পি. সি. সরকারের মতো এঁরও জন্ম ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায়। ১৯০৭ সালে। পেশাদারী যাদু-প্রদর্শন ইনি করেছেন বটে, কিন্তু যাদুকে একমাত্র বা প্রধান পেশা বলে গ্রহণ করেন নি। একটি বিখ্যাত পত্রিকার শিল্প-বিভাগে

তিনি উচ্চ বেতনে শিল্পীপদে অধিষ্ঠিত। কয়েক বছর আগে যাদু থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর যাদু-প্রদর্শনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং সুরুচিসম্মত ছিল। যাদু-কৌশলের অসাধু প্রয়োগ করে অসাধু ব্যক্তিরা আমাদের কতভাবে ঠকাতে পারে এবং ঠকিয়ে থাকে, তারই ব্যাখ্যা করে যাদুকর সাহা যে সাময়িক পত্রে একটি প্রবন্ধমালা প্রকাশ করেছিলেন, তা বিশেষ মূল্যবান।

বৃহদায়তন যাদু-প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে, অর্থাৎ স্টেজ ইলিউশনিস্ট (stage-illusionist) হিসেবে বাংলার যাদুকর ডি. সি. দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। অল্পবয়সে তিনিও যাদুকর গণপতির প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

যাদুকর অশোক রায় যাদু-মঞ্চ থেকে অবসর নিয়েছেন এবং "যাদু-চক্র" নামক বিশিষ্ট যাদু-সংস্থার মাধ্যমে যাদু-শিক্ষা এবং যাদু-চর্চার প্রচারে ও প্রসারে যত্নবান। তাঁর সম্পাদিত ইংরাজি মাসিকপত্র "Jadu" এবং বাংলা ত্রৈমাসিক "যাদু" কিছুদিন যাদুচক্রের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে তিনি "যাদু-বিজ্ঞান" ক্রমিক গ্রন্থমালা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

যাদু-চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন সেকালের বিশিষ্ট যাদুকর প্রোফেসর এমিন স্বরাবর্দি-র (যিনি মেদিনীপুরের বিখ্যাত স্বরাবর্দি পরিবারের সন্তান হয়েও যাদুকর বৃত্তি অবলম্বন করায় পরিবারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং যাদুবৃত্তি ত্যাগ করার পরিবর্তে পারিবারিক পদবি বর্জন করেছিলেন) ভাগিনেয়, বাংলার বিশিষ্ট শৌখীন যাদুকর মৌলভী মহম্মদ ফৈজুল কাদের। এঁর জন্ম কলকাতায়, ১৮৯৪ সালে। কয়েকবছর হল যাদুপ্রদর্শন থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন। কৌতুক-মধুর বিস্ময় সৃষ্টিতে এঁর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। বিস্ময়ের বিস্ময় এই যে তিনি কোনো যাদু-গুরুর কাছে হাতে-কলমে যাদুবিদ্যা শেখেন নি (মাতুল প্রোঃ এমিনের যাদু দেখে প্রেরণা পেয়েছিলেন মাত্র), শিখেছেন লণ্ডনের যাদু-শিক্ষক রিউপার্ট হাউয়ার্ডের (Rupert-Howard) যাদুশিক্ষার কোর্স (Course) আনিয়ে তারই সাহায্যে।

যাদুকর অশোক সরকার (প্রথম শ্রেণীর যাদুকরোচিত গুণের অধিকারী হয়েও তিনি কিছুদিন করেই যাদু-প্রদর্শন ছেড়ে দিয়েছিলেন) 'Magic' নামে একটি সুন্দর ইংরাজি যাদু-মাসিক প্রকাশ করেছিলেন ১৯৪৮ সালে, কিন্তু প্রথম সংখ্যাই তার শেষ সংখ্যা হয়েছিল। প্রোঃ কুমারের প্রকাশিত যাদু-মাসিকটিও (Magic India, January, 1953) একটি সংখ্যাই বেরিয়েছিল। আর, পি. বোসের পরিচালনায় বাংলা "মায়া-জাল" এবং লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সম্পাদনায় "Magic

Net" নামে ইংরাজি যাদু মাসিকপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। বৈশাখ, ১৩৬৯ থেকে পুরুলিয়ার যাদুকর বি. দাসের সম্পাদনায় "ম্যাজিক" নামে একটি বাংলা যাদু-মাসিক প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলা ভাষায় "যাদুবিদ্যা" গ্রন্থ লিখে গেছেন যাদুকর গণপতি। "ভেল্কি ও ভোজবাজি" নামক বইটি তার অনেক আগে প্রকাশিত হয়েছিল; সেটি প্রফেসর হফম্যানের বিখ্যাত ইংরাজি যাদু-গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ। বাংলায় যাদু সম্পর্কে বই তারপর লেখেন যাদুকর পি. সি. সরকার, তারপর এ. সি. সরকার। বাংলার প্রবীণতম জীবিত যাদুকর "রয় দি মিষ্টিক" (সত্তর অতিক্রান্ত শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়) তাঁর বিচিত্র যাদু-জীবনের দীর্ঘ স্মৃতিকথা রচনায় ব্যাপৃত আছেন।

বাংলার যাদু-জগৎ অবিস্মরণীয়ভাবে ঋণী যাদুকর গণপতির কাছে। তাঁরই দৌলতে যাদুবিদ্যা সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে জনগণের কল্পনাকে নাড়া দিয়েছিল। 'গণপতি' আর 'যাদু' দুটি শব্দ সেকালে সমার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল জনমানসে। তাই বাংলা দেশে গণপতিকে আধুনিক যাদু-চর্চার জনক বলা যেতে পারে।

গণপতি-প্রবর্তিত ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, শুধু তাই নয়, প্রশস্ততর করে গিয়েছেন, বর্তমান ভারতের বৃহত্তম যাদুকর পি. সি. সরকার। একালে 'সরকার' আর 'যাদু' জনগণের মনে সমার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকালব্যাপী একাগ্র যাদুনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, সংগঠনী ক্ষমতা, ঝুঁকি নেবার অদম্য সাহস, জনমনস্তত্ত্বে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অসামান্য প্রচার-দক্ষতায় তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর বিপুল সাফল্যের মূলে এই এতগুলো গুণের সমন্বয়, যা একজনের ভেতরে খুব কমই দেখা যায়। অর্থকরী পেশা হিসেবে যাদুবিদ্যা কতখানি সাফল্য এনে দিতে পারে, সামান্য শুরু থেকে অসামান্য পরিণতিতে পৌঁছে তিনি তার জলন্ত উদাহরণ দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর নিজের জীবনে।

যাদু ও যাদুকর সংক্রান্ত অসামান্য কৌতূহলোদ্দীপক অনেক কাহিনী, এবং একাধিক বিষয়ের আলোচনা, বর্তমান গ্রন্থে স্থানাভাবে দেওয়া গেল না; অনেক কথা এবং অনেকের কথাও খুব সংক্ষেপে সারতে হল। আগামী গ্রন্থে তাদের যথাসাধ্য এবং যথাযোগ্য পরিবেশনের বাসনা রইল।

সর্বশেষে একটি কথা বলে আমার বক্তব্য এবারকার মতো শেষ করব। আমরা 'শিক্ষিত' সমাজে যে যাদুবিদ্যার চর্চা করি তা প্রধানত পাশ্চাত্য যাদু। ভারতীয় যাদু পদ্ধতির প্রতি আমাদের আরো মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমাদের যে সব ভ্রাম্যমাণ যাদুকরেরা ('মাদারি') যাদুর খেলা দেখিয়ে বেড়ায় মাঠে-ময়দানে-পথের ধারে, ভারতীয় যাদুর ধারা ওরাই অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অনাদরে অবহেলায় ওদের এই ধারা যেন লুপ্ত হয়ে না যায়, যাদুকর এবং যাদুরসিক সমাজের সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

ভারত সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ সাহিত্য, সংগীত; নৃত্য ও নাটককে যেমন স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়েছেন, ভারতীয় যাদু-শিল্পকেও তেমনি মর্যাদা দিন এই প্রার্থনা জানিয়ে এবারের মতো বিদায় নিলাম।

বিদেশীদের দৃষ্টিতে পি. সি. সরকার

আমেরিকার বিখ্যাত যাদুকর এবং যাদু ঐতিহাসিক মিলবোর্ন ক্রিস্টোফার (Milbourne Christopher তাঁর 'যাদুর সচিত্র ইতিহাস' (Illustrated History of Magic) নামক বৃহৎ প্রামাণ্য গ্রন্থে লিখেছেন :

"যিনি পরে বিরাট জার্মান যাদুকর 'কালানাগ'-*এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিলেন, ৩৭ বছর বয়স্ক সেই বাঙালী যাদুকর প্রতুলচন্দ্র সরকার ১৯৫০ সালে হামবুর্গ শহরে কালানাগের সঙ্গে তাঁর সাজ-পোশাক পরবার ঘরে গিয়ে দেখা করেছিলেন। কালানাগের প্রদর্শনীর প্রশংসা করে তিনি বলেছিলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার নিপুণভাবে মঞ্চস্থ করা বড় বড় যাদুর খেলাগুলি (illusions) এবং বর্ণাঢ্য নয়নাভিরাম মঞ্চ-সজ্জা ভারতীয় দর্শকদের আনন্দ দেবে।' পরদিনই জার্মান সংবাদপত্রগুলিতে সংবাদ ছাপা হয়ে গেল যে বিশ্বভ্রমণরত বিশ্বের বৃহত্তম যাদুকর পি. সি. সরকার ইউরোপের প্রধান যাদুকরের সঙ্গে দেখা করেছেন। পত্রিকাগুলি এই কাহিনীটি পেয়েছিল সরকারের প্রচার-বিজ্ঞপ্তি (publicity releases) এবং চিঠিপত্র থেকে।

"ঐ বছরই শিকাগো শহরে আমেরিকার যাদুকরদের সমিতি (Society of American Magicians) এবং 'আন্তর্জাতিক যাদুকর সংঘ' (International Brotherhood of Magicians) মিলিতভাবে যে সম্মেলন করেছিল, তাতে সরকার রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিলেন। পরনে রাজবেশ, মাথায় পালক-লাগানো উষ্ণীষ, পায়ে সোনালী নাগ্‌রা জুতো, এই ভারতীয় যাদুকর আমেরিকার যাদু-জগতের সেরা সেরা শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ করলেন, তাঁদের মধ্যে নিজের প্রচার-পত্র বিলি করলেন, আর নিজের যাদু ভাণ্ডারকে নতুন নতুন সংযোজনে সমৃদ্ধ করতে লাগলেন। এই অমায়িক সুদর্শন ভারতীয় মানুষটির অনুরোধে হ্যারি ব্লাকস্টোন তাঁর চক্র-করাত দিয়ে তরুণীকে দ্বিখণ্ডিত করার খেলার কৌশলের নকশা এঁকে দিলেন। জ্যাক গুইন (Jack Gwynne) যখন মার্কিন সৈন্যদের যাদু প্রদর্শন করবার জন্য ভারতে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে তাঁর সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পরিচয় হয়েছিল। তিনি তাঁর বন্ধুকে নিজের যাদু-কৌশলের গুপ্ত

* হেল্‌মুট স্রাইবার (Helmut Schreiber) কালানাগের প্রকৃত নাম।

গ্রন্থাদি দেখালেন, যাতে তাঁর প্রদর্শিত খেলাগুলির কৌশল-ব্যাখ্যা আর নক্‌শা ছিল। …

"ভ্রমণের সুযোগে সংগৃহীত যাদু-জ্ঞানগুলি সরকার কলকাতায় ফিরে তাঁর প্রদর্শনীর উন্নতির জন্য কাজে লাগান। কালানাগের 'মঞ্চ থেকে একটি মোটর গাড়ি অদৃশ্য করা' খেলাটির একটি সংস্করণ তিনি নিজের প্রদর্শনীর জন্য তৈরী করে নেন। 'কালানাগ' এবং অন্যান্য বিরাট যাদুকরদের মঞ্চসজ্জার অনুরূপ মঞ্চ-সজ্জা ও তিনি নিজের উপযোগী করে তৈরী করে নেন, এবং জাপান আর আমেরিকায় সংগৃহীত অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করে নিজের প্রদর্শনীর ক্রীড়া-পরম্পরার উন্নতি সাধন করেন।

"পাঁচ বছর বাদে প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর পি. সি. সরকার প্রাধান্য বিস্তারের জন্য পাশ্চাত্য জগতে হানা দিলেন। … 'কালানাগ'-এর বন্ধুরা ঘোষণা করলেন সরকারের প্রদর্শনী নিতান্তই নিম্নস্তরের এবং তাঁর প্রায় অর্দ্ধেক খেলাই 'কালানাগ'-এর প্রদর্শনীর ব্যর্থ অনুকরণ। তা সত্ত্বেও প্যারিস মহানগরীর একটি রঙ্গালয়ে (Theatre de l' Etoile) সরকারের প্রদর্শনী চলেছিল একটানা ৮ সপ্তাহ ধরে। অন্য কোনো যাদুকরের প্রদর্শনী সেখানে একটানা এতদিন চলে নি।

"ফ্রান্স এবং বেল্‌জিয়ামের কয়েকটি নগরে যাদু প্রদর্শনীর পর সরকার গেলেন ইংল্যাণ্ডে। লণ্ডনে তাঁর প্রথম আবিভার্ব রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিল। ডিউক অভ ইঅর্ক থিয়েটারে প্রদর্শনী শুরু করবার আগের রাত্রে ৯ই এপ্রিল, ১৯৫৬ তারিখে সরকার বি. বি সি. টেলিভিশনে যাদু প্রদর্শনে একটি বিদ্যুৎ-চালিত চক্র-করাত টেবিলের ওপর শায়িতা তাঁর ১৭ বছর বয়স্কা সহকারিনী দীপ্তি দের দেহের মধ্যভাগ ভেদ করে চালিয়ে দেন। সেটা যে দর্শকদের দৃষ্টি-বিভ্রম (optical illusion) অর্থাৎ চোখের ভুল নয়, সেটা প্রমাণ করবার জন্য সরকার তাঁর সহকরিণীর দেহের কাটা অংশের খাঁজে ধাতুর তৈরী একটি চওড়া চৌকো পাত খাড়া ওপর থেকে চেপে বসিয়ে দেখিয়ে দেন যে দেহটি সত্যি দুটুকরো হয়ে গেছে। তারপর পাতটি টেনে বার করে নিয়ে সরকার মেয়েটির হাত দুটিকে ঘষে তাকে জেগে উঠতে বললেন। কিন্তু মেয়েটি উঠল না, নড়ল না, শক্ত আর অচল হয়েই রইল। এরপর কি হলো, টেলিভিশনের দর্শক-শ্রোতারা তা দেখতে শুনতে পেলেন না, কারণ টেলিভিশনে যাদু-প্রদর্শনের নির্দিষ্ট সময়-সীমা ঠিক এইখানে অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক (host) রিচার্ড ডিম্‌ব্‌ল্‌বি (Richard Dimbleby) টেলিভিশনের

পর্দায় আবির্ভূত হয়ে দর্শকদের উদ্দেশে 'শুভরাত্রি' অর্থাৎ সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। তারপর এক ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে লাইম গ্রোভ স্টুডিয়োতে (বি বি সি টেলি-ভিশন) ফোনের পর ফোন আসতে লাগল উৎকণ্ঠিত দর্শকদের কাছ থেকে, যাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন মেয়েটি (কাটা পড়ে) খুন হয়েছে। টেলিফোন অপারেটররা তাঁদের আশ্বস্ত করতে লাগলেন মেয়েটি বহাল তবিয়াতেই আছে, তার কিছু হয় নি। পরদিন খবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ প্রকাশিত হলো যে মেয়েটিকে করাত দিয়ে কেটে দুভাগ করা হয়েছিল, সে সম্পূর্ণ ভালো আছে।

"ব্রিটিশ ইতিহাসে কোনো যাদু-প্রদর্শনই এমন প্রচণ্ড রকমের প্রচার পায় নি। বিখ্যাত 'ডেইলি মিরর' পত্রিকায় একটি রাজনৈতিক কার্টুন চিত্র প্রকাশিত হলো, যাতে চারটি জাতির প্রধান পুরুষেরা দুভাগে বিভক্ত একটি মেয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছেন—মেয়েটির এক অর্ধ পূর্ব জার্মানি অন্য অর্ধ পশ্চিম জার্মানি। ছবিটির ক্যাপ্‌শন বা পরিচয়-টিকা ছিল : 'ভয়ের বা উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। এ ব্যাপারটি কিভাবে করতে হয় আমরা জানি, বছরের পর বছর আমরা এই করে আসছি।'

"ইভিনিং নিউজ পত্রিকার নিজস্ব সমালোচক সরকারের প্রথম রাত্রের প্রদর্শনীটি দেখে তাঁর বিবরণে লিখেছিলেন, 'আমাদের দেখা যাদুকরদের মধ্যে এই যাদুকরকে সর্বশ্রেষ্ঠ, না বললেও সর্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন বলতেই হবে।'

"পরের বছর সরকার তাঁর দলবল সহ কলকাতা থেকে নিউ ইঅর্ক (New York) শহরে আসেন ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং করপোরেশন-এর টেলিভিশনে যাদু উৎসবে (Festival of Magic) তাঁর চক্রকরাত দিয়ে তরুণীকে দ্বিখণ্ডিত করার খেলাটি (Buzz-saw illusion) দেখাতে। তারপর অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজি-ল্যাণ্ডে তাঁর যাদুপ্রদর্শন বক্‌স্ অফিস রেকর্ড ভঙ্গ করে। তাঁর ষোলোজন সহ-কারীর মধ্যে দুজন ব্যস্ত থাকতেন পৃথিবীর সর্বত্র যাদু সম্পর্কিত পত্রিকায় এবং প্রধান প্রধান যাদুকরদের কাছে ডাকযোগে সরকারের যাদুপ্রদর্শনীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ, অনুষ্ঠান-সূচী (প্রোগ্রাম), ফোটোগ্রাফ এবং টিকিট বিক্রির মোট পরিমাণের খবর পাঠাতে। 'সরকার' নামটিকে যাদুজগতে সবচেয়ে বেশী পরিচিত নামে পরিণত করতে সরকার ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

"তাঁর খেলাগুলি, মঞ্চসজ্জা, পোশাক প্রভৃতি সবকিছুই তৈরি হতো তাঁর নিজস্ব কারখানায়।…

"জিহ্বা কেটে জোড়া লাগানো' এবং 'ভারতের জল' (শেষোক্ত খেলাটি

জার্মান যাদুকর কালানাগ-এর ঐ খেলাটি থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত) ছাড়া সরকারের অন্য সব খেলাই (tricks and illusions) মূলতঃ পাশ্চাত্য, পশ্চিম থেকে নেওয়া। ঝুড়ির খেলা (Basket trick), আমের আঁঠি পুতে আমগাছ তৈরি করা প্রভৃতি ভারতীয় বৈশিষ্ট্যমূলক খেলাগুলি তিনি এড়িয়ে চলেছিলেন।···

"সরকার (তাঁর যাদুপ্রদর্শনী নিয়ে) জাপান, থাই, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ, লেবানন, ইরান, মিশর, কেনিয়া, জ্যানজিবার পরিভ্রমণ করে ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে সাংস্কৃতিক বিনিময় পরিকল্পনা অনুযায়ী সোভিয়েট সরকার দ্বারা) ভারতে প্রেরিত 'বল্‌শয় ব্যালে' (Bolshoi Ballet) নৃত্য পরিবেশক দলের বিনিময়ে সদলবলে সোভিয়েট রাশিয়ায় যান। তিনি সোভিয়েট 'এয়ারোফ্লট' বিমানে মস্কো পৌছালেন, কিন্তু কলকাতার বন্দরে শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে তাঁর যাদু প্রদর্শনীর মালপত্র সময়মতো পৌছাতে বাধা পেল। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সমস্যার সমাধান করে দিলেন হাওয়াই জাহাজে সেই মালপত্র মস্কো পর্যন্ত পৌছে দিয়ে।···

"যাদুপ্রদর্শন কালে সরকার ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, একজন দোভাষী তাঁর কথা রুশ ভাষায় তর্জমা করে দিচ্ছিলেন। লেনিনগ্রাডে সংস্কৃতি-ভবনে (Palace of Culture) সরকারের প্রদর্শনী ৯ই সেপ্টেম্বর শুরু হবার কথা ছিল, কিন্তু মস্কোতে তার প্রদর্শনীর মেয়াদ আরো দশ দিন বাড়াতে হলো। লেনিনগ্রাডে সরকারের বিশেষ আনন্দের কারণ ঘটল, যখন 'দান্তে' (ডেনমার্কের বিখ্যাত যাদুকর) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সোভিয়েট যাদুকর 'কিও'-র যাদুপ্রদর্শন দেখে অভ্যস্ত একজন সমালোচক লিখলেন এঁদের দুজনকেই পাওয়া যায় সরকারের মধ্যে।···

"প্রচার বা খ্যাতি বিস্তারের কোনো সুযোগই সরকার হাতছাড়া করতেন না।···

"১৯৫৫ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি সরকারকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং যাদুকে উচ্চাঙ্গ শিল্পের স্তরে উত্তীর্ণ করেছেন বলে তাঁর প্রশংসা করেন।

"জাপানে সরকারের মৃত্যু হয় ৬।১।১৯৫৫ তারিখে। তার (মাত্র) চার দিন পরেই তাঁর ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী সেখানে আবার শুরু হলো — এবার প্রধান ভূমিকায় (তাঁর পরিবর্তে) তাঁর দ্বিতীয় পুত্র অবতীর্ণ হলো 'সরকার জুনিয়র' নাম নিয়ে।"

আধুনিক যাদুবিদ্যার আরেকটি বৃহৎ এবং প্রামাণ্য ইতিহাস-গ্রন্থ ওয়েণ্ডি রাইডেল (Wendy Rydell) এবং জর্জ গিলবার্ট (George Gilbert)-বিরচিত 'দ্য গ্রেট বুক অভ ম্যাজিক' (The Great Book of Magic)। এই বহু

রেখাচিত্র আর আলোকচিত্র সম্বলিত বড় বইটিতে সারা পৃথিবীর সেরা সেরা যাদুকরদের জীবন-কাহিনী এবং প্রদর্শনীর বিস্তারিত বিবরণ আছে ; তা ছাড়া তাঁদের উদ্ভাবিত এবং প্রদর্শিত অনেক খেলার কৌশলও ব্যাখ্যা করা আছে।

পৃথিবীর সেরা যাদুকরদের সারিতে সমান মর্যাদার সঙ্গে এই গ্রন্থের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছেন আমাদের যাদুসম্রাট প্রতুলচন্দ্র সরকার। বাংলা ভাবানুবাদে এই গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি :

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরেকজন অসাধারণ দীপ্তিমান যাদুকর আবির্ভূত হলেন : বাঙালী প্রতুলচন্দ্র সরকার। প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর রূপে খ্যাতিলাভ করে ১৯৫৫ সালের মধ্যেই তিনি পাশ্চাত্য জগতেও অনুরূপ সাফল্যের জন্য তৈরী হলেন, পৃথিবীর সেরা যাদুকর বলে যাঁরা দাবি করেন, তাঁদের সবাইকে চ্যালেঞ্জ জানাতে।

"একটি প্রদর্শনেই সরকার রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন, সরকার নামটি ঘরে ঘরে পরিচিত হলো, আর ইউরোপে তাঁর সাফল্য নিশ্চিত হয়ে গেল।

"ব্যাপারটি ঘটেছিল ইংল্যাণ্ডের বি. বি. সি. টেলিভিশন প্রোগ্রামে। তারিখ এপ্রিল ৯, ১৯৫৬। সরকার তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে দেখালেন করাত দিয়ে তরুণীকে দ্বিখণ্ডিত করার খেলা।...

"টেলিভিশন ক্যামেরাটি তাঁদের মুখোমুখি আর কাছাকাছি হতেই সরকার তাঁর শায়িতা সহকারিণীর কটিদেশ ভেদ করে বিদ্যুৎ-চালিত চক্রকরাতটি চালিয়ে দিলেন, দৃশ্যতঃ মেয়েটির দেহ দ্বিখণ্ডিত করে। তারপর দেহের মাঝামাঝি ঐ কাটা অংশের ফাঁকে নাটকীয়ভাবে হঠাৎ একটি ধাতুর তৈরী পাত খাড়াভাবে চেপে দিয়ে (দৃশ্যতঃ ঐ পাত দিয়ে দেহের দুটি ভাগ দুদিকে আলাদা করে) সরকার সোজা ক্যামেরার লেন্সের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ থমকে রইলেন, যাতে পরিস্থিতিটার পুরো প্রভাব পড়ে দর্শকদের মনে। ঠিক যথোচিত মুহূর্তে ধাতুর পাতটি (সহকারিণীর দেহের মাঝখান থেকে) তুলে নিয়ে সরকার মেয়েটির হাত দুটি ঘষে তাকে জেগে উঠবার আদেশ দিলেন। কিন্তু মেয়েটি নিশ্চল অসাড় ভাবেই শুয়ে রইল, আর তাই দেখে ইংল্যাণ্ডের হাজার হাজার বাড়িতে টেলিভিশন দর্শকবৃন্দ আতঙ্কে শিহরিত হলেন।

"ঠিক পর মুহূর্তেই এই অনুষ্ঠানটির নির্দিষ্ট সময়-সীমা পার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনের ক্যামেরাটি ঘুরে গিয়ে ফোকাস করল অনুষ্ঠান-পরিচালকের দিকে, যিনি দর্শকদের জানালেন 'শুভরাত্রি'।

"কয়েক মিনিটের মধ্যে টেলিভিশন কেন্দ্রে আসতে শুরু করল দর্শকদের টেলিফোনের পর টেলিফোন। তাঁদের ভীষণ উদ্বেগ হয়েছিল মেয়েটি হয়তো মারা গেছে।..."

লণ্ডনে সরকারের এই টেলিভিশন অনুষ্ঠানটি তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অভিনয়-দক্ষতার, প্রচারের উদ্দেশ্যে নাটকীয় শিহরণ সৃষ্টির এবং উৎকণ্ঠ কৌতূহল (suspense) জাগাবার একটি চমৎকার উদাহরণ ; তিনি যে সত্যিই কত অসাধারণ ছিলেন, তারই নির্ভুল প্রমাণ। সেকালের বিশিষ্ট অপেশাদার যাদুবিশারদ স্বর্গীয় আশু দে (একদা ইংরাজী অমৃতবাজার পত্রিকার বিখ্যাত ফীচার-লেখক ASU DE আমাকে একবার বলেছিলেন এই সব গুণে আমাদের পি. সি. সরকার বিশ্ব-বিখ্যাত মার্কিন যাদুকর হুডিনিকেও (HOUDINI) ছাড়িয়ে গেছেন।

খেলাটি সরকারের নিজের আবিষ্কৃত নয়, বিদেশী যাদুকরের আবিষ্কৃত খেলা, এবং প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য বিদেশী যাদুকরই এই খেলাটি দেখিয়ে থাকেন। এই বিদেশী খেলাটিই বিদেশে বিদেশী দর্শকদের দেখিয়ে বাজিমাত করতে হলে তাঁর প্রদর্শনে এমন-কিছু অসাধারণ অভাবনীয় বিশেষত্ব রাখতেই হবে যা দেখে বিদেশী দর্শকদের তাক লেগে যাবে, তাঁরা বুঝতে পারবেন 'এই ভারতীয় যাদুকরটি আমাদের সব যাদুকরদের থেকে আলাদা।'

এই খেলাটির প্রদর্শনে বিদেশী বিরাট যাদুকরেরা কি করতেন ? করাত দিয়ে সহকারিনীকে কেটে দু' টুকরো করে তারপরই দর্শকদের উদ্বেগ দূর করে নিশ্চিন্ত করে দিতেন কাটা (?) মেয়েটিকে আবার পুরোপুরি আস্ত আর জীবন্ত দেখিয়ে। দর্শকদের উৎকণ্ঠা সেইখানেই চুকে যেত। কিন্তু সেই টেলিভিশন প্রদর্শনীতে সরকার সেই মামুলী পন্থা নেন নি। তিনি সযত্নে সময়ের হিসেব রেখেছিলেন, এবং সহকারিনীকে আগেই বলে রেখেছিলেন, "আমি যখন তোমার হাত ঘষতে ঘষতে তোমাকে উঠে পড়তে আদেশ করব, তুমি তখন না উঠে মড়ার মতো অসাড় হয়ে শুয়ে থাকবে। তারপর আমাদের পালার সময়-সীমা শেষ হয়ে গিয়ে টি ভি ক্যামেরার চোখ অন্য দিকে ঘুরে গেলে যখন আমরা টি ভি দর্শকদের চোখের আড়াল হয়ে যাব, তখন তোমাকে জানাব আর তুমি উঠে পড়বে। দর্শকেরা ভেবে মরবে তোমাকে আমি আবার আস্ত করতে পেরেছি কিনা।"

আমেরিকার বিরাট যাদুসরঞ্জাম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাবট্স্ ম্যাজিক ম্যানু-ফ্যাকচারিং কোম্পানি থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত যাদু-বিষয়ক মাসিকপত্র নিউ

টপ্‌স্‌-এর (The New Tops) মার্চ, ১৯৫৫ সংখ্যায় ঐ পত্রিকার নিয়মিত যাদু-বিশেষজ্ঞা লেখিকা ফ্রান্‌সেস মার্শ্যাল পত্রিকাটির বৃহৎ চার পৃষ্ঠা জুড়ে সরকারের একটি পূর্ণপৃষ্ঠা ফোটোগ্রাফ এবং 'যাদু-যুবরাজের বিদায়' (Farewell to the Prince of Magic) শিরোনাম সহ যে সশ্রদ্ধ বিদায়-অভিনন্দন লিখেছিলেন, তা থেকে কিছু কিছু অংশের ভাবানুবাদ নীচে দিচ্ছি :

"গত সপ্তাহে বড় দুঃখজনক একটি খবর কানে এসেছে। সরকার আর ইহজগতে নেই। বিরাট প্রদর্শনী নিয়ে নিদারুণ শীতের মরশুমে তিনি জাপানে গিয়েছিলেন। তাঁর হৃদ্‌-যন্ত্রের অবস্থা ভালো ছিল না, অত্যধিক ঠাণ্ডার প্রকোপ সইতে না পেরে তিনি মারা যান। কথাটা যেন বিশ্বাস হতে চায় না, কারণ সরকার নিজেই ছিলেন এক অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য চরিত্র, মানুষ তো নন যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ থেকে বেরিয়ে আসা এক জিনি।

"আমি তাঁকে প্রথম দেখছিলাম শিকাগো সহরে ১৯৫০ সালের কিছু পরে। মনে হলো যেন কিংবদন্তীর জগৎ থেকে একটি চরিত্র এসে আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের মাঝখানে। পরনে গোলাপী রঙের কিংখাবের তৈরী রাজবেশ, মাথায় পালক-লাগানো পাগ্‌ড়ি, পায়ে নাগ্‌রা জুতো, তিনি ঘুরে বেড়াতেন শিকাগো শহরের রাস্তায় রাস্তায়। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি তাঁদের এমনভাবে অভিভূত করে ফেলতেন যে তাঁরা সর্বত্র তাঁর ছবি আর সাক্ষাৎকার ছেপে দিতেন। একবার একজন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি তো ভারতের একজন সাধারণ নাগরিক মাত্র। রাজবেশ পরেন কেন?' সরকার সোজাসুজি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, 'কারণ আমি একজন যাদুর রাজা।' তারপর আর এ বিষয়ে কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেন নি।

"সরকার কয়েকবার আমেরিকায় এসেছেন। প্রত্যেকবারই তাঁর কথাই ছাপা হয়েছে কাগজে কাগজে, ফোটোগ্রাফররা তাঁরই ফোটোগ্রাফ তুলেছেন, তাঁরই ওপর বর্ষিত হয়েছে সম্মান আর তারিফ।

"আমরা* তিন দিন কলকাতায় ছিলাম। তখন সরকারের যাদুপ্রদর্শনী দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।···

"তাঁর যাদু প্রদর্শনীটি ছিল আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী। চল্লিশ বছর ধরে আমরা থার্স্টন, ব্লাকস্টোন, দান্তে, কালানাগ প্রমুখ বড় বড় যাদুকরদের যে সব বৃহৎ এবং বিচিত্র যাদুপ্রদর্শনী দেখে আসছি, তাদের মধ্যে সরকারের এই প্রদর্শনীটিই

* অর্থাৎ লেখিকা এবং তাঁর স্বামী জে মার্শ্যাল (Jay Marshall)।

ছিল সবার সেরা চমৎকার। এতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা, বৈচিত্র্য এবং সাজ-সরঞ্জাম-যন্ত্রপাতি ছিল অন্য যে-কোনো যাদুকরের চাইতে বেশী। আমাদের জানা অন্য কোনো যাদুকর, কোনো বড় শহরের রঙ্গালয়ে সরকারের মতো মাসের পর মসে যাদু প্রদর্শনী চালিয়ে যেতে পারেন নি।

"আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সরকার এমন কোনো যাদুর খেলা দেখিয়েছেন কিনা যা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন, যা মৌলিকভাবে খাঁটি ভারতীয় বা প্রাচ্য। এই প্রশ্নের উত্তর : 'না'। কারণ আমি এত বেশী বছর ধরে যাদুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, যে আমি যার রহস্য অন্ততঃ কিছুটা বুঝতে পারব না, এমন খেলা বার করা শক্ত। কিন্তু সরকার একজন চমৎকার ব্যবসাদার মানুষ; পৃথিবীতে যত যাদুর খেলা তৈরী হয়েছে, তা থেকে সেরা সেরা জিনিস তিনি সংগ্রহ করেছেন। এই 'পৃথিবী' মানে অবশ্য ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা, আর ইউরোপের দু একটি দেশ। যে খেলাগুলি তিনি ব্যবহার করেছেন, সবই আমাদের বড় বড় পেশাদার যাদুকরদের ব্যবহৃত। তফাৎ এই যে সরকার সেগুলিকে যেমন পেয়েছেন ঠিক সেই ভাবে অর্থাৎ 'মাছিমারা কেরানীর মতো' ব্যবহার করেন নি, সবগুলি খেলাকেই নিজের পছন্দমতো পোশাকে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন।

"আমাদের যাদুর ইতিহাসে অনেক বিরাট যাদুকরের নাম রয়েছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন কার নাম আপনি করতে পারেন, যিনি সাংস্কৃতিক বিনিময় ব্যবস্থায় দুটি বিরাট জাতি দ্বারা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিলেন? এমন কার নাম করতে পারেন, যাঁর দেশের সরকার তাঁকে বল্‌শয় ব্যালে নৃত্যদলের বিনিময়ে মস্কোতে পাঠাতে পারতেন সেখানকার জনগণকে যাদু দেখিয়ে বিস্মিত এবং আনন্দিত করতে?*

"এক সন্ধ্যায় রঙ্গালয়ে সরকারের যাদুপ্রদর্শনী দেখার পর আমরা একটি অপরাহ্ণ সরকারের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে। সেখানে দেখলাম তাঁর কারখানা বিভাগ, শিল্প বিভাগ, গুদাম এবং আধুনিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত চমৎকার অফিস, যাতে রয়েছে যাদুসংক্রান্ত চিঠিপত্র এবং অন্যান্য বিষয়ের ফাইলের পর ফাইল।

পি. সি. সরকারকে তারা চেনে কিনা। দেখলাম ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা, জুতো-পালিশ করা ছোকরারা, দোকানদার বা ব্যবসাদাররা সবাই এই নামটির সঙ্গে পরিচিত। একবার এক যাদুওয়ালার খোঁজ পেয়ে তাকে ভাড়া করলাম আমের আঁঠি পুঁতে তা থেকে আমগাছ আর ফল জন্মাবার খেলাটি দেখাবার জন্যে। সে প্রথমেই তার যাদুর ঝুলি থেকে বার করল ফ্রেমে বাঁধানো পি. সি. সরকারের একটি ফোটোগ্রাফ। সেটিকে সে এমনভাবে একটি গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে রাখল, যেন সেই বিগ্রহের সামনে সে তার যাদুর খেলা অঞ্জলি দেবে। 'যাদুকরদের যাদুকর' কথাটা শুনেছিলাম; মনে হলো এ যেন তার একটি চরম উদাহরণ।

"সরকার ছিলেন বিরাট (great), যেমন ছিলেন আমাদের বাফেলো বিল (Buffalo Bill), যেমন ছিলেন আমাদের বার্নাম।* এদের সবারই ছিল একটি জিনিস—নিজেদের ওপর অসীম আস্থা, তাঁদের ধারণা এবং সিদ্ধান্তগুলি যে অভ্রান্ত সে বিষয়ে বিশ্বাস।

"পি. সি. সরকারের মৃত্যুতে আমরা যে শুধু একজন বন্ধু এবং সতীর্থকেই হারিয়েছি তা নয়, আমরা হারালাম যাদুর এমন এক বিরাট শক্তিমান এবং উৎসাহী প্রবক্তাকে, যাঁর একার অভাব পুরণ করতে আমাদের মতো বহু অল্পশক্তি-মানের সমবেত শক্তির প্রয়োজন হবে। তিনি যা সত্য বলে জানতেন, আসুন আমরাও তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করি: যাদু বেঁচে আছে, ভালোভাবেই বেঁচে আছে, এবং আমরা যেখানেই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে উৎসাহী থাকব সেখানেই সে বেঁচে থাকবে। হে যাদুর যুবরাজ, বিদায়।"

শ্রীমতী ফ্রান্সেস মার্শ্যাল রচিত এই মর্মস্পর্শী বিদায়-অভিনন্দনটির তলায় যাদুকর জে. মার্শ্যালকে লেখা যে পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার সারমর্ম এই রকম:

"আমি যাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) লিখছি। আমার বাবা মহান পি. সি. সরকার আপনার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, তাই আপনাকে এই চিঠি লেখা কর্তব্য বলে মনে করছি।

"আমার বাবা ১৬ জন সহকারী সহ তাঁর পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী নিয়ে জাপানে

* পি. টি. বার্নাম-এর (P. T. Barnum) বিরাট সার্কাস ছিল বিশ্ববিখ্যাত। বিজ্ঞাপনে বার্নাম যথোচিতভাবেই একে 'বিশ্বের বিরাটতম প্রদর্শনী' (Greatest Show on Earth) বলে দাবি করতেন।

এসেছিলেন। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপে যাদুপ্রদর্শনকালে ৬ই জানুয়ারি তিনি দেহত্যাগ করেছেন। খবর পেয়েই আমি কলকাতা থেকে সোজা জাপানে উড়ে এসেছি। আমার দাদা চলে এসেছিলেন আমেরিকা থেকে; সেখানে তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি বাবার মৃতদেহ নিয়ে ভারতে চলে যান। আমি বাবার প্রদর্শনী চালিয়ে যাবার জন্য জাপানে থেকে যাই। আমার প্রতি বাবার এই নির্দেশই ছিল।

"ভারতে বাবা একবার আমাকে বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যু হলে তুমি অবশ্য আমার প্রদর্শনী চালিয়ে যাবে। তুমিও পি. সি. সরকার। আমি সেইভাবেই তোমার নাম রেখেছি (প্রদীপ চন্দ্র), যেন আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার প্রদর্শনী চালিয়ে যেতে পারো।

"এসেছে বাবার সেই 'অনুপস্থিতি'। আমি এর মধ্যে পাঁচটি শহরে পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে যাদু-প্রদর্শন করেছি, এবং জাপানী জনসাধারণ ও সংবাদপত্রের প্রশংসা পেয়েছি। যতদিন বাবার রক্ত আমার দেহে থাকবে, 'সরকার' নামটিকে আমি বাঁচিয়ে রাখব।

"আমাকে আশীর্বাদ করুন। আপনার সহায়তা আমার দরকার। আসুন আমরা বাবার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করি।"

শ্রীমান প্রদীপচন্দ্রের লিখিত উক্ত চিঠিখানা যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি এর একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। জাপানে প্রবাসে যাদুসম্রাট পিতার আকস্মিক তিরোধানে বিনা মেঘে বজ্রাহত পঁচিশ বছর বয়স্ক তরুণ প্রদীপ যে অসামান্য স্থৈর্য, ধৈর্য, সাহস, দক্ষতা এবং সাফল্যের সঙ্গে পিতার যাদুপ্রদর্শন চুক্তির অসম্পূর্ণ অংশ সগৌরবে সম্পূর্ণ করে এসেছিল, পৃথিবীর যাদু-প্রদর্শনের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

যাদু-সম্রাটের মৃত্যু

৬ই জানুয়ারি ১৯৫০ সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে বসে বেতারে ঘোষণা শুনলাম :

"বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর পি. সি. সরকার আজ সকালবেলা জাপানে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন।"

যে টেবিলের ওপর বেতার-যন্ত্রটি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ ঘোষণা করল, সেই টেবিলের ধারে বসে কতবার সেফ্‌টিপিন, ছুরি, রুমাল, তাস, টাকা, ফিতা ইত্যাদি ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ম্যাজিক দেখিয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে গেছেন যাদু-জগতের সম্রাট পি. সি. সরকার। সেই টেবিলটি তাঁর স্মৃতি বহন করে আজও বর্তমান, কিন্তু তিনি আর নেই, তাঁর সঙ্গে আর কোনো দিন দেখা হবে না!

পরদিনই সন্ধ্যায় কলকাতা আকাশবাণীর আহ্বানে বেতারে বন্ধুবর পি. সি. সরকারের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বললাম :

"গত বছর রবিবাসর-এর একটি বিশেষ অধিবেশনে আমরা যাদুসম্রাট পি. সি. সরকারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলাম। সেদিন তাঁর মুখ থেকেই শুনলাম রক্তে চাপ আর চিনির আধিক্যের দরুন তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। একবার ম্যাজিক দেখাবার সময় স্টেজেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, 'আপনি যাদু-জগতের সম্রাট তো হয়েইছেন, অর্থ, খ্যাতি, জনপ্রিয়তাও প্রচুর লাভ করেছেন। এখন এই পরিণত বয়সে অসুস্থ দেহে যাদু প্রদর্শনের পরিশ্রমে নিজের জীবনকে আর বিপন্ন করবেন না আমাদের কাছে যা অমূল্য। আপনার পুত্র প্রদীপ তো তৈরী হয়েই গেছে। এখন তাকেই পাদপ্রদীপের সামনে রেখে আপনি তাকে পিছন থেকে মদদ দিন, আপনি নিজে মঞ্চের বাইরে থেকেই যাদুর সেবা করুন।' তিনি বললেন, 'না। যাদু প্রদর্শন থেকে অবসর নেবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। জীবনের শেষ পর্যন্ত যাদু প্রদর্শন করে যাব। একদিন হয়তো শুনবেন যাদু দেখাতে দেখাতেই আপনাদের পি. সি. সরকার পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছে।' তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণীই মর্মান্তিকভাবে সত্য হল। জাপানে যাদু দেখাতে গিয়ে সেখান থেকেই চিরবিদায় নিলেন যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার।"

পি. সি. সরকার বড় ম্যাজিশিয়ান ছিলেন, শুধু এইটুকু বললে যথেষ্ট হয় না ; তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী, ম্যাজিক যার একটি অংশমাত্র। সাহিত্য রচনাতেও তিনি তাঁর প্রতিভার যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁর লেখা কয়েকটি বইতে, এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অসংখ্য রচনায়, তা থেকে বোঝা যায় যাদুতে একান্তভাবে মনোনিবেশ না করে সাহিত্য সাধনায় একাগ্র হলে তিনি সাহিত্য-জগতেও অসাধারণ হতে পারতেন। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে পি. সি. সরকার শুধু একজন আশ্চর্য 'ম্যাজিশিয়ান' মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন আশ্চর্য 'মানুষ'।

যাদুসম্রাট প্রতুলচন্দ্রের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সেইদিনই আকাশপথে কলকাতা থেকে জাপান রওনা হয়ে গিয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় পুত্র, যাদুকর প্রদীপচন্দ্র, যার মঞ্চ-নাম "পি. সি. সরকার (জুনিয়র)।" জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র চলে গিয়েছিল আমেরিকা থেকে। ৯ই জানুয়ারি রাত্রে একটি বিশেষ প্লেনে লোকান্তরিত যাদুসম্রাটের নশ্বর দেহ নিয়ে দমদম বিমান বন্দরে এসে পৌঁছাল শোকবিহ্বল প্রফুল্লচন্দ্র। যাদুসম্রাটের যাদুকর পুত্র প্রদীপচন্দ্র জাপানে রয়ে গেল কঠোর কর্তব্যের আহ্বানে, পিতার অসমাপ্ত কাজ তাকে সমাপ্ত করে আসতে হবে। চুক্তির মাত্র সাতটি প্রদর্শনীর পরই মহাপ্রয়াণ করলেন যাদুসম্রাট, চুক্তির বাকি প্রদর্শনীগুলি পরিচালনা করতে হবে তাঁর 'ইন্দ্রজাল'-এর উত্তরাধিকারী প্রদীপচন্দ্রকে।

বালিগঞ্জ স্টেশনের সন্নিকটে ইন্দ্রজাল ভবন থেকে কেওড়াতলা শ্মশান অভি-মুখে শবযাত্রা শুরু হল সকাল সওয়া নটায়, রবিবার ১০ই জানুয়ারি, ১৯৭০। যাদুসম্রাট সরকারের মরদেহ বহন করে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই গাড়িতে বহু পুষ্পে এবং মাল্যে সুশোভিত হয়ে শবা-ধার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল, আমরা পদব্রজে তার অনুসরণ করলাম। পথে আর পথের দু'ধারে বাড়ির জানালায়, ছাদে, বারান্দায় বহু নরনারী। সবাই বিষণ্ণ—চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন আমাদের প্রিয় সদাহাস্যময় যাদুসম্রাট!

বন্ধুর উদ্দেশে আরেকবার শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকার্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরলাম। বন্ধুর আত্মা চলে গেছে অমৃতলোকে, জীর্ণ বসনের মতো নশ্বর দেহটিকে বর্জন করে। আমার স্মৃতিতে চিরন্তন হয়ে থাক তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখের ছবিটি, যার সঙ্গে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিচিত।

সরকার এই শেষবার জাপান যাত্রার আগে জাপানে তাঁর দশম অভিযানে

গিয়েছিলেন ১৯৫০ সালের শেষ দিকে। সেখানকার রাজধানী টোকিও শহর থেকে তিনি ১০ই অক্টোবর, ১৯৫০ তারিখে আমাকে লিখেছিলেন :

"প্রিয় অ. কৃ. ব,

জাপান থেকে প্রীতি সম্ভাষণ জানাচ্ছি। এখানে চার মাসের সফরে এসেছি ১৮ জনের দল আর ৩০ (ত্রিশ) টন মাল নিয়ে। এই নিয়ে জাপানে আমার দশবার আসা হল। আপনার চিঠি পেয়েছি। আমার 'দেশে দেশে' বইখানা আপনার ভাল লেগেছে জেনে খুশী হয়েছি। হ্যাঁ, আপনি আমার জীবন কাহিনী লিখতে পারেন, যদি আপনি সত্যিই লিখতে চান। এটা বাস্তবিকই আমার মনের কথা।

আপনার বন্ধু

পি. সি. সরকার।"

এর কয়েক বছর আগে সরকারের আমন্ত্রণে কলকাতায় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে তাঁর ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী দেখে এসে আমার সমালোচনা সহ তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলাম, তার জবাবে তিনি পত্রপাঠ ৯. ১০. ৪৯ তারিখে লিখেছিলেন :

"আমার প্রদর্শনী আরো ভালো করবার জন্য আপনি যে গঠনমূলক সমালোচনা পাঠিয়েছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার ব্ল্যাক-আর্ট প্রদর্শন একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে কিভাবে একটি নাটকের রূপ দেওয়া যায়, এ বিষয়ে আপনার কার্যকরী পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করব।

যাদুজগৎ নিয়ে আপনি একটি উপন্যাস লেখার কথা ভেবেছেন আমার নাম তার অন্তর্ভুক্ত করে, এতে আমি সম্মানিত বোধ করছি। নানা দেশে যাদুকর রূপে সফরের বিবরণ নিয়ে আমাকে একটি আত্মজীবনী লিখতে বলেছেন; আপনার পরামর্শটি খুব ভালো লাগছে. আমি তা করব ভেবেছি। কিন্তু আপনার সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে আমার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে না। আপনি আমার জন্য যা কিছু করবেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞের চাইতেও বেশী হবো।"

এরপর দেখা হতে সরকার বললেন, "আমি তো লেখক নই, তাছাড়া লেখার জন্য যে পরিশ্রম আর সময় দেওয়া দরকার, তা দেওয়া আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। আপনি লেখক, এবং ম্যাজিক-পাগল। সুতরাং আপনার ভাষায় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 'যাদুকরের আত্মজীবনী' শুধু তাহলেই লেখা হতে পারে, যদি লেখার দায়িত্বটা আপনি নেন, আমি শুধু আপনাকে মুখে মুখে বলে গেলে আর আপনার দরকার মতো মাল মশলা দিলেই চলে।"

প্রথমেই উপক্রমণিকা অংশ লেখা শুরু করবার জন্য সরকারের সঙ্গে কয়েকটি বৈঠক দরকার—তিনি বলবেন, আমি শুনে মনে মনে (আর দরকার মতো কাগজে) নোট করে নেবো ; আর আমার দরকার মতো প্রশ্ন করে তাঁর কাছ থেকে জবাব জেনে নেবো। সরকারের আমন্ত্রণে গেলাম বালিগঞ্জ স্টেশনের অনতি দূরে রেল লাইনের ধারে জামির লেনে তাঁর ইন্দ্রজাল ভবনে। লেনে ঢুকে কিছু দূর গিয়ে মুখোমুখি দুটি বাড়ি—বাঁ দিকের বাড়িটি প্রাইভেট বা পারিবারিক, আর ডান দিকের বাড়িটি পুরোপুরি ম্যাজিকের কাজে উৎসর্গ করা।

আগে শুধু সরকারের ম্যাজিক দেখেই মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু ইন্দ্রজাল-ভবন পরিদর্শন করে এই আশ্চর্য মানুষটির যে পরিচয় পেলাম, শুধু বাইরে ম্যাজিক দেখে তা পাওয়া যায় না। আসবাব, সাজসজ্জা সব-কিছুতে তাঁর শিল্পীমনের ছাপ ; সব-কিছু সুবিন্যস্ত, গোছালো, পরিপাটি। ম্যাজিক লাইব্রেরিতে ম্যাজিকের বিভিন্ন শাখা সংক্রান্ত গ্রন্থ আর পত্র-পত্রিকা সুশৃঙ্খল ভাবে রক্ষিত। দেখলাম পৃথিবীর নানা দেশ থেকে—যেখানেই ম্যাজিকের চর্চা আছে—ম্যাজিক বিষয়ক পত্রিকা সরকারের কাছে নিয়মিত আসে, আর আসে বিভিন্ন ম্যাজিক কোম্পানির ক্যাটালগ, বুলেটিন ইত্যাদি। সারা পৃথিবীতে ম্যাজিকের বিভিন্ন বিভাগে কোথায় কি অগ্রগতি হচ্ছে, সে বিষয়ে তিনি সর্বদা ওয়াকিবহাল।

রেফারেন্স বিভাগে ফাইলের পর ফাইল এমনভাবে রাখা, যে পৃথিবীর যে-কোনো দেশের যে-কোনো যাদুকর সম্বন্ধে বা যাদু সংক্রান্ত যে-কোনো তথ্য জানতে চাইলে চট করে তা জানতে পারা যাবে। দেশ-বিদেশের যাদুকরদের ফোটোগ্রাফ আর যাদু সংক্রান্ত অসংখ্য ফোটোগ্রাফ রয়েছে এই বিভাগে।

দেখলাম বিদেশ থেকে একাধিক বিদেশী যাদুকর তাঁদের দেশেরই কোনো পুরনো ব্যাপার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন ভারতের পি. সি. সরকারের কাছে। ম্যাজিক সম্বন্ধে পৃথিবীর কোথায় কি হয়েছে, কোথায় কি হচ্ছে তার অতি-সাম্প্রতিক, আপ-টু-ডেট খবর পাওয়া যাবে পি. সি. সরকারের কাছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ম্যাজিক জগতের দিক্‌পালদের চিঠির পর চিঠি দেখলাম পি. সি. সরকারকে লেখা—ব্ল্যাকস্টোন, ওকিটো, জন মুলহোল্যাণ্ড, মিলবোর্ন ক্রিস্টোফার, জ্যাক গুইন প্রভৃতি। চিঠিগুলো পড়লেই বোঝা যায় এঁরা কি প্রীতি, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার চোখে দেখেন আমাদের পি. সি. সরকারকে। পি. সি. সরকার তাঁদের একান্ত আপন জন। কোনো কোনো চিঠিতে তাঁরা ম্যাজিকের কোনো কোনো খেলা সম্বন্ধে পি. সি. সরকারের পরামর্শও চেয়ে পাঠিয়েছেন। দেখে

মনটা খুশী হয়ে উঠল। একটু বিস্ময়ও বোধ হল। এই সব বিরাট গুণী সাদা আদ্‌মি একজন কালা আদ্‌মির এমন ভীষণ ভক্ত হয়ে উঠলেন কি করে?

বন্ধুবরকে প্রশ্ন করলাম তিনি এঁদের এত ভালবাসা কি করে পেলেন। এটাও কি তাঁর ম্যাজিক? না হিপ্‌নোটিজ্‌ম?

সরকার হেসে বললেন, "ভালবাসা পাবার আমি শুধু একটি উপায় মাত্র জানি।"

"কি সেটা?"

"ভালবাসা। আমি ওঁদের ভালবেসেছি, কারণ ওঁরা ম্যাজিককে ভালবাসেন। ভালবাসা পেতে হলে ভালবাসতে হয়।"

কথাটি সুন্দর লাগল। মনে পড়ে গেল এই ধরনেরই একটি ইংরাজী উক্তি:

"টু বি ইন্‌টারেস্টিং, ইউ মাস্ট বি ইন্‌টারেস্টেড।"

"তাছাড়া"—সরকার বললেন, "ম্যাজিক এমন একটি জগৎ, যেখানে সাদা-কালোর তফাত মুছে যায়। আমেরিকা কখনো আমাদের ওপর প্রভুত্ব করে নি, কিন্তু ইংরেজরা এই সেইদিন পর্যন্ত তা করে গেছে। আমরা ভারতীয়রা ওদের দাস ছিলাম, ওরা আমাদের প্রভু ছিল, ইংরেজ জাত এখনো সেটা ভুলতে পারে নি। তাই আমি যে একজন কালা আদ্‌মি, সে বিষয়ে আমেরিকানদের চাইতে ইংরেজদের অনেক বেশী খেয়াল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের রাজধানী লণ্ডন শহরে আমি যখন একটি মেয়েকে করাত দিয়ে দু'টুকরো করে আবার জোড়া লাগাবার খেলাটি দেখিয়েছিলাম, তখন ইংরেজ দর্শকরা আমার কম তারিফ করেনি। এবং একজন ইংরেজ যাদুকর লেখক তাঁর বইতে আমার খেলাটির উল্লেখ করেছেন বিশেষভাবেই।"

আলমারি থেকে একখানা বই (This is Magic)-খুলে আমার হাতে দিয়ে তিনি একটি পৃষ্ঠার নীচের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। লেখক উইল ডেক্‌স্‌টার (Will Dexter) লিখেছেন:

"Sorcar, the Indian illusionist, performed it with such zest when he brought his show to London, that the audience really thought he had sawn the girl in half!"

অর্থাৎ: "ভারতীয় যাদুকর সরকার যখন তাঁর যাদু প্রদর্শনী নিয়ে লণ্ডনে এসেছিলেন, তখন তিনি এই খেলাটি এমন দাপটের সঙ্গে দেখিয়েছিলেন যে

দর্শকেরা ভেবেছিল তিনি করাত দিয়ে মেয়েটিকে সত্যিই কেটে দু'টুকরো করে ফেলেছেন!"*

লণ্ডনের যাদুকর সমিতি 'ম্যাজিক সার্ক্‌ল্'-এর একটি বৈঠকে বিশিষ্ট যাদুকর সদস্যরা দুঃখ করছিলেন সিনেমা, টেলিভিশন ইত্যাদির প্রসারের ফলে এখন আর ম্যাজিক দেখিয়ে ভালো রোজগার করা সম্ভব নয়। তখন একজন সদস্য বললেন, "কিন্তু সরকারের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। তিনি এখনও ম্যাজিক দেখিয়ে প্রচুর টাকা উপার্জন করছেন।"

সবাই একবাক্যে সায় দিয়ে এদিক দিয়ে সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেন।

এ কাহিনীটি আমাকে বলেছেন উক্ত সমিতির একজন ভারতীয় সদস্য, কলকাতার বিশিষ্ট অপেশাদার যাদুকর 'সু ভন' (Soo Von), ব্যক্তিগত জীবনে যিনি এঞ্জিনীয়ার শ্রীসুচারু ভট্টাচার্য।†

"আমার পড়া যে ম্যাজিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ, তা নয় কিন্তু।" বললেন পি. সি. সরকার। "সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে আমার আগ্রহ। কিন্তু তাদের নিজের জন্যে নয়, ম্যাজিকের জন্যে। ম্যাজিকের ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে বলে। আমার ম্যাজিকে যা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কোনোরকম সাহায্য করবে না, এমন বিষয়ে আমি উৎসাহী নই।"

অর্থাৎ ইংরেজীতে যেমন একটা কথা আছে 'অল রোডস্ লীড টু রোম' (সব রাস্তাই রোমে পৌঁছে দেয়), তেমনি পি. সি. সরকারের ক্ষেত্রে 'অল সাবজেক্‌ট্‌স্ লীড টু ম্যাজিক' (সব বিষয়ই পৌঁছে দেয় ম্যাজিকে)।

সেদিন কিন্তু সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া গেল না। ফোনের পর ফোন, আগন্তুকের পর আগন্তুক।

জরুরী না হলেও কাউকে তিনি বাতিল করতে পারেন না। সবাইকে খুশী করতে হবে, সবাইকে কিছু কিছু করে সময় দিতে হবে। অথচ বাড়িতে থেকেও 'বাড়িতে নেই' বলে কাউকে ধাপ্পা দিতে চান না, হলেনই বা ম্যাজিশিয়ান।

* এই প্রসঙ্গে যাদুকর-ঐতিহাসিক মিলবোন ক্রিস্টোফার লিখিত বিবরণ (পৃষ্ঠা ২৪৯ দ্রষ্টব্য)।

† যাদুসম্রাটের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর ভবনে রবিবাসর সাহিত্য সভার যে বিশেষ অধিবেশন হয়েছিল, তাতে যাদুসম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রফুল্লচন্দ্র পিতার স্মৃতিচারণ করেছিল এবং যাদুকর 'সু ভন'-যাদুসম্রাটের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন বিশ্বের প্রাচীনতম যাদুর খেলা 'বাটি আর গুটির খেলা' (Cups and Balls) দেখিয়ে।

তাই ঠিক হল এর পর তিনিই আমার বাড়িতে (টালিগঞ্জে) এসে পড়বেন, যাতে বিনা বাধায় বেশ কিছুক্ষণ আমাদের তুজনের কথোপকথন চলতে পারে। বললাম সকাল সকাল আসবেন, যাতে দশটার ভেতর বাড়ি ফিরতে পারেন।

"কত সকালে আপনি আমার জন্য তৈরী হয়ে থাকতে পারবেন?" প্রশ্ন করলেন তিনি।

"আপনি কত সকালে এসে পৌছতে পারবেন?"

"ছ'টা।"

তখন ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি তাঁর মতো এত বড়, এত বিখ্যাত মানুষ অত সকালে তৈরী হয়ে এসে পৌছবেন। মনে মনে হেসে বললাম "বেশ। আমি তৈরী থাকব।"

নির্দিষ্ট তারিখে সকালবেলা পাঁচটা বেজে আটান্ন মিনিটে আমাদের বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গায় এসে একটি গাড়ি দাঁড়াল। হাসিমুখে গাড়ি থেকে নামলেন পি, সি. সরকার !! তারপর দোতলায় উঠে আমার ঘরে ঢুকলেন ঠিক সকাল ছ'টায় ; এমনি চমৎকার সময়নিষ্ঠা ছিল তাঁর। কথার আর সময়ের মূল্য বুঝতেন তিনি। সেই কারণেই অত বড় হয়েছিলেন। বড় গুণ না থাকলে অমনি অমনি বড় হওয়া যায় না। এরপর একাধিক দিন তাঁকে আমার গৃহে পাবার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি প্রতিবারই এসে পৌছেছেন আমার ঘরে ঠিক নির্দিষ্ট সময়ের আগেও নয়, পরেও নয়।

* * *

আমেরিকার টেলিভিশনে 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাতুকরদের বিশেষ প্রদর্শনী'তে চক্রকরাত দিয়ে একটি মেয়েকে কেটে আবার জোড়া লাগানোর খেলা দেখিয়ে সরকার আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শিহরণ জাগিয়েছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত যাতুপত্রিকা 'জেনিয়াই-'এর (GENII) সম্পাদক তাঁর বিবরণীতে জানুয়ারি, ১৯৫০ সংখ্যায় লিখেছিলেন :

"We were treated to one of the rare appearances on U. S. television of 'the World's Greatest Illusionist, Sorcar'...Gasps from live audience were heard coast-to-coast....Sorcar is truly one of the all time great illusionists."

অর্থাৎ "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাতুকর সরকারের এক তুর্লভ আবির্ভাব আমরা দেখেছিলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনে।...(আমেরিকার) এক উপকূল থেকে

অন্ত উপকূল পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল জীবন্ত দর্শকদের বিস্ময়ের দীর্ঘশ্বাস।...সরকার বাস্তবিকই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ যাদুকরদের একজন।"

যেমন স্টেজের বড় বড় খেলায়, তেমনি ঘরোয়া ছোট খেলাতেও সরকার ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যাদুকরদের মধ্যে দেখা যায় এই সব বড় বড খেলায় (ইংরাজিতে যার নাম 'ইলিউশন') যাঁরা ওস্তাদ, তাঁরা হস্তকৌশল-প্রধান ছোট ছোট খেলা ভাল দেখাতে পারেন না। পি. সি. সরকার কিন্তু ছিলেন দুই রকম খেলাতেই ওস্তাদ, কারণ তিনি খুব ছোট থেকে শুরু করে অনেক সাধনা, অনেক অসুবিধা, অনেক বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে চৌকস হয়ে উঠেছিলেন।

স্টেজে পি. সি. সরকার ম্যাজিক (অথবা 'ইন্দ্রজাল', তাঁর প্রদর্শনীকে তিনি যে ভারতীয় নাম দিয়েছিলেন) দেখাতেন উষ্ণীষধারী মহারাজার বেশে। সে ছিল এক জগৎ। কিন্তু আমাদের ঘরে বসে অত্যন্ত সহজ ঘরোয়া ভাবে—জমকালো মহারাজার বেশে নয়, সাধারণ বাঙালীর মতো ধুতি পাঞ্জাবি পরে—ছোট ছোট জিনিস নিয়ে ছোট ছোট খেলা দেখিয়ে তিনি যখন বড় বিস্ময়ের সৃষ্টি করতেন, তখন সে ছিল এক আলাদা জগৎ, এবং তিনি তখন এক আলাদা পি. সি. সরকার।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৫৯ তারিখটি বিশেষভাবে আমার মনে গেঁথে আছে। সেদিন এসেই তিনি আমার কন্যা রূপলেখাকে তাঁর 'ইন্দ্রজাল' (ম্যাজিকের বই) একখণ্ড উপহার দিলেন। রূপলেখার তখন এগারো বছর বয়স, সে ইংরাজী মাধ্যমের স্কুলের ছাত্রী। সরকার তাকে বললেন, "খুব ভাল করে ইংরাজী শেখো। কিন্তু সর্বদা মনে রেখো সবার ওপরে মাতৃভাষা, আর মাতৃভূমি।"

তারপরই কৌতুকের সুরে বললেন, 'অবশ্য আমাকে ডাকতে তোমার ইংরাজীতেই সুবিধা। কাকা বলবে, না মামা বলবে, ভেবে পাচ্ছ না। 'আংকল্' বলো, দুই বোঝাবে।"

রূপলেখা বিশ্ববিখ্যাত যাদুকরের স্বাক্ষরিত উপহার পেয়ে মহা খুশী। "কিন্তু আমি তো ম্যাজিশিয়ান হবো না।" বলল সে।

সরকার বললেন, "তবু এ বই পড়লে তোমার উপকার হবে। ম্যাজিকের মতো এমন বুদ্ধি বাড়ানো হবি আর নেই।"

সেদিন রূপলেখাকে তিনি একটি আশ্চর্য উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন ; সেটি তাঁর নিজের জীবনে অর্জিত অসামান্য সাফল্যের মূলমন্ত্র। তিনি বলেছিলেন : "তোমরা তোমাদের ইংরাজী বইতে উপদেশ পড়েছ—Aim high—উচ্চ লক্ষ্য

রাখ। কিন্তু আমি বলছি তা যথেষ্ট নয়। Aim highest — লক্ষ্য রাখবে একেবারে চূড়ায় উঠবার।"

যে কয়েকটি দিন সরকার এসে আমার গৃহ ধন্য করেছিলেন, সেই কয়েক দিনের একান্ত বৈঠকে সাধারণভাবে ম্যাজিক সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে তাঁর নিজের যাদুজীবন সম্বন্ধে অনেক কথা আর অনেক কাহিনী শুনেছি, সে সবের মূল্য আমার কাছে অসীম।

কিন্তু নানা বিভিন্ন কারণে তারপর বন্ধুবর যাদুসম্রাটের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা কার্যতঃ অগ্রসর হতে পারল না। সুতরাং সেটা ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রেখে প্রকাশকের এবং আমার যুক্ত আগ্রহে যাদুবিদ্যার ইতিহাস, যাদু সম্পর্কিত বিবিধ আলোচনা আর দেশ-বিদেশের যাদুকরদের বিচিত্র জীবন-কাহিনী নিয়ে 'যাদু-কাহিনী' বইটি লিখে দিয়েছিলাম। তাতে আমাদের দেশে যাদুচর্চার বর্তমান যুগকে 'সরকার যুগ' নামে অভিহিত করেছিলাম, এবং বইটির উপসংহারে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম ভারত সরকার সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতিকে যেমন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে সম্মানিত করেছেন, যাদু-বিদ্যাকেও যেন তেমনি মর্যাদা দেন। আনন্দের বিষয়, তারপর ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার যাদুকে সম্মান দিয়েছিলেন, ভারতের শ্রেষ্ঠ যাদুকর পি. সি. সরকারকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দিয়ে। এবং সেই বছরই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আমার 'যাদু-কাহিনী' গ্রন্থটিকে 'নরসিং দাস পুরস্কার' (এক হাজার টাকা) দিয়ে যাদু-সাহিত্যকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। যাদু-সাহিত্য প্রসঙ্গে বলি, সারা পৃথিবীর যাদু-সাহিত্যে (অর্থাৎ যাদু সম্পর্কিত বা যাদুকরদের রচিত সাহিত্যে) যাদুকর পি. সি. সরকারের 'দেশে দেশে' বইটির তুলনা নেই। এতে 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনী নিয়ে আফ্রিকা, মিশর, ইরান, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, বর্মা, আর স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অনবদ্যভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। যাদুকরের চোখ আমাদের সাধারণ চোখের চাইতে কত বেশী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, আর সেইসঙ্গে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতিভা থাকলে সেই মণি-কাঞ্চন যোগের ফল কি অপরূপ হতে পারে, তার সার্থক উদাহরণ এই আশ্চর্য গ্রন্থটি। আচার্য সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় এর ভূমিকায় বলেছেন: "তিনি (পি. সি. সরকার) ঐন্দ্র-জালিক। কথায় আর কাজে অদ্ভুত জিনিস দেখানোই তাঁর ব্যবসা। তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঐন্দ্রজালিক।"

সেকালের প্রখ্যাত ইংরাজ যাদুকর — যাদুপ্রিয় ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডোআর্ডের

প্রিয় বন্ধু—চার্লস্ বারট্রামের (Charles Bertram) লেখা 'বহু দেশে একজন যাদুকরের ভ্রমণবৃত্তান্ত' (A Magician in Many Lands) বইটি আমি পড়েছি বলেই আরো বেশী করে বুঝেছি যাদু-সম্রাট সরকারের 'দেশে দেশে' গ্রন্থের তুলনা নেই। সবাইকে আমি এ বই পড়ে' দেখতে বলি ; পড়লেই বুঝতে পারবেন তিনি শুধু ইন্দ্রজালের যাদুকরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভাব আর ভাষারও যাদুকর।

আমি ম্যাজিকে মগ্ন হয়েছিলাম স্কুল জীবনেই। কলেজ জীবনে (১৯৩২) লণ্ডনের যাদুকর সমিতির 'ম্যাজিশিয়ান' মাসিকপত্রে ম্যাজিক সম্বন্ধে লিখতেও শুরু করেছিলাম, তারপর অন্যান্য কাগজে। ডাকযোগ রেখেছি আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ডের ম্যাজিকের জগতের সঙ্গে। পি. সি. সরকারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সালের শুরুতে কলকাতায় 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকার অফিসে, আমি ছিলাম যার রবিবাসরীয় সম্পাদক। ম্যাজিক-মগ্ন মানুষ আমি তখনই ভালবেসে ফেলেছিলাম ম্যাজিকের একনিষ্ঠ পূজারী এই আশ্চর্য মানুষটি-কে। কিন্তু বটবৃক্ষের সেই ক্ষুদ্র বীজটি যে চোখের সামনে দেখতে দেখতে এমন বিরাট বটবৃক্ষে পরিণত হবে, ম্যাজিক দিয়ে যে এমন ম্যাজিক করা যায়, তা আমি তখন কল্পনাই করতে পারি নি।

ভারতে যাদুবিদ্যা ছিল একটি অবহেলিত বিদ্যা, পথে-ঘাটের ভেল্‌কিওযালা আর 'ভানুমতীর খেল' ওয়ালীদের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। শিক্ষিত সুধীসমাজে ম্যাজিকের তেমন মর্যাদা ছিল না। পি. সি. সরকার সেই ম্যাজিককে শিক্ষিত সুধীসমাজে সমাদৃত করেছেন, ভারত সরকার থেকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি জয় করে যাদুবিদ্যাকে সরকারী স্বীকৃতি পাইয়েছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির দূতরূপে যাদুকর সরকারকে ভারত সরকার পাঠিয়েছেন সোভিয়েট রাশিয়ায়।

মনে প্রাণে ভারতীয় পি. সি. সরকার বিদেশী ম্যাজিশিয়ানদের পোশাক বদলে ধরলেন খাঁটি ভারতীয় মহারাজার বেশ, তাঁর সম্পূর্ণ যাদু প্রদর্শনীকে ভারতীয় ছাঁচে ঢালাই করে তার নাম দিলেন 'ইন্দ্রজাল', ভারতের ইন্দ্রজালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এলেন আমেরিকায়, ইউরোপে, রাশিয়ায়, জাপানে।

১৯১৩ সালে জন্মেছিলেন তিনি, যে বছর রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"জগৎ কবি সভায় মোরা
তোমার করি গর্ব।

বাঙালী আজ গানের রাজা
বাঙালী নহে খর্ব ।"

পি. সি. সরকারের সাফল্য গৌরবে আমরা তেমনি বলতে পারতাম :

"জগৎ যাদু সভায় মোরা
তোমার করি গর্ব ।
বাঙালী আজ যাদুর রাজা,
বাঙালী নহে খর্ব ।"

চিরদিনের জন্যে চলে গেছেন আমাদের গৌরবের সেই মানুষটি। একান্ত নিষ্ঠা আর সাধনা থাকলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়, তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে তিনি আমাদের স্মৃতিতে বেঁচে রইলেন।

এই পর্যন্ত লিখেছিলাম কিশোর-মাসিক 'রোশ্‌নাই' মাঘ, ১৩৭৭ সংখ্যায়, বন্ধুবর যাদুসম্রাটের অপ্রত্যাশিত অকালমৃত্যুতে শোকার্ত চিত্তে।

জাপানকে বলা হয় সূর্য-উদয়ের দেশ (Land of the Rising Sun)। সেই দেশে গিয়েই অস্ত গেলেন আমাদের যাদু-গগনের সূর্য, ভারতের যাদুচর্চার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রতুলচন্দ্র সরকার। তাঁর এই অস্ত গমনের সঙ্গে রহস্যময়তার দিক দিয়ে চীনা-ছদ্মবেশী মার্কিন যাদুকর চুং লিং সু-র জীবন-রবি অস্ত যাওয়ার সাদৃশ্য আছে বলে আমার মনে হয়। চুং লিং সু-র* মৃত্যু আকস্মিক দুর্ঘটনা, হত্যা, না পরোক্ষ উপায়ে আত্মহত্যা, তা আজ পর্যন্ত নিঃসংশয়ে নির্ধারিত হয় নি। তেমনি যাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের মৃত্যু আকস্মিক, না ইচ্ছামৃত্যু, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হতে পারছি না।

আমেরিকার 'নিউ-টপ্‌স্' যাদু-মাসিকের মার্চ, ১৯৫০ সংখ্যায় শ্রীমতী ফ্রান্‌সেস মার্শাল সরকারের মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছিলেন :

"He was on tour in Japan with the big show, severe winter weather prevailed, he had a heart condition and was weary from a great deal of work, contact with the very cold air caused a sort of explosion in that seemingly strong chest, and Sorcar was gone."

ভাবার্থ : "তিনি (সরকার) তাঁর বিরাট প্রদর্শনী নিয়ে জাপানে সফর করছিলেন তীব্র শীতের মরশুমে, যখন তাঁর হৃদ্‌-যন্ত্রের অবস্থা ছিল খারাপ এবং

* পৃষ্ঠা ৮৮ দ্রষ্টব্য।

প্রচুর পরিশ্রমের ফলে অবসন্ন। ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে তাঁর দৃশ্যতঃ সবল (কিন্তু আসলে দুর্বল) বুকের ভিতরে এক ধরনের বিস্ফোরণ ঘটল, সরকার চলে গেলেন।"

নিজের দেহ-যন্ত্রের, বিশেষ করে হৃদ্-যন্ত্রের, মারাত্মক দুর্বলতার কথা জেনে-শুনে সরকারের মতো অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং সাবধান মানুষ তাঁর শেষ জাপান-যাত্রার জন্য বিশেষ করে তীব্র শীতের মরশুমটাই বেছে নিয়েছিলেন কেন, যা তাঁর দুর্বল হৃদ-যন্ত্রের পক্ষে নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক ? এবং ম্যাজিক দেখাতে কেন গিয়েছিলেন বেছে বেছে জাপান দ্বীপপুঞ্জের সব চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা অঞ্চলে ? সেখানে মৃত্যু-সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনেই কি ?

হয়তো তাই। অথবা হয়তো তা নয়। এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত মীমাংসায় আসতে পারি না। তাই যখনই বন্ধুবর প্রতুলচন্দ্রের মৃত্যুর কথা ভাবি, তখনই মনে পড়ে চুং লিং স্থ-র কথা।